শুকতারা

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

চত্বারিংশৎ বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
বৈশাখ·১৩৯৪

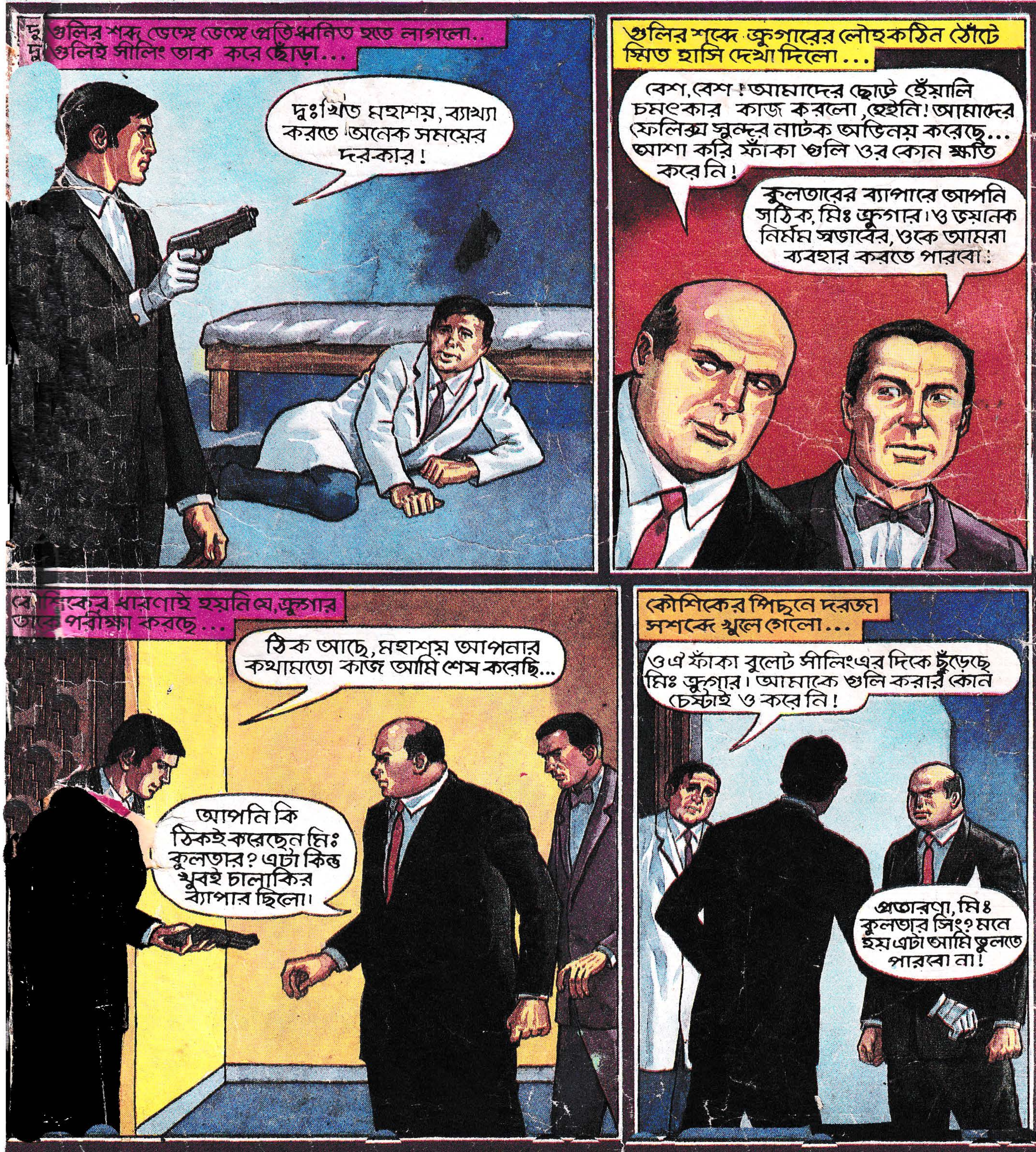

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট ঃ হরিদাস পাল ও সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

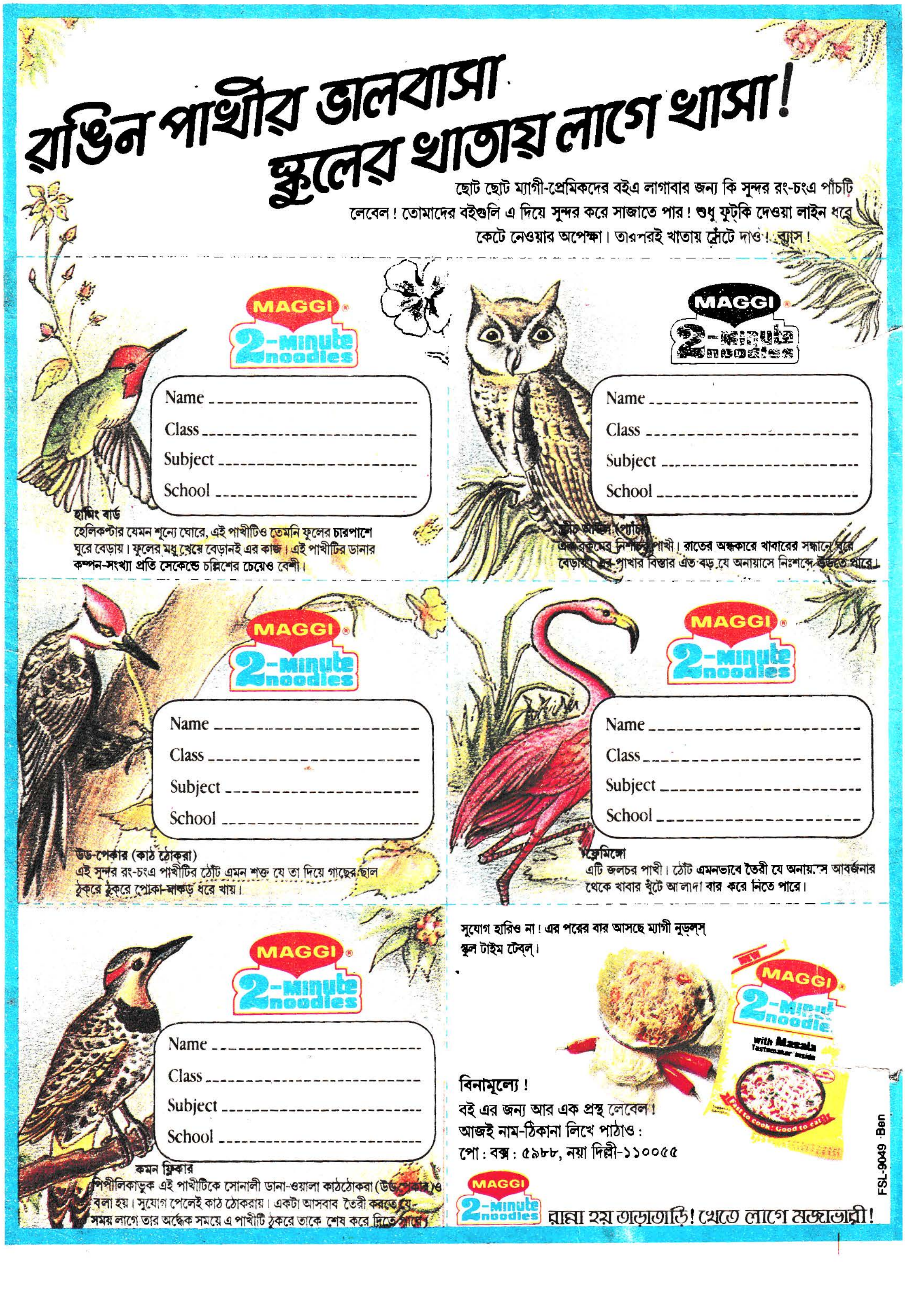
রঙিন পাখীর ভালবাসা
স্কুলের খাতায় লাগে খাসা!
ছোট ছোট ম্যাগী-প্রেমিকদের বইএ লাগাবার জন্য কি সুন্দর রং-চংএ পাঁচটি লেবেল! তোমাদের বইগুলি এ দিয়ে সুন্দর করে সাজাতে পার! শুধু ফুট্‌কি দেওয়া লাইন ধরে কেটে নেওয়ার অপেক্ষা। তারপরই খাতায় সেঁটে দাও! ব্যাস!
MAGGI
2-Minute noodles
Name
Class
Subject
School
হামিং বার্ড
হেলিকপ্টার যেমন শূন্যে ঘোরে, এই পাখীটিও তেমনি ফুলের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। ফুলের মধু খেয়ে বেড়ানই এর কাজ। এই পাখীটির ডানার কম্পন-সংখ্যা প্রতি সেকেন্ডে চল্লিশের চেয়েও বেশী।
MAGGI
2-Minute noodles
Name
Class
Subject
School
পাখী। রাতের অন্ধকারে খাবারের সন্ধানে ঘুরে
পাখার বিস্তার এত বড় যে অনায়াসে নিঃশব্দে
MAGGI
2-Minute noodles
Name
Class
Subject
School
উড-পেকার (কাঠ ঠোক্‌রা)
এই সুন্দর রং-চংএ পাখীটির ঠোঁট এমন শক্ত যে তা দিয়ে গাছের ছাল ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে পোকা-মাকড় ধরে খায়।
MAGGI
2-Minute noodles
Name
Class
Subject
School
ফ্লেমিঙ্গো
এটি জলচর পাখী। ঠোঁট এমনভাবে তৈরী যে অনায়াসে আবর্জনার থেকে খাবার খুঁটে আলাদা বার করে নিতে পারে।
MAGGI
2-Minute noodles
Name
Class
Subject
School
কমন ফ্লিকার
পিপীলিকাভুক এই পাখীটিকে সোনালী ডানা-ওয়ালা কাঠঠোকরা (উড-পেকার)ও বলা হয়। সুযোগ পেলেই কাঠ ঠোকরায়। একটা আসবাব তৈরী করতে যে-সময় লাগে তার অর্দ্ধেক সময়ে এ পাখীটি ঠুকরে তাকে শেষ করে দিতে পারে।
সুযোগ হারিও না! এর পরের বার আসছে ম্যাগী নুড্‌ল্‌স্ স্কুল টাইম টেব্‌ল্।
MAGGI
2-Minute noodles
Fast to cook! Good to eat!
বিনামূল্যে!
বই এর জন্য আর এক প্রস্থ লেবেল!
আজই নাম-ঠিকানা লিখে পাঠাও:
পো: বক্স: ৫৯৮৮, নয়া দিল্লী-১১০০৫৫
MAGGI
2-Minute noodles
রান্না হয় তাড়াতাড়ি! খেতে লাগে মজাদারী!
FSL-9049 ·Ben

বাঁটুল দি গ্রেট

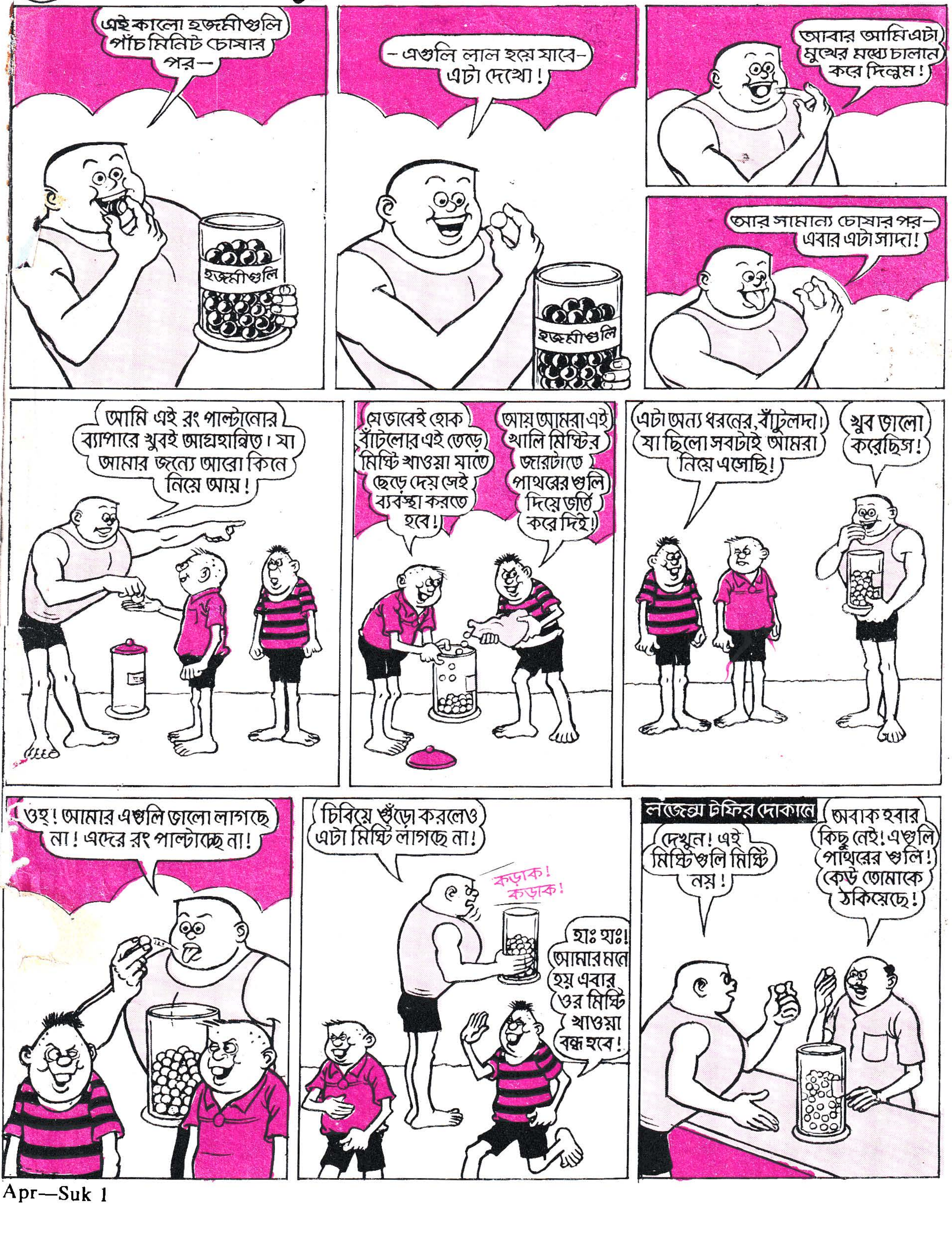
এই কালো হজমীগুলি পাঁচ মিনিট চোষার পর—
হজমীগুলি
—এগুলি লাল হয়ে যাবে— এটা দেখো!
হজমীগুলি
আবার আমি এটা মুখের মধ্যে চালান করে দিলুম!
আর সামান্য চোষার পর— এবার এটা সাদা!
আমি এই রং পাল্টানোর ব্যাপারে খুবই আগ্রহান্বিত। যা আমার জন্যে আরো কিনে নিয়ে আয়!
যে ভাবেই হোক বাঁটলোর এই তেড়ে মিষ্টি খাওয়া যাতে ছেড়ে দেয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে!
আয় আমরা এই খালি মিষ্টির জারটাতে পাথরের গুলি দিয়ে ভর্তি করে দিই!
এটা অন্য ধরনের, বাঁটুলদা। যা ছিলো সবটাই আমরা নিয়ে এসেছি!
খুব ভালো করেছিস!
ওহ্! আমার এগুলি ভালো লাগছে না! এদের রং পাল্টাচ্ছে না!
চিবিয়ে গুঁড়ো করলেও এটা মিষ্টি লাগছে না!
কড়াক! কড়াক!
হাঃ হাঃ! আমার মনে হয় এবার ওর মিষ্টি খাওয়া বন্ধ হবে!
লজেন্স টফির দোকানে
দেখুন! এই মিষ্টিগুলি মিষ্টি নয়!
অবাক হবার কিছু নেই! এগুলি পাথরের গুলি! কেউ তোমাকে ঠকিয়েছে!

এটা ঐ দুটো পাজি বিচ্ছুর কাজ! আমি এবার এক জার ঝাল ঝাল কালো হজমীগুলি নেবো!
নিশ্চয়ই! এই যে!
বাঁটলো যখন পাথরের গুলিগুলো চুষতে শুরু করলো তখন আমি হাসতে হাসতে প্রায় আধমরা হয়ে পড়েছিলাম! হোঃ হোঃ হোঃ!
তাই বুঝি!
হিঃ হিঃ হিঃ!
হুম! আমি ওদেরই পাথরের গুলি ছুঁড়ে ওদের দেখিয়ে দেবো যে, সবগুলো আমি গিলে ফেলিনি।
উফ!
ওফ!
বাঁটুলদা!
হ্যাঁ! আমি তোদের চালাকি জানি। কিন্তু এবার আমি ঝাল হজমীগুলি পেয়েছি!
বাড়িতে
জার শেষ। কিন্তু আমি এতো তাড়াতাড়ি খেয়েছি যে ঝালে আমার মুখ আগুনের মতো জ্বলছে। এই লেমোনেডটা আমি এক চুমুকে খেয়ে ফেলি!
ঢক! ঢক!
থামো!
এখন আমার ভেতরেও জ্বলছে! এটা লেমোনেড নয়!
না! ওটা পেট্রল আমার মডেল প্লেনের জন্যে! এখানে নিশ্বাস ফেলো না! বাড়িতে তুমি আগুন ধরিয়ে দেবে!
পেট্রল
ঠিক আছে, তাই হবে! এই রে! আমি আলুক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি!
এই মরেছে! আমি আগুন ধরিয়ে দিয়েছি! সব ঝলসাচ্ছে!
বুদ্ধু! তুমি আমার সব মাছ ভাজা করে ফেলেছো!
মা
আমার ভাজা সব মাছ আমি কিনে নিয়েছি! আহ! মিষ্টির চেয়ে এ অনেক ভালো! আলু পোড়া আর মাছ ভাজা!
আমরা কি ওর মন থেকে মিষ্টি খাওয়ার পাগলামি ঝেড়ে ফেললাম কি আবার তেড়ে আলু আর মাছ খাওয়ার জন্যে?

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের

মাসিক পত্রিকা

বৈশাখ **শুকতারা** ১৩৯৪

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 538 (17) 1 (9) T.B.C. (dated 21.7.86)

সূচীপত্র

১। মৃত্যুদূতের কালোছায়া –নারায়ণ দেবনাথ প্রচ্ছদ
২। বাঁটুল দি গ্রেট –নারায়ণ দেবনাথ ১৬১
৩। পরোয়া নেই (কবিতা) –সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৬৫
৪। রজতকর্ণা ও কুড়িয়ে পাওয়া পাখি (রূপকথা) –দোল গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ১৬৬
৫। সে এক দুর্যোগের দিন (সম্পূর্ণ উপন্যাস) –ধীরেন্দ্র লাল ধর ১৬৮
৬। বাঁশবনে চার অপদেবতা (গল্প) –অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১

৭। বাহাদুর বেড়াল –নারায়ণ দেবনাথ ১৮৫
৮। তোমাদের পাতা ১৮৬
৯। সূর্য যেদিন নিভে যাবে (মহাকাশ বিজ্ঞান) –প্রবীরকুমার আদিত্য ১৮৮
১০। পান্ডব গোয়েন্দা –ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ১৯০
১১। পুঁচকের বাহাদুরি (গল্প) –অজেয় রায় ১৯৫
১২। ছবির মজা–অমল ১৯৬
১৩। জিজ্ঞাসার ডাইরি–শিবকৃষ্ণ ১৯৭
১৪। স্টার ট্রেক (ছবিতে কল্প-বিজ্ঞানের গল্প) ১৯৮
১৫। শিবাজীর রাজ্যাভিষেক(বীর বন্দনা) –প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী ২০০
১৬। এক মিনিটের ডিটেকটিভ গল্প–সর্বিলক ২০১
১৭। কি করে লেখাপড়া মনে রাখতে হয় (ফিচার)–ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ২০২
১৮। জেনে রাখ ২০৪
১৯। গরমাগরম(কার্টুন)–সুফি ২০৫
২০। যাদুর দেশে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) –সব্যসাচী ২০৬
২১। খেলাধূলা–শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২১০
২২। ব্রুস লি (ছবিতে গল্প) –ডিভোনো ও ম্যাটেরা ২২২

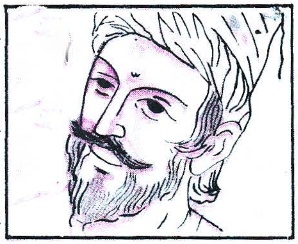

২৩। অমৃতের পুত্র (সত্য ঘটনা)–নন্দলাল ভট্টাচার্য ২২৪
২৪। মকরদ্বীপ রহস্য (ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস) –রাধারমণ রায় ২২৭
২৫। অঙ্ক জগতের জাদু (ম্যাজিক) – জাদুকর পি.সি.সরকার (জুনিয়র) ২৩১
২৬। বাঘের ছাল (বড় গল্প) – শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩২
২৭। সততার পরিচয়(প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প) –কৌশিক রায় ২৪০
২৮। কিশোরের সততা (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প) –দেবাঞ্জন বিশ্বাস ২৪১
২৯। মানস বসু স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা(ঘোষণা) ২৪২
৩০। ঠিকানার খোঁজে (কবিতা)–কমল লাহিড়ী ২৪২
৩১। দাদুমণির চিঠি ২৪৪
৩২। বৃশ্চিকের পদক্ষেপ (গোয়েন্দা গল্প রঙিন ছবিতে)–ইন্দ্রনীল ঘোষ ২৪৫
৩৩। নামুন গিরিবর্ত্মের পথে(ভ্রমণ)–তপনকুমার দাস ২৪৭
৩৪। আতঙ্কের দ্বীপ (সম্পূর্ণ উপন্যাস) –স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০
৩৫। অবিশ্বাস্য (রোমাঞ্চকর গল্প)–গৌরী দে ২৬২
৩৬। ছবির মজা–মানব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৪
৩৭। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (অগ্নিযুগের সৈনিক) –সুধীন্দ্রনাথ রাহা ২৬৫
৩৮। হাঁদা ভোঁদা –নারায়ণ দেবনাথ ২৬৮
৩৯। মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ২৭০
৪০। রবির পরে সোম (ফিচার)- আরতি বসু ২৭২

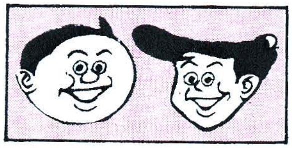

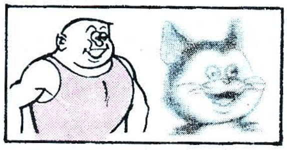

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য–হাতে নিলে ৫৩ টাকা। ডাকে– বুকপোস্টে ৬৫, রেজিস্ট্রি ডাকে ১১১ টাকা। মূল্য –টাঃ ৬·০০

ছোটদের উপযোগী বই

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
- টুনটুনির গল্প [৩.০০]

সুকুমার রায়
- খাগড়াই [৪.০০]

সুখলতা রাও
- ঈশপের গল্প [৩.৫০]

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- হাসিখুসি ১ [৩.০০]
- হাসিখুসি ২ [৩.৫০]
- হাসিরাশি [৪.৫০]
- আষাঢ়ে স্বপ্ন [৩.০০]

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- কুমির সাহেব [৩.০০]

লীলা মজুমদার
- জানোয়ার [৪.০০]

শশিভূষণ দাশগুপ্ত
- ছেলেবেলার বিবেকানন্দ [৪.৫০]
- শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে [৫.০০]
- ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ [৬.০০]
- ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত [৬.০০],

সুনির্মল বসু
- আমার ছড়া [৪.৫০]

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
- ছোটদের সারদাদেবী [৬.৫০]

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
- ছবিতে হিতোপদেশ [৩.০০]
- ছবিতে রামায়ণ [৫.৫০]
- ছবিতে মহাভারত [৬.০০]

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস
- আমরা বাঙালী [৪.৫০]
- আমাদের দেশবন্ধু [২.২৫]

মনোমোহন চক্রবর্তী
- ছবিতে পৃথিবী ১ [৪.০০]
- ছবিতে পৃথিবী ২ [৪.০০]

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
- মজার ছড়া [৫.০০]

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
- মজার কবিতা [৫.০০]

শৈল চক্রবর্তী
- ছড়ার দেশে টুলটুলি [৬.০০]

গৌরী ধর্মপাল
- চোদ্দ পিদিম [৬.০০]

মীরা বালসুব্রমনিয়ন
- তিনটে তামার পয়সা [৭.০০]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রভাত বসু
- ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন [৬.০০]

আমার শৈশব
জন্ম থেকে সাত বৎসর পর্যন্ত ছবি ও
বৃত্তান্ত লেখার বই
[সাধারণ ২৫.০০ · শোভন ৪০.০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০৯,
ফোন ৩৫-৭৬৬৯

শুকতারা

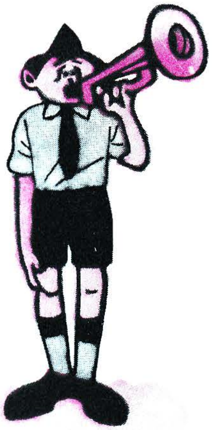

৪০শ বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • বৈশাখ, ১৩৯৪/এপ্রিল ১৯৮৭

পরোয়া নেই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গল্‌সি মানকর পরজ
ও যদি না কথা বলে, আমার কিসের গরজ?

দুর্গাপুর রাজবাঁধ পানাগড়
দুধ কেটেছে? পরোয়া নেই। ছানা কর।

ওয়ারিয়া রানীগঞ্জ অন্ডাল
ঠাক্‌মা বলেন, রাগের নাম চণ্ডাল।

সীতারামপুর কালিপাহাড়ি
দাদুটি আমার স্বল্পাহারী।

জামতাড়া মধুপুর জশিডি
অ আ ক খ শেষ ক'রে তবে তো এ বি সি ডি।।

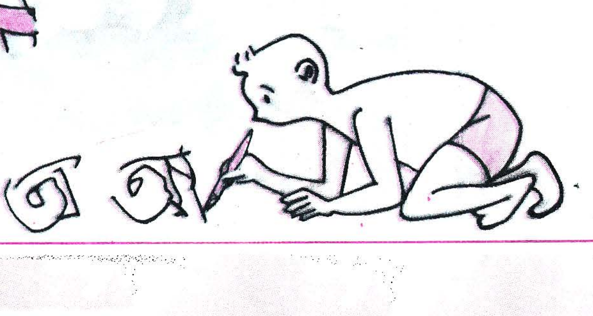

ছবি : রাহুল মজুমদার

অনেকদিন আগের কথা। এক শিকারী গভীর বনে গিয়েছিল শিকার করতে। শিকার-অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে সেই শিকারী বনের মধ্যে হঠাৎ কোথা থেকে এক শিশুর কান্না শুনতে পেল। খুঁজতে খুঁজতে এক গাছতলায় এসে দেখে গাছের মগডালে একটি শিশু। শিশুটির মা যখন নির্জন কোনো এক বনচ্ছায়ায় শিশুটিকে নিয়ে ঘুমুচ্ছিল, সেই সময় একটা পাখি তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে দূরে এক গাছে বসে।

শিকারীটি শিশুটিকে গাছ থেকে নামিয়ে বাড়ি নিয়ে চলল। বাড়িতে তার আপনার জন বলতে ছিল এইরকমই এক শিশু–

রজতকণা ও কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি

দোলগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

নাম রজতকণা। ভাবলে ভালোই হলো, দুটি ছেলেমেয়ে একসঙ্গেই থাকবে, খেলবে, বড় হবে।

গাছের মগডালে পাওয়া গিয়েছিল বলে, আর একটা পাখি তাকে চুরি করেছিল বলে ছোট্ট সেই শিশুটিকে সবাই কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি বলে ডাকত। সেই কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি ও রজতকণা একসঙ্গে বড় হতে লাগল। দু'জনে খুব ভাব। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না।

বাড়িতে থাকত এক রাঁধুনি বুড়ি ও কতকগুলি চাকরবাকর। সেই রাঁধুনিটা প্রতি সন্ধ্যেয় দুটো বালতি নিয়ে কুয়ো থেকে রান্নাবান্নার জল তুলত। একদিন দেখা গেল, জল তোলা তার আর ফুরায় না। যায় আর আসে, যায় আর আসে। তাই দেখে রজতকণা বললে, "হ্যাঁরে পুনি, আজ এত জল তুলছিস কেন?"

পুনি বুড়ি বললে, "কথাটা কাউকে যদি ফাঁস করে না দিস। তাহলে কারণটা তোকে বলব।"

রজতকণা কথা দিলে, কাউকে সে বলবে না।

বুড়ি তখন বললে, "শোন্ তাহলে, কাল যখন ভোরে তোর বাবা শিকারে বেরিয়ে যাবে, সেই সময় এই জল বড় একটা

কড়াইয়ে ফোটাবো। তারপর সেই ফুটন্ত জলে কুড়িয়ে-পাওয়া পাখিকে সেদ্ধ করব।"

আসলে সেই রাঁধুনি বুড়ি ছিল এক ডাইনী। কেউ জানত না।

পরের দিন ভোরবেলায় শিকারী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর রজতকণা উসখুস করতে লাগল। তারপর কুড়িয়ে-পাওয়া পাখির গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি, আমাকে কখনো ছেড়ে যাবি না তো?"

কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি বললে, "না, কখনো ছেড়ে যাব না।"

রজতকণা বললে, "আমিও না।" তারপর চোখের জল ফেলতে ফেলতে গতদিন সন্ধ্যের সব ঘটনা তাকে বললে। সেই বুড়ি রাঁধুনির অভিসন্ধির কথা। তারপর বললে, "চল্, দু'জনে মিলে এ বাড়ি থেকে পালাই।"

বলেই চটপট পোশাক পরে দু'জনে লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে বুড়ি রাঁধুনি কড়াইয়ে জল ফোটাতে দিয়ে ঘরে এসে দেখে ঘরে কেউ নেই। দু'জনেই বেপাত্তা। বুড়ি রাঁধুনি ভাবলে, দু'জনাই যদি না ফেরে আর, তাহলে কত্তা এসে তাকে আস্ত রাখবে না। এই ভেবে চাকরদের সে খুঁজতে পাঠালো।

এদিকে ছেলেমেয়ে দুটি বাড়ি থেকে কিছু দূরে এক বনে গিয়ে লুকিয়ে ছিল। চাকর-বাকরদের তাদের খোঁজে আসতে দেখে কুড়িয়ে-পাওয়া পাখিকে রজতকণা ফিসফিস করে বললে, "কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি, আমাকে কখনো ছেড়ে যাবি না তো?"

কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি বললে, "কক্ষণো না।"

রজতকণা বললে, "তাহলে তুই গোলাপ-ঝাড় হয়ে যা। আমি হয়ে যাই ছোট্ট একটা গোলাপ-কুঁড়ি।"

চাকর-বাকররা তন্ন তন্ন করে বন হাতড়ে কোথাও কিছু দেখতে পেল না। শুধু দেখলে, একটা গোলাপ-ঝাড়, আর কী সুন্দর তাতে একটা কুঁড়ি।

বাড়ি ফিরে রাঁধুনিকে তারা সে কথা বলতেই রাঁধুনিই চিৎকার করে বললে, "হাঁদারামের দল, গোলাপ গাছটা উপড়ে ফেলে কুঁড়িটাকে নিয়ে আসতে পারো নি! যাও, শিগগিরি যাও।"

চাকর-বাকররা আবার যখন দুদ্দাড় করে বন হাঁটকাতে এল, তখন দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে রজতকণা কুড়িয়ে-পাওয়া পাখিকে বললে, "কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি, আমাকে কখনো ছেড়ে যাবি না তো?"

কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি বললে, "কক্ষণো না।"

"তাহলে আয়, আমি মন্দির হই, আর তুই হয়ে যা মন্দির-চূড়ায় ছোট্ট ত্রিশূল।"

চাকর-বাকররা এসে তন্ন তন্ন করে কোথাও আর গোলাপ-ঝাড় আর গোলাপের কুঁড়ি খুঁজে পেল না। শুধু দেখলে বনের মধ্যে কী সুন্দর একটা মন্দির আর মন্দিরের মাথায় কী সুন্দর ছোট্ট একটা ত্রিশূল!

শুধু দেখলে একটি গোলাপ ঝাড়

তারা নিরাশ হয়ে ফিরে এসে বুড়িকে সেই কথা বলতেই বুড়ি গেল খুব রেগে।

"হতচ্ছাড়ারা, মন্দিরটাকে ভেঙে মন্দিরের মাথার ত্রিশূলটা নিয়ে আনতে পারিসনি!"

তারপর চাকর-বাকরদের সঙ্গে করে বুড়ি নিজে গেল সেই বনে।

দূর থেকে বুড়ি ও চাকর-বাকরদের আসতে দেখে কুড়িয়ে-পাওয়া পাখিকে রজতকণা বললে, "কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি, আমাকে কখনো ছেড়ে যাবি না তো?"

কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি বললে, "কক্ষণো না।"

"তাহলে তুই পুকুর হয়ে যা, আর আমি হাঁস হয়ে তোর বুকে সাঁতার কাটি।"

কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি সঙ্গে সঙ্গে টলটলে পুকুর হয়ে গেল, আর রজতকণা ধবধবে সুন্দর হাঁস হয়ে সাঁতার কাটতে লাগল সেই পুকুরে!

বুড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পুকুরটাকে দেখে যেই তার জলটা মুখ দিয়ে শুষে নেবার জন্যে উপুড় হয়েছে, অমনি হাঁসটা তার মাথাটা চেপে ধরে বুড়িকে চুবিয়ে ধরল সেই জলে। বুড়ি ধড়ফড়িয়ে মারা গেল। তারপর হাসতে হাসতে কুড়িয়ে-পাওয়া পাখি ও রজতকণা দু'জনে হাত ধরাধরি করে মহাফুর্তিতে বাড়ির দিকে ছুট–ছুট–ছুট।

* বিদেশী রূপকথা অবলম্বনে

ছবি : তরুণ চক্রবর্তী

সে এক দুর্যোগের দিন

ধীরেন্দ্রলাল ধর

১৮৫৮ সাল শুরু হয়েছে। সারা হিন্দুস্থান পুরো একটি বছর সিপাহী যুদ্ধের সোরগোলে তোলপাড় হয়েছে। অনেক খন্ড যুদ্ধ, অনেক নরহত্যার পর অবস্থা কিছুটা শান্ত।

এক শীতের সকাল দুপুরের দিকে আগিয়েছে। গঙ্গার ধারে একটি গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে পথের পাশেই একখানি কামারশালা। কামারশালার দরজার উপর বসে আছে পনেরো ষোল বছরের একটি ছেলে। রোদ পোহাচ্ছে, খানিক আগেই স্নান সেরে সে মুড়ি খেয়েছে। জলটা পেটে পড়তেই কেমন যেন শীত ধরে গেছে। আর এখন হাতে কোনো কাজ নেই। ছেলেটা দিব্যি আরাম করে খানিক রোদ পোহাচ্ছে।

হঠাৎ ওদিকে একটা সোরগোল উঠলো। ব্যাপারটা কি ভাল করে বোঝার আগেই ওদিক থেকে ঝগড়ু গাড়োয়ান ছুটে এলো, বললো—বসে আছিস কি রে, পালা। কোম্পানির ফৌজ গাঁয়ে এসে ঢুকেছে, তালুকদারের বাড়ি লুঠ করছে। ওদের পেয়াদাগুলোকে ধরে বেঁধেছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরছে, বেঁধে বেঁধে রাখছে। বসে থাকিসনে, পালা। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। ঝগড়ু গাড়োয়ান একবার পিছন পানে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেল।

সোরগোলটা যেন আগের চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। হাবু উঠে পড়লো, একবার ভাবলো ওদিকে খানিকটা গিয়ে দেখে আসবে তালুকদারের বাড়িতে কি হচ্ছে। তারপর ভাবলো দরকার কি হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় কেন? যদি দেখতেই হয় ওদিকের ওই বড় নিমগাছটার উপরে উঠলেই সব কিছু দেখা যাবে।

সোরগোলটা গাঁয়ের ভিতর এগিয়ে আসছে। হাবু আর অপেক্ষা করলো না। সোজা সাউ-দের বাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে বড় নিমগাছটার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। এই নিমগাছটার উপরে এর আগেও সে উঠেছে। ধীরে ধীরে সে গাছটার উপর উঠে পড়লো, তরতর করে উঠে গেল একেবারে মগডালে। ঘন পাতার আড়ালে একটা ডালের উপর সে বসলো। এখান থেকে তালুকদারের বাড়িটা দেখা যায়, দিনে তো আগুন দেখা যায় না, দেখা গেল ধোঁয়া। ওরা ওই বাড়িটায় আগুন লাগিয়েছে। ওদিকে রীতিমত মানুষের ছুটোছুটি দেখা যাচ্ছে।

হাবু ভাল করে ঠাহর করার চেষ্টা করে, কিন্তু ঠিকমত

কিছুই বোঝে না। দেখতে দেখতে কোম্পানির সিপাহীরা এদিকেও এসে পড়লো। তারপর অনেক মানুষের হৈ-হুল্লোড় ছুটোছুটি চেঁচামেচি। কয়েকটা বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল। তারপর দেখা গেল কোম্পানির সিপাহীরা সব মানুষগুলোকে ধরে ফাঁসি দিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। কোনো পুরুষ মানুষকে ধরতে পারলে আর রক্ষে নেই, তার বয়স যাই হোক, ছেলে-ছোকরা থেকে বুড়ো লোক অবধি। সারাদিন তারা গাছের ডালে ডালে শুধু মানুষই ঝোলালো। কোনো বিচার নেই। মনিব ও চাকর পাশাপাশি ঝুললো। মেয়েদের মধ্যে আর ছোটছেলেদের মধ্যে চিৎকার আর কান্না।

হাবু লড়াইয়ের কথা অনেক শুনেছে, কিন্তু সে লড়াই তো তলোয়ার বন্দুক নিয়ে মারামারি, এমনভাবে ধরে ধরে গাছে ফাঁসি দেওয়ার ব্যাপার কখনো শোনেনি। হাবু গাছটার মগডালে অনেক পাতার আড়ালে বসে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো।

ক্রমে নিচের হৈ-হুল্লোড় স্তিমিত হয়ে এলো। বেলা তখন পড়ে এসেছে। হাবু এবার পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলো পল্টন চলে যাচ্ছে। পিঠে বন্দুক আছে, কাঁধে একটা করে পোঁটলা। তাহলে তারা শুধু মানুষ মেরে, ঘরে আগুন দিয়েই গেল না, লুঠ করেও অনেক কিছু নিয়েছে।

পল্টন চলে গেল। সারা গ্রাম স্তব্ধ। কোথাও মানুষের সাড়া নেই। সূর্যও অস্ত যাচ্ছে। অনেক দেখে শুনে হাবু এতক্ষণে গাছ থেকে নামলো। নেমে পথের মুখে আসতেই আঁতকে উঠলো। দুপাশের দুই গাছের ডালে দুটি মানুষ ঝুলছে, চোখ দুটো ঠিকরে পড়েছে, জিভটা ঝুলছে। নদীর ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায় তাদের হাতগুলো নড়বড় করছে। একজনের মুখখানা তারই পানে ঘুরে গেল, মাথাটা তারই পানে তাকিয়ে নাড়ছে। হাবু একবার ভাল করে সেই দিকে তাকিয়েই চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো ছুটতে শুরু করে দিলে। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে সে ছুটলো। এখান থেকে তাকে পালাতে হবে। যত দূরে যাওয়া যায় সে যাবে।

কিন্তু দৌড়ে আর কত দূর যাওয়া যাবে। গাঁয়ের শেষে এসে সে থামলো, হাঁটতে শুরু করলো। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এলো। তবে জ্যোৎস্না রাত, চলতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। পথে কেউ কোথাও নেই, হাবুই একমাত্র পথিক। গা ছমছম করে, পিছন পানে তাকায়, ওই গাছে ঝোলা মানুষ দুটো তার পিছু পিছু আসছে না তো? অপঘাতে মরলেই তো মানুষ ভূত হয় বলে শুনেছে, ওরা কি এরই মধ্যে ভূত হয়ে গেছে? হাবু অন্ধকার গাছপালার পানে সভয়ে তাকায় আর আগের চেয়ে জোরে পা চালাতে চায়।

শেষে পা যখন আর চলে না, এমন সময় হাবু এক গাঁয়ে পৌঁছালো। দু-একটা বাড়িতে আলো দেখা যায়, বাড়ি সব অন্ধকার; এখন কাউকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে ডাকতে চাইলে সে তো মারমুখো হয়ে উঠবে। কিন্তু একটা শোবার জায়গা তো চাই। নজরে এলো সামনের বাড়ির দাওয়ায় একখানি তক্তাপোশ পাতা রয়েছে, হাবু দাওয়ায় উঠে সেই তক্তাপোশের উপর শুয়ে পড়লো। পুরানো তক্তাপোশ, মচমচ করে একটা আওয়াজ উঠলো।

পরক্ষণেই ঘরের দরজা খুলে গেল, এক বয়স্ক মানুষ এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে, হাতে একগাছি লাঠি। বললো—কে রে? এখানে শুয়েছে কে?

হাবু বললে—আমি।

—কে আমি?

—আমি কুসুমিয়া গ্রামে থাকি, ওখানে কোম্পানির সিপাহীরা হামলা করেছে, তাই পালিয়ে এসেছি।

—বেশ করেছ। তা এখানে কেন?

—এখানে একটু শুয়েছি, ভোরেই রওনা দোবো।

—না না, এখানে শোবার দরকার নেই। ভালমানুষ সেজে শুয়ে থাকবে আর দুপুর রাতে সিঁদ কাটবে। এখান থেকে সরে পড়ো বাপু।

—আমি চোর নই।

—আর কথা বাড়িও না বাপু। যাও—ওঠো—

হাতের লাঠিটা দিয়ে সে হাবুকে একটা খোঁচা মারলো। হাবুও উঠে পড়লো, দাওয়া থেকে পথে নামে...।

দেহ অবসন্ন, পা আর দেহটাকে টানতে পারছে না। কোনো মতে আরো কয়েকখানা বাড়ি পার হয়ে আবার নজরে এলো দাওয়ায় পাতা তক্তাপোশ। এবার সন্তর্পণে দাওয়ার উপর উঠে নিঃশব্দে তক্তাপোশের উপর হাবু শুয়ে পড়লো।

শুতে না শুতেই ঘুম।

ঘুম ভাঙলো সকালে, মানুষের সাড়া পেয়ে।

চোখ মেলে দেখে, সামনে দুজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে। হাবুকে উঠে বসতে দেখেই তাদের একজন বললে—কে রে, তুই? কোথায় থাকিস?

—আমি এখানকার মানুষ নই। থাকি কুসুমিয়া গাঁয়ে। কাল গোরা পল্টন গাঁ জ্বালিয়ে দিয়েছে, কতজনকে ধরে ধরে ফাঁসি দিয়েছে, তাই পালিয়ে এসেছি। চলে যাবো মুর্শিদাবাদ, সেখানে আমার মামা থাকে।

—তোদের গাঁয়ে গোরা পল্টন হামলা করলো আর তুই এখানে পালিয়ে এসে দিব্যি শুয়ে ঘুম দিলি? এই গাঁয়ের উপর কদিন ধরে তোদের নজর পড়েছে? ক'জন আছিস দলে?

—কি বলছেন?

—বলছি ঠিক কথা। পরপর কটা সিঁধেল চুরি হয়ে গেল, সেটা তোদেরই কাজ।

—কি বলছেন?—হাবু ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তক্তাপোশ থেকে নেমে পড়লো। লোকটি তখনই তার একখানি হাত চেপে ধরলো। বললো—তোকে চৌকিদারের কাছে জমা করে দিতে হবে।

হাবু এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলে, তারপরেই দৌড় দিল।

লোক দুটি সাড়া তুললো—চোর চোর! ধর ব্যাটাকে—

সকালবেলা অচেনা গাঁয়ের পথে হাবু পালাবে কোথায়? কিছুটা যেতেই একটা গাছের আড়াল থেকে একটা লোক এগিয়ে এসে হাবুকে ঝাপটে ধরলো—ব্যাটা চোর!

হাবু বললো—ছেড়ে দাও, আমি চোর নই।

—চোর নই! তাই ছুটে পালাচ্ছিস?

—না, আমি কি চুরি করেছি? আমাদের গাঁয়ে গোরা পল্টন হামলা করেছে, গাঁ জ্বালিয়ে দিয়েছে, মানুষজনদের ধরে ধরে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে, আমি কোনোমতে পালিয়ে এসেছি।

—কোন গ্রাম?

—কুসুমিয়া।

—সে তো এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ পথ রে?

—হ্যাঁ, তা হবে। কাল রাত এক প্রহর অবধি তো হেঁটেছি।

—তোর বাবা মা ভাইবোন কোথায় গেল?

—আমি একা, কুসুমিয়ায় ঝগড়ু কামারের কামারশালায় কাজ করতাম।

—দিনে সিঁদ-কাঠি তৈরি করিস আর রাতে সিঁদ দিতে বেরোস! চল চৌকিদারিতে নিয়ে যাই, যা কিছু বলার সেখানেই বলবি। চল—

দুজনে তখন একখানি গামছা হাবুর কোমরে জড়িয়ে গামছার দুটি মুখ চেপে ধরেছে।

হাবু এবার কেঁদে ফেললো, বললো—সত্যি আমি চোর নই, গোরা ফৌজের ভয়ে পালিয়ে এসেছি। কাল সারাদিন শুধু হেঁটেছি, আজ এখন অবধি কিছুই খাইনি, আর তোমরা বলছ আমি চোর। আমি সিঁদ কাটি—

—ঠিক আছে, চল না চৌকিদারের কাছে—

—যেতে হবে না, আমি এসে পড়েছি—

গায়ে ফতুয়া, কোমরে গামছা বাঁধা, হাতে বল্লম একজন শক্তসমর্থ বয়স্ক লোক এসে পড়লো। বললো—ছেলেটা কে? কি হয়েছে?

—দেখ, তুমি চিনতে পার কিনা?

চৌকিদার ভাল করে তাকিয়ে বললো—না, দেখিনি।

হাবু বললো—আমি তো কুসুমিয়ার লোক, তুমি আমাকে দেখবে কি করে?

—কুসুমিয়া তো এখান থেকে অনেক দূর, পাঁচ-ছ' ক্রোশ পথ, সেখান থেকে সাত-সকালে এখানে এলি কেমন করে?

—আজ আসিনি গো, এসেছি কাল রাতে। ওখানে গোরা ফৌজ হামলা করেছে, গাঁ জ্বালিয়ে দিয়েছে, মানুষকে ধরে ধরে গাছে লটকে দিচ্ছে, আমি কোনোমতে পালিয়ে এসেছি।

—বলিস কি রে? ওখানে যে আমার কাকা থাকে, ওখানকার চৌকিদার।

—ওখানকার দুজন চৌকিদারকে তো আমি জানি, কালু চৌকিদার আর ফেলু চৌকিদার।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরাই আমার দুই খুড়তুতো ভাই।

—খবর নাও। এখন তো গাঁ জনশূন্যি।

—বলিস কি রে, সত্যি বলছিস?

—চল না। আমি তোমার সঙ্গে ফিরে যাবো।

—রণপায়ে চলতে পারিস?

—খুব বেশি দূর তো যাইনি, গাঁয়ের পথে ঘুরেছি।

—তাতেই হবে, চল।

ভৈরব চৌকিদার তখনই হাবুকে নিয়ে ঘরে গেল। দু জোড়া রণপা বের করে আনলো, বললো—চল, দুজনে যাই।

—আমি কাল থেকে কিছু খাইনি, কিছু না খেলে আমি চলতে পারবো না।

—বেশ, খেয়ে নে—চৌকিদার ঘর থেকে মুড়ি বাতাসা এনে দিল।

পেটে খাবার পড়তেই হাবু দেহের শক্তি ফিরে পেল। এক ঘটি জল খেয়ে বললো—চল, আমি তৈরি।

দুজনে রণপায়ে চড়ে গাঁয়ের পথ দিয়ে ছুটলো। সে যুগে ছেলেছোকরা, যাদের ঘোড়া ছিল না, তারা তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে হলে রণপা ব্যবহার করতো। ছেলেবেলা থেকে গরীব ছেলেরা খেলাচ্ছলে রণপায়ে চলা অভ্যাস করতো।

ক্রোশ তিনেক যাবার পর পথে একটা মানুষ দেখা গেল, লোকটি কাছে আসতেই হাবু চিৎকার করে উঠলো—কামার কর্তা!

—আরে হাবু! তুই বেঁচে আছিস?

—আমি গাছে উঠে বসেছিলাম কর্তা, তাই বেঁচে গেছি।

—আমি তো গাঁয়ের ভিতর দিয়েই এলাম। কেউ নেই। অনেক বাড়ি জ্বলছে, গাছে মানুষ ঝুলছে। তোরা ওদিকে যাচ্ছিস কোথা?

ভৈরব বললো—কুসুমিয়ায় আমার খুড়তুতো দুই ভাই থাকে।

—থাকে নয়, ছিল। এখন কেউ নেই। হয় পালিয়েছে, না হয় গাছের ডালে ঝুলছে।

—একবার গিয়ে দেখিগে—

—কি দেখবে? কোনো মানুষ তো নেই। তারা পালিয়ে গেলে বেঁচে গেছে, আর যদি গাছে ঝোলে, তো তাদের নামিয়ে নিয়ে তুমি একা সৎকার করতে পারবে? অতো মড়া দেখলে সাত দিন ঘুমুতে পারবে না। এখান থেকেই ফিরে চল। আর যাবার দরকার নেই।

—যাবো না, তুমি বলছ?

—না, যাবে না।

ঝগড়ু ভৈরবের হাত ধরলো, বললো—ফিরে চল, আমরাও চলে যাই।

হাবুরা যে পথে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে চললো।

ঝগড়ুর ট্যাঁকে দুটি পয়সা ছিল। তাতেই সেদিনটা দুজনের দুবার ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া চললো। সন্ধ্যার একটু পরে তারা আবার এসে পড়লো নদীর ঘাটে। ঘাটে একখানা লাল রঙের নৌকা বাঁধা ছিল, ঝগড়ু হাঁক দিল–পল্টু–শম্ভু–দেবুয়া–

পানসি থেকে সাড়া এলো–হাজির আছি।

–পাটা নামিয়ে দে–

হাল দিয়ে ঠেলে নিয়ে নৌকাখানা ঘাটের আরো কাছে এনে দাঁড়ীরা একখানা কাঠের পাটা নামিয়ে দিলে। তার উপর দিয়ে ঝগড়ু ও হাবু নৌকায় গিয়ে উঠলো।

মাঝিরা পাটা তুলেছে, এমন সময় তাড়াতাড়ি দুজন লোক এসে পড়লো, বললো–মাঝি, কোথায় যাচ্ছ?

–কেন?

–কাটোয়া যাবে? ভাড়া দোব।

–কি দেবে? দুদিনের পথ, আট পয়সা চাই।

–ছ'পয়সা নে।

–না বাবু, দু'জন মানুষের দুদিন খেতেই লাগবে চার পয়সা, আর চারটে পয়সা উপরি না থাকলে চলবে কেন?

–বেশ আট পয়সাই দোব, চল।

আবার পাটা নামানো হলো, লোক দুজন উঠলো। দেখেই বোঝা গেল ফতুয়া গায়ে কোমরে উড়্নি জড়ানো বাবু; আর গায়ে গামছা হাতে লাঠির মাথায় মস্ত পুঁটলি কাঁধে নিয়ে ভৃত্য। বরাবর পানসির ছৈয়ের মধ্যে তারা ঢুকলো।

এবার খুঁটির বাঁধন খুলে, পাল ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। লগির ধাক্কায় এক পাক ঘুরে পানসি গিয়ে পড়লো বেশি জলে। দুই দাঁড়ী দাঁড় ধরলো। পানসি চললো ঘাট ছাড়িয়ে।

ঝগড়ু ও হাবু বাইরে এক কোণে বসেছিল, খানিক পরে নৌকার একখানি পাটার নিচে থেকে ঝগড়ু হুঁকো কলকে বের করলো। চকমকি ঠুকে তামাক সাজতে বসে গেল।

চাকরটি এবার বললো–কর্তাবাবুরও হবে নাকি এক ছিলিম? আমাদের কাছে ভাল তামাক আছে।

ঝগড়ু বললো–হবে, হবে।

ঝগড়ু আরেকটা হুঁকো কলকে বের করলো।

ভৃত্য পোঁটলা থেকে ভাল তামাক বের করলো, দু'কলকে তামাক সাজা হলো। এক কলকে ভৃত্য কর্তাকে পৌছে দিলে, আরেক কলকে ঝগড়ু হাতে নিলে। খানিকটা ধূমপান করে ভৃত্যকে বললো–তোর চলে তো নে।

ভৃত্য ছৈয়ের আড়ালে সরে গেল, কর্তার আড়ালে হুঁকোটা হাতে নিল। এবার ঝগড়ু ভৃত্যের সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে আলাপ জমালো–তোর নাম কি? বাবু কি করে? কোথাকার লোক? কোথায়-যাচ্ছিস? ইত্যাদি।

ওদিকে বাবুর তামাক ফুরিয়ে এসেছিল। ভৃত্য আরেক কলকে সেজে দিলে। বাবু তামাক শেষ করে পুঁটলিটার উপর ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে শুয়ে পড়লো, বলে উঠলো–কালী তারা জগদম্বা মা–

দুই বল্লমের ঘায়ে দুজনেই ধরাশায়ী

ইতিমধ্যে ঝগড়ু বাবুর সব পরিচয় জেনে নিয়েছে। বাবুর নাম কালীচরণ, কাটোয়ার এক নীলকুঠির গোমস্তা। সাহেবের খুব খাতিরের লোক। চাষীরা যমের মতো ভয় করে। বামুনের ছেলে। কালীভক্ত। সকাল সন্ধ্যায় কালীপূজা না করে জলস্পর্শ করে না। বাড়িতে কালীপূজায় খুব ধুম হয়। যাত্রাগানের আসর বসে। কুঠির সাহেবরা আসে পালা দেখতে। মানুষটা এক কথার মানুষ–রোখালো লোক, যা বলে তা করে। ইত্যাদি।

ঝগড়ু শোনে আর ঝিমোয়। ইতিমধ্যে ছৈয়ের ভিতর থেকে কর্তা ডাকে–রামাই, চাদরখানা পেতে দে, এবার একটু শুয়ে পড়ি।

ভৃত্য ছৈয়ের ভিতরে উঠে যায়। ঝগড়ু আরেক কলকে

তামাক সাজে। বলে—ওই মিঠে তামুক আমাদের পোষায় না, আমাদের কট্‌কি তামাক চাই—

ঝগড়ুর তামাক খাওয়া শেষ হলো। আরো খানিক সে ঝিমুলো। ছৈয়ের মধ্যে একবার দেখলো, কর্তা শুয়ে পড়েছে, ভৃত্যও শুয়েছে। দুপাশে গঙ্গার দুই তীর দেখে নিলে তারপরেই হাঁক দিলে—পল্টু, শম্ভু, দেবুয়া হুঁশিয়ার—

হালের মানুষ হাল ছাড়লো, দাঁড়ের মানুষ দাঁড় তুলে নিলে নৌকার মধ্যে।

ঝগড়ু আবার হাঁক দিলে—নীলকুঠির মাল, দরিয়ামে ডাল—

নৌকার তিনজন মাঝি ঢুকলো ছৈয়ের মধ্যে। টেনে বের করে আনলো বাবু ও ভৃত্যকে। এবার ঝগড়ুও হাত মেলালো। চারজনে দুটো মানুষের হাত-পা ধরে চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে নদীর জলে। মানুষ দুটি খানিক হাবুডুবু খেল তারপর অন্ধকারে জলস্রোতে হারিয়ে গেল। ঝগড়ু সেই দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—গঙ্গা পানিমে পাপ ধোলাই—গঙ্গা পানিমে পাপী খিলাই—জুলুমদার জাহান্নমে যাই—নীলকুঠি জাহান্নমে যাই! জয় গঙ্গামাঈ!

মাঝি তিনজন হাসতে হাসতে ধোয়া ধরলো—জয় গঙ্গামাঈ! জয় গঙ্গামাঈ! পালের টানে পানসি অন্ধকারে এগিয়ে চললো মাঝদরিয়া দিয়ে।

হাবুর পানে তাকিয়ে ঝগড়ু একসময় বললো—তুই ভাবছিস লোক দুটোকে জলে ফেলে দিয়ে কাজটা খুব খারাপ করলাম। তা নয়। নীলকুঠির সাহেব, নায়েব গোমস্তা পাইক পেয়াদা সবাই এক একটা শয়তান। চাবুক মারে, চাষীদের বুকের উপর বাঁশ ডলে। সারাদিন আটকে রাখে, একফোঁটা জল দেয় না। আবার দরকার হলে ঘরে আগুন দেয়। ওরা যত সংখ্যায় কমবে ততই আমাদের মঙ্গল রে। ওদের সবাইকে একসঙ্গে পেলে আমি সব কটাকে একসঙ্গে মাঝদরিয়ায় ভাসিয়ে দিই। তুই তো ওদের কোনো অঞ্চলে যাসনি, তাই ওসব জানিস না।

ঝগড়ু এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বললো—দেবুয়া, কালীগঙ্গার খালে এসে পড়লাম না? চাঁদটা একেবারে মেঘে ঢাকা, ঠিক ঠাহর পাচ্ছি না।

—সামনেই তো কালীগঙ্গা।

—কাপতেনের নাও তো এইখানেই নোঙর করা আছে রে?

—তাই তো দেখে গেছি, তাই ইদিকে এলাম।

পানসি গিয়ে ঢুকলো খালের মুখে, সামনেই বাঁকের মুখে অনেকগুলো বড় বড় গাছ, সেই গাছগুলোর আড়ালে একখানি গহনার নাও নোঙর করেছিল। নদী থেকে দেখা যায় না। পানসি গিয়ে ভিড়লো তার গায়। একটা কাছি ঝুলছিল, ঝগড়ু কাছিটা হালের হাতলে জড়িয়ে দিল। পাশে সিঁড়িও ঝুলছিল, সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে। ডাকলো—হাবু, আয়—

তারপর নাওয়ের পাটাতনের উপর উঠে ডাক দিল—কাপতেন, আছ তো?

—কে, ঝগড়ু সর্দার, ভিতরে এসো—

ঝগড়ু হাবুর হাত ধরে নাওয়ের কামরার মধ্যে ঢুকলো।

এতো বড় নৌকায় হাবু কখনো ওঠেনি। নাওয়ের সমস্ত ছাদটা জুড়েই একখানা মস্ত ঘর। ঘরে একটি টিমি লণ্ঠন জ্বলছে, তাতে আলো যা হচ্ছে তাতে ভালভাবে কিছু নজর করা সহজ নয়। একপাশে একখানি খাটিয়ার উপর একটি লোক উঠে বসেছে। তাকে উদ্দেশ করেই ঝগড়ু বললো—এই ছোকরাকে নিয়ে এলাম, আমার কামারশালার শাগরেদ, আজ থেকে এ তোমার এখানেই ভর্তি হলো।

—কামারশালা চালাবে কে?—খাটিয়ার মানুষটি এবার কথা কইল।

—কামারশালা উঠে গেল, কোম্পানির ফৌজ কাল গাঁ জ্বালিয়ে দিয়েছে, গাছের ডালে ডালে মানুষ ঝুলিয়ে দিয়েছে। কুসুমিয়ায় আর জনমনিষ্যি নেই।

এবার কাপতেন জিজ্ঞাসা করলো—তোর নামটা কি রে? বলিসনি তো?

—হাবু।

—ভাল নামটা কি?

—তা তো জানি না। ভাল নামে তো কেউ কখনো ডাকেনি।

—নিজের ভাল নামটাও জানিস না? তুই কি রে!

এবার ঝগড়ু বললো—ছেলেবেলায় বাপ-মা মরেছে, বিধবা পিসির কাছে মানুষ। পিসি মরণকালে আমার হাতে দিয়ে গেল—ছেলেটাকে দেখিসরে—ওর পিসি আমার কাকীমা।

—এখন ঝগড়ু সর্দারের হাত থেকে এসে পড়লো কাপতেন বাহাদুর সিংহের হাতে। থাক্—থেকে যা—চুল্লীর পাশে আর হাতুড়ি পিটতে হবে না।

হাবু সেই নৌকাতেই রয়ে গেল।

অতো বড় গহনার নাও, কিন্তু মাঝিমাল্লা মাত্র দশজন, তাদের সঙ্গে কাপতেন বাহাদুর আর ঝগড়ু সর্দারকে নিয়ে হয় বারো জন, হাবুকে নিয়ে হলো তেরো। কাপতেন বললো—আমরা ছিলাম বারো, তোকে নিয়ে হলাম তেরো। লালমুখোদের কাছে তেরো নম্বরটাই অপয়া, আমি এক সাহেবের খানসামা ছিলাম, তেরো হলেই সাহেব চমকে উঠতো। তুই হলি আমাদের জাহাজের অপয়া! দেখি, তুই তো এলি, আমাদের রোজগার-পত্তর কেমন হয়।

হাবু বললো—তুমি সাহেবের খানসামা ছিলে?

—এখনও খানসামাই থাকতাম, সাহেব লড়াইয়ে মারা গেল, তাই। সাহেবের ইংরিজী বুকনিও আমি জানি—ইয়েস, নো, ভেরী ওয়েল, গুড, ব্যাড, ড্যাম, থ্যাংক ইউ। আর সাহেবী গালাগাল শুনবি—ইসটুপিট, রাসকেল, ড্যামফুল, ইডিয়ট... সব জানি। সাহেবদের অনেক গপ্প আমার জামার পকেটে আছে।

বাহাদুর সিং হা-হা করে হেসে ওঠে। ওর হাসিটা কেমন

যেন ডাকাতের মতো, শুনলেই হাবুর ভয় করে।

হাসি থামিয়ে বাহাদুর বলে—যা, বিকেল হয়ে এলো, এবার তোর ডিউটি করগে যা—

হাবুর এখানে একটা মাত্র কাজ ঝগড়ু দিয়েছে, নৌকোর উপর দুটো মাস্তুল, মাস্তুল দুটোর উপর দিকে এক একখান তক্তা বাঁধা আছে, সেই একখানি তক্তার উপর প্রহর খানেক বসে থাকতে হবে, নদীর পানে তাকিয়ে। যখনই কিছু নজরে আসবে হাঁক দিয়ে নিচে জানাতে হবে।

কাজটা কঠিন নয়, কিন্তু যখন হু হু করে বাতাস বয়, তখনই হয় মুস্কিল। পায়ের নিচে কাঠখানা নড়ে, দুহাত দিয়ে মাস্তুলটা জড়িয়ে থাকতে হয়। পড়লে তো আর রক্ষে নেই।

তিন দিন ধরে হাবু এই কাজই করছে সারা বিকালটা, সন্ধ্যা অবধি। যা দেখে হাঁক দেয়—তিনখানা পানসি যাচ্ছে...সামনে ঘাট...পিছনে হাট বসেছে...বাঁয়ে ধানজমি...জঙ্গল—ঘন জঙ্গল।

যেদিন যখন হুকুম হয় হাবুকে মাস্তুলে উঠে বসতে হয় আর চিৎকার করতে হয়। এতে লাভ যে কি হয় হাবু বোঝে না।

বুঝলো দুদিন পরে।

সেদিন দুপুরে হাবু বললো—ওদিকে একটা খাল, খালের ধারে পানসি ভিড়েছে, পানসির লোকেরা নেমে রান্না করছে।

সঙ্গে সঙ্গে কাপতেন নৌকার ছাদে উঠে এলো, একবার সেই দিকে ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে বললো—নাও ভেড়াও।

পানসিখানা দাঁড়িয়েছিল খালের মুখে, কাপতেনের নৌকা ভিড়লো তার পাশে। কাপতেন হাঁক দিল—কার নাও ?

পানসির ছাদে পাহারা ছিল, সে সাড়া দিল—গোবিন্দপুরের চৌধুরীবাবুর পানসি। তোমরা কারা ?

—আমরা ফৌজদারের সিপাই।

—এখানে সুবিধা হবে না। তফাৎ যাও।

—আমাদের পাওনাটা দাও।

—তফাৎ যাও। আমাদের বন্দুক আছে। গুলি চালাবো।

—বন্দুক আমাদেরও আছে।

—ঠিক হ্যায়, হুঁশিয়ার।

দুজন বরকন্দাজ পানসির ছাদের উপর বন্দুক বাগিয়ে ধরলো। বললো—তফাৎ যাও।

কাপতেন হাঁক দিল—জান কবুল, পানসি ধরো—

নাও ভিড়লো পানসির গায়। ফট্ ফট্ করে গুলি ছুটে এলো। একটা গুলি এসে লাগলো বাহাদুর সিংহের হাতে। আরেকটা গুলি লাগলো কামরার দেয়ালে।

কাপতেন ইতিমধ্যে নৌকার ছাদে উঠে গিয়েছিল, পাশে দুটি বন্দুক। কাপতেন একটা বন্দুক তুলে বগলে চেপে ধরে গুলি চালালো। তারপর সেটাকে রেখে আরেকটা বন্দুক তুলে নিয়ে আরেকবার গুলি। দুই গুলিতে পানসির ছাদের উপর দুটি বরকন্দাজ ধরাশায়ী হলো।

গাদা বন্দুক একবার গুলি ছুঁড়লে পরের বারে গুলি ছুঁড়তে সময় লাগে। ঝগড়ু বন্দুক দুটির পাশে বসে টোটা গাদতে শুরু করলো।

পরক্ষণেই এই নৌকার কয়েকজন দাঁড়ী লাফিয়ে পড়লো চৌধুরীবাবুর পানসিতে। একটা সামান্য হৈচৈ উঠলো। ঘরখানির মধ্যে ছিল এক রমণী ও একটি পাঁচ-ছ বছরের ছেলে। তারা কেঁদে উঠলো।

ওদিকে ঘাটে উঠে যারা রাঁধছিল, তাদের দুজন দুখান জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তেড়ে এলো। কাছাকাছি আসতেই দুই বল্লমের ঘায়ে দুজনেই ধরাশায়ী। কাপতেন চিৎকার করে বললো—গোল করলেই জান যাবে। পেয়াদা দুজন গেছে, যদি মরতে চাও তো এগিয়ে এসো, নাহলে যে যেমন আছ থাকো।

তারপর ঝগড়ুর পানে তাকিয়ে বললো—সর্দার, তদারক করো, আমি হাতে একটা পট্টি বাঁধিয়ে নিই। হাবু, ঘরে আয়—

হাবুকে নিয়ে সর্দার ঘরে ঢুকলো। বাঁ হাত দিয়ে টসটস করে রক্ত ঝরছে। ঘরের কোণে একটা বেতের তোরঙ্গ থেকে একটা কাঠের ঘোরা বের করলো। তার মুখের সরাটা খুলে বললো—গুলিটা বেরিয়ে গেছে, রক্তটা ন্যাকড়ায় মুছে নিয়ে এই নিম-ঘি ভাল করে লাগিয়ে দে, তারপর কলাপাতা দিয়ে বেঁধে দিবি।

হাবু কাপতেনের হাতে পট্টি বাঁধতে বাঁধতে পানসির উপরের হাঁকডাক সব কমে গেল।

হাবু পট্টি বাঁধা শেষ করেছে এমন সময় কয়েকটা পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে কয়েকজন দাঁড়ী এই নৌকায় ফিরে এলো। ঝগড়ু বললো—কাপতেন, কাজ শেষ।

—কেমন হলো ?

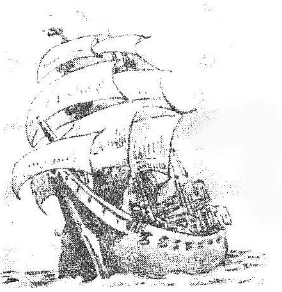

—খুব একটা কিছু নয়, দুথলি টাকা আর কিছু গয়না।

—গয়না কি মেয়েদের গা থেকে জুলুম করে খুলে নিয়েছ ?

—মেয়েদের আর কোথা ? চৌধুরী গিন্নী আর একটা ছেলে। গিন্নী খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বললো—মারধোর করোনি বাবা, যা আছে নিয়ে যাও—গায়ের গয়না নিজেই সব খুলে দিলে। ছেলেটার গলায় একগাছা হার ছিল, তা-ও দিয়ে দিলে। ঘাটের মানুষগুলো আর পানসিতে উঠে আসতে সাহস পায়নি।

—যাক, ঝামেলা মিটে গেছে। এবার এখান থেকে কেটে পড়ো।

—তোমার হাতখানা তো জখম হলো কাপতেন।

—অমন একটু আধটু হবেই, ওসব কিছু না।

পোঁটলাগুলো ঝগড়ু ঘরের এক কোণে রাখলো, দাঁড়ীরা চলে গেল, তারপরেই নৌকা নড়ে উঠলো, হাবু বুঝলো নৌকা চলতে শুরু করেছে।

কাপতেন বললো—হাবু, এবার দু'কলকে তামুক সাজ।

হুঁকো হাতে নিয়ে সর্দার বললো—হাবু, এবার বুঝতে পারলি তো, মাস্তুলের উপর দাঁড়িয়ে কেন দেখিস, কি হয়?

হাবু বললে—পানসিটা তোমরা লুঠ করলে?

ঝগড়ু বললো—গোবিন্দপুরের চৌধুরীবাবুর পানসি। জমিদার। প্রজাদের লুঠ করেই জমিদারি। ক'পুরুষ ধরে লুঠ করছে কে জানে। আমরা সেই লুঠেরই আজ একটা বখরা নিলাম।

পরদিন দুপুর থেকেই আকাশটা কেমন, বাতাস নেই।

বাহাদুর সিং বললো—আজ নির্ঘাৎ ঝড় হবে। সুবিধামতো একটা খাড়ির মধ্যে নাও ঢোকাতে হবে। নাহলে ঘূর্ণি উঠলে সামাল দেওয়া যাবে না।

বিকাল অবধি নজর করেও সুবিধামতো একটা খাড়ি বা খাটাল পাওয়া গেল না, যার আড়ালে নৌকা রাখা যায়। ওদিকে পশ্চিমের আকাশ কালো হয়ে আসছে।

একসময় দমকা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগলো। বাহাদুর সিং বললে—ওই বড় বটগাছটার আড়ালে নাও রাখো। পিছনে অনেকগুলো বড় বড় গাছ আছে। ঝড়ের দাপট কম সইতে হবে।

আবার দমকা বাতাস এসে লাগলো পালে। বাহাদুর তাড়াতাড়ি নিজে হালে গিয়ে বসলো। নৌকা ভিড়িয়ে দিলে বটগাছটার আড়ালে।

তারপরেই বাতাসে সাড়া জাগলো—সোঁ—সোঁ—

গাছের পাতার ঝটাপটিতে সেই বাতাস যেন আরো জোরালো বলে মনে হলো।

একজন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বটগাছটার সঙ্গে নাওখানা বেঁধে ফেললো। পালখানা আগেই নামানো হয়েছিল। ক'জন লগি হাতে নিয়ে বসলো নৌকার দুই কিনারায়।

দেখতে দেখতে নদী উত্তাল হয়ে উঠলো, বাতাসে দেখা দিল ঝড়ের বেগ। বাতাসের ধাক্কায় নৌকা গিয়ে পড়ছে ঘাটের উপর। মাঝিরা লগি দিয়ে ঠেলে রাখছে, ঘাটে ধাক্কা লেগে নৌকা না ভেঙে যায়। আবার তখনি পালটি ঢেউ নৌকাখানাকে ঠেলে দিতে চাইছে মাঝদরিয়ায়। মনে হচ্ছে এবার বুঝি কাছিটা ছিঁড়ে যাবে। মাঝিরা যতটা পারে এই টালমাটাল সামাল দিচ্ছে।

কাপতেন, ঝগড়ু আর হাবু ঘরের মধ্যে বসে আছে, আর দোল খাচ্ছে নৌকার দোলানির সঙ্গে।

কাপতেন একসময় বললো—কি রে হাবু, ভয় করছে?

হাবু বললো—তোমরা রয়েছ,ভয় করবে কেন? আমি তো সাঁতার জানি।

কাপতেন বললো—এই তুফানে তুই সাঁতার দিবি? এই নদী পার থেকে মানুষ টেনে এনে মাঝদরিয়ায় ডুবিয়ে দেয়।

মাঝে মাঝে ঝড়ের ঝাপটার ফাঁকে নৌকাটা স্থির হয়। কাপতেন হাঁক দেয়—হুঁশিয়ার!

দাঁড়ীরা সাড়া দেয়—ঠিক হ্যায়।

মাঝে মাঝে গাছটা এমন নত হয় যে হাবু ভয় পায়, বলে—গাছটা ভেঙে পড়বে না তো নাওয়ের উপর!

বাহাদুর সিং বললো—সে আমাদের বরাত। পড়লে করার কিছু নেই। বসে বসে দুর্গানাম জপ না?

হাবু যেন এতক্ষণে একটা কিছু করার মতো কাজ পেল। বসে বসে দুর্গানাম জপতে শুরু করলো। ডাঙায় সে অনেক ঝড় দেখেছে, কিন্তু নদীতে এই ঝড় তার জীবনে এই প্রথম।

রাত প্রথম প্রহর শেষ হয়ে এলো, ঝড়ও কমলো। বৃষ্টি নামলো। বাইরের মানুষগুলো এবার নৌকার ঘরের মধ্যে চলে এলো, আর ভয়ের কিছু রইল না। তুমুল বৃষ্টির দাপটে চারিপাশ ভেসে গেল।

বৃষ্টি যখন কিছুটা কমলো তখন নৌকার খোলে জল জমেছে, মগ ও বালতি নিয়ে কয়েকজন বসে গেল জল ছেঁচতে।

জল ছেঁচা শেষ হলো আর আকাশেও চাঁদ উঠলো। মনে হলো সারা আকাশ যেন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। তারাগুলোকে কেউ কেউ সদ্য মেজে-ঘষে দিয়ে গেল। কাপতেন বললো—চল, এবার সবাই ছাদে যাই।

ছাদে এসে বাহাদুর বললো—চারিপাশে কি বাহার দেখছিস। এই বাহার ডাঙায় পাবি না, তাই আমি নদীতে থাকতে ভালবাসি।

খানিক ছাদের উপর পায়চারি করে বাহাদুর বললো—এবার নাও বাইরে ফাঁকায় বের করে নে। এখানে রাতে নাও রাখলে জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে রাতে কাকে আবার টেনে নিয়ে যাবে।

নৌকা বাহির দরিয়ায় আসার ব্যবস্থা হলো।

গাছটাকে ঘুরে নৌকা এদিকে আসতেই হাবু বললো—কর্তা, একখানা নৌকো উল্টে পড়ে আছে।

ঝগড়ু বললো—এই জলঝড়ে এত বড় নদীতে দু দশখানা নাও তো যাবেই।

হাবু বললো—শুধু নাও নয় গো, পাশে একজন মানুষও পড়ে আছে।

—মানুষ পড়ে আছে?—বাহাদুর সিং এদিকে এলো, দেখে বললো—তাই তো দেখছি। পল্টু, দেখ তো নাওখানার পাশে একটা মানুষ পড়ে আছে।

পল্টু ছাতে বসে ছিল, নাও ভিড়িয়ে দিল সেইখানে।

জল কম, দুজন মাঝি লাফিয়ে পড়লো। মানুষটার কাছে গেল, নেড়েচেড়ে দেখলো, তারপর তুলে নিয়ে এলো নৌকায়।

মানুষটি বেঁচে গেল।

বাহাদুর সিং একবার মানুষটির বুকে হাত দিয়ে নাড়ি দেখে বললো—বুকে পিঠে সেঁক দে, বেঁচে যাবে।

হাবু মাটির গামলায় কাঠকয়লার আগুন করলো, তার উপর লোহার কড়াই চাপালো। সেই কড়াইয়ের উপর গামছা তাতিয়ে লোকটির বুকে পিঠে সেঁক দিতে শুরু করলো।

ঘন্টাখানেক পরে মানুষটি নড়েচড়ে চোখ মেললো। কাপতেন বললো—এবার একটু গরম মিছরির জল দে—দুধ তো নেই।

গরম মিছরির জল পেটে পড়তেই মানুষটা চনমন করে উঠলো। মুখে কথা ফুটলো—কে? তুই কে? কার নাও?

হাবু বললে—বাহাদুর সিংয়ের নাও। কাপতেন বাহাদুর সিং।

—কাপতেন? কোম্পানির লোক?

কাপতেন সাড়া দিলে—না গো না। আমি কোম্পানির লোক নই।

—কোম্পানির লোক শয়তান—শয়তান। কামান দেগে আমাদের পানসিখানা ঝড়ের মুখে ডুবিয়ে দিলে। দশজন ছিলাম, কে কোথায় ভেসে গেল।

সর্দার বললো—তোমার নাম কি?

—ছোটেলাল। আসছিলাম ত্রিবেণী থেকে।

হাবু আরো কিছু শুনতে চায়। কিন্তু মানুষটি চুপ করে যায়।

হাবু তখনও সেঁক দিচ্ছে। কাপতেন বলে—আর সেঁক দিতে হবে না রে। এবার আমার তামাক সাজ।

তামাক সাজতে দেখে ছোটেলাল উঠে বসে। বলে—আমাকেও এক কলকে দাও—

এক কলকে তামাক খেয়ে ছোটেলাল চনমনে হয়ে ওঠে, কাপতেন বলে—বল, এবার তোমার কথা শুনি—

ছোটেলাল বলে—তাহলে আর এক কলকে দাও, তোমাদের তামুকটা ভাল—বেশ কড়া—

তারপর ছোটেলাল বলতে শুরু করে—আমার কথা নতুন কিছু নয়। হার্মাদরা গাঁয়ে হামলা করেছিল, ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিলে,মানুষগুলোকে বেঁধে জাহাজ তুললো। তারপর সবাইকে নিয়ে গেল বিকেলে বিক্রি করতে, শুধু আমাকে নিলে না। কাপতেন বললো—আমার একজন ছোকরা খিদমতগারের দরকার, তুই থাক আমার কাছে, তোকে আমি একজন পাকা হার্মাদ বানাবো। সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা। এই বিশ বছর কাপতেনের খিদমৎ খেটেছি। কাপতেন আমাকে বন্দুক ধরতে শিখিয়েছে, তলোয়ার ধরতে শিখিয়েছে। আমিও হার্মাদ হয়ে গেছি। জাহাজে থাকি, মাঝে মাঝে সুবিধামতো লুঠতরাজ করি, দিন কাটে। মারামারি খুনোখুনি করতে করতে আমি ছত্রীর ছেলে একটা পুরো ডাকাতই হয়ে গেলাম। বাকি দিনগুলোও হয়তো এইভাবেই কাটতো, কিন্তু গোলমাল বাধলো ইংরেজদের সঙ্গে। সুন্দরবনের ধারে মেঘনার চড়ায় আমাদের আস্তানা ছিল, ইংরেজ কাপতেন একদিন দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠলো। বললো—এই চড়াটা তোমরা ছেড়ে দাও। এখানে অনেক গাছপালা আছে, সহজে বানভাসি হয় না। তা আমরা অমন উঁচু চরটা ছাড়বো কেন? ইংরেজ কাপতেন বললো—এ চর আমরা কেড়ে নেবো। তারপর থেকে নদীতে আমাদের জাহাজ দেখলেই তারা সুবিধামতো কামান দাগে। আমরাও জবাব দিই। এই চলছে আজ প্রায় ছ'মাস। কাল ঝড়ের মুখে সুবিধা পেয়ে ওরা আমাদের জাহাজখানাকে ডুবিয়ে দিলে। দুখানা ডিঙি ছিল, সবাই উঠেছিলাম ডিঙিতে। আমরা ডিঙিতে ছিলাম দশজন। ঝড়ের মুখে ডিঙি ওলটালো, ঘাটে এসে ডিঙি ওলটালো, আমরা তুফানে তলিয়ে গেলাম। আয়ু আছে, মরবো কেন? তোমরা বাঁচিয়ে দিলে।

বাহাদুর বললো—যাক্ যখন মরনি, এখন দুটো মুড়ি-বাতাসা খেয়ে শুয়ে পড়, আজ আর তোমার ভাত চলবে না।

ছোটেলাল বললো—বেশি কিছু খাবো না। শরীরটা এখনও যুত হয়নি।

পানসি ঘাটে বাঁধা ছিল। দাঁড়ী মাঝিরা মুড়ি খেয়ে কেউ হাটে গিয়েছিল আনাজপাতি মাছ কিনতে, আর কয়েকজন হাতে একটা করে ছিপ নিয়ে নৌকার ছাদে বসেছিল। ঘরে ছিল ঝগড়ু সর্দার, কাপতেন বাহাদুর, হাবু আর ছোটেলাল। বসে বসে আয়েস করে তামুক খাচ্ছে। সকালবেলায় ঘাটে এক তামাকওলা এসে ভাল তামাক বেচে গেছে। তামাকটা বড় সুগন্ধী, পানসির ঘরখানা মেজাজী গন্ধে ম' ম' করছে।

একসময় ছোটেলাল বললো—কাল আমার কথা তো সব বলেছি কাপতেন, আজ তোমার কথা কিছু বল?

বাহাদুর বললো—আমার আবার কথা কি? তুমি ছিলে হার্মাদ আর আমি হলাম ডাকাত, দুজনে মিলে গেল।

—তুমি আসল কথাটা চাপা দিচ্ছ কাপতেন, সবারই একটা জীবনকথা আছে। একদিনে কেউ হার্মাদ হয় না, একদিনে কেউ ডাকাতও হয় না, তার আগের মানুষটা কেমন ছিলে সেই কথাটাই বল।

হুঁকোয় বেশ কয়েকটা টান দিয়ে বাহাদুর বললো—আমার কথা বলতে হলে কুমার সিংয়ের কথা বলতে হয়।

আমিও জগদীশপুরের মানুষ। আমি তার দলে লড়েছি। তাকে মরতেও দেখেছি। সেই সব কথাই তাহলে বলি। এই

লালমুখো ফিরিঙ্গিগুলো এসেছে, এদেশে লুঠ করতে। আগে ছিল হার্মাদ। এখন ব্যবসা করার নামে এখানকার রাজা হয়ে বসেছে। সুবিধামতো আমীর-ওমরাহ-জমিদারের বাড়ি লুঠ করছে। গাঁয়ের মাতব্বরকে কুঠিতে ডেকে এনে কয়েদ করেছে। এই সব অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্যই যারা বন্দুক ধরতে পারে, ঘোড়ায় চড়তে জানে, তারা সারা দেশ জুড়ে কোম্পানির সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিলে। অনেক রাজা মহারাজা নবাব, এমন কি তাদের বেগমরাও এই দলে ছিল। এক একদিকে এক একজন সেনাপতি ছিল।

এদিককার সেনাপতি ছিলেন, আবার জমিদার কুমার সিং। তারা কোম্পানির মালখানা লুঠ করলো, কয়েদখানা ভাঙলো। তখন এলো ডালটন সাহেব, কাপতেন পাঁচশো পল্টন নিয়ে। লড়াই করে সাহেব খতম হলো, তার ফৌজও খতম হলো। তখন এলো আয়ার সাহেব আরো বেশি পল্টন নিয়ে। তারা জগদীশপুর জ্বালিয়ে দিলে, সেখানে কুমার সিংয়ের বাড়ি ও শিবমন্দির ভেঙে মাঠ করে দিলে, জোয়ান মানুষগুলোকে কুমার সিংয়ের সিপাই বলে গাছে গাছে লটকে দিলে। কুমার সিং তার দলবল নিয়ে চলে গেল সসারামে। যাবার পথে কোম্পানির পল্টনের সঙ্গে তার দলের ছোটখাটো কয়েকটা লড়াই হলো। একদিন এক গোলা এসে লাগলো তার বাঁ হাতে। বন্দুকের গুলির ঘা, পাকবে, পচবে, কত কষ্ট দেবে। লড়াইয়ের হাঙ্গামার মধ্যে কে তার সেবা করবে? কুমার সিং তলোয়ার দিয়ে হাতখানা কেটেই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু হাত-কাটা যাওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। যতই পট্টি বাঁধুক, প্রচুর রক্তপাত হলো। কুমার সিং এমনই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে চলাফেরার সামর্থ্যও আর রইল না। সেই অবস্থায় তিনি আবার জগদীশপুরে ফিরে এলেন। সেখানে তখন হুকুমদারি চালাচ্ছে কাপতেন গ্রান্ড। খাটিয়ায় শুয়ে শুয়েই কুমার সিং লড়াই চালালেন। কাপতেন গ্রান্ড খতম হলো, ফিরিঙ্গি ফৌজ পালালো। কুমার সিং জগদীশপুর দখল করলেন। কিন্তু সেই শরীরে এতো পরিশ্রম সইল না। কুমার সিং মারা গেলেন। এবার দলের নেতা হলেন কুমার সিংয়ের ভাই অমর সিং আর কুমার সিংয়ের ছেলে খতিভঞ্জন সিং। তারাই এখন কোম্পানির সঙ্গে ওই অঞ্চলে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

ছোটেলাল বললো—তুমি যা বললে তার কিছু কিছু তো জানি, এসব তো জগদীশপুরের কুমার সিংয়ের কথা, তোমার কথা তো বললে না?

—আমিও জগদীশপুরের লোক, কুমার সিংয়ের দলে থেকে এক বছর লড়েছি, তারপর সসারামের পথে পায়ে একটা চোট খাই, পালিয়ে যাই পাটনায়। ওখানে আমরা কজনে এই প্যানসিখানা দখল করি। হার্মাদরা ঘাটে পানসি রেখে ডাকাতি করতে নেমেছিল, আমরা পানসিখানা নিয়ে সরে পড়ি। তারপর এই গঙ্গার বুকে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে ছোটখাটো অনেক হাঙ্গামা বাধিয়েছি, কিন্তু ওদের কায়দা করতে পারিনি।

—বুঝলাম। হাঙ্গামা তো করছ, কিন্তু খাওয়া-পরা চলছে কি করে, টাকাপয়সা পাচ্ছ কোথায়?

—তখন ডাকাতি।

—আমি ওইটেই শুনতে চাইছিলাম। এখনকার দিনে ভালভাবে বাঁচতে হলে ডাকাতি ছাড়া পথ নেই।

ঝগড়ু সর্দার এবার কথা বললো—কিন্তু আমাদের নিজেদের বাঁচাটাই তো কথা নয়। আমাদের আরো বড় ঝামেলা আছে। আমাদের টাকার যোগান দিতে হয় অমরবাবু, আর খতিভঞ্জনবাবুকে—লড়াইয়ের খরচ।

—এই নৌকো লুঠ করে সেই খরচ কি উঠবে?

—যতটুকু হয়। সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালীর গায়ের ধুলোরও দাম আছে।

—তোমাদের কাজটা ভাল। আমিও তোমাদের কিছু টাকার যোগাড় করে দিতে পারি।

—তুমি আর একা কি করবে, হয় আমাদের দলে ভিড়বে, আর না হয় রাতের বেলা নির্জন পথে লোকের মাথায় লাঠি মারবে। অবশ্য সিঁদ কাটতেও পার। একা একা বিশেষ কিছুই করা যায় না, বড় কাজে দল চাই।

—এ কাজ আমি একাই পারবো, একটু ভেবে দেখি।

দিন তিনেক পরে একজন লোক এলো ত্রিবেণীর ঘাটে। বাহাদুর সিংয়ের চেনা মানুষ, বললো—কুমার বাহাদুর টাকা চেয়েছেন।

বাহাদুর বললো—কত আছে জানি না, এসো হিসাব দেখি।

কামরার এক কোণে চৌধুরীবাবুর পানসি থেকে আনা পোঁটলা দুটি জমা ছিল। বাহাদুর সে দুটি খুলে ফেললো। পাওয়া গেল দুটো টাকার থলিতে দুশো টাকা, আট গাছা চুড়ি আর দুটো গলার হার। আরেক পোঁটলায় কয়েকখানা ধুতি, শাড়ি, দুখানা শাল, দুটো মশারি, দুখানা শতরঞ্চি। দেখে শুনে ঝগড়ু বললো—টাকা আর গয়নায় শ তিনেক টাকা। আর এগুলো সব ফালতু।

আগন্তুক বললো—এই নিয়ে যাই, যেখানে যা পাওয়া যাবে সবই কাজে লাগবে।

ছোটেলাল সব দেখছিল, এবার বলে উঠলো—ফিরিঙ্গি কোম্পানির সঙ্গে লড়াই, দু তিনশো টাকায় কি হবে? আমি টাকা দোব—তিন দিন সময় দাও—

ঝগড়ু বললো—তুমি টাকা দেবে? কত টাকা?

—যত লাগবে, দু-দশ হাজার।

ঘরের মানুষগুলির মনে হলো, ছোটেলালের বোধহয় মাথায় গোলমাল আছে। ছোটেলাল তাদের মুখের পানে তাকিয়ে বললো—আমি পাগল নই। আমার মাথা ঠিক আছে, টাকা আমি দোব। তিন দিন সময় চাই।

সুন্দরবন শুরু হবার মুখেই ভাগীরথীর বুকে একটি চর।

মস্ত চর। নদীর একটা ফালি চরের ভিতরেও খানিকটা ঢুকে গেছে। ঝড়জলের মাঝে সেই খাড়ির মধ্যে নৌকো রাখার খুব সুবিধা। আগাগোড়া চরটাই আগাছার জঙ্গলে ভরা। তবে দু চারটে বড় বড় গাছও আছে।

পরদিন সকালে হাবুদের নৌকো এসে ঢুকলো সেই খাড়িতে। খাড়ির মুখে বড় বড় কয়েকটা বাঁশ পোঁতা। ছোটেলাল বললো—এই খুঁটিতে নাও বাঁধো। তারপর চল আমার সঙ্গে।

ঝগড়ু বললো—প্রথমে আমি একাই যাই, সব দেখে শুনে আসি—

হাবু বললো—ঝগড়ুকাকা, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

—তুই যাবি? কোনো বিপদ ঘটলে সামাল দিতে পারবি?

—একটা বল্লম নিয়ে যাই, দরকার হলে চালাবো।

বাহাদুর বললো—যায় তো যাক্ না, সাহস বাড়ুক।

ছোটেলাল, ঝগড়ু ও হাবু এক হাঁটু জল ভেঙে চড়ায় এসে উঠলো।

সামনেই আগাছার জঙ্গল। তারই ফাঁকে ছোটেলাল এলো এক-পায়ে চলা সংকীর্ণ পথে। বেশ খানিকটা আগিয়ে যাবার পর তিনজনে কয়েকটা গাছের আড়ালে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লো। পাশাপাশি ছোট ছোট কয়েকখানি ঘর। ঘরগুলি উঁচুতে ছোট, কিন্তু পরিসরে প্রশস্ত। ছোটেলাল বললো—এইটেই হার্মাদদের ছাউনি, নদীর দিক থেকে কিছুই নজরে আসে না।

ঘরগুলো পার হয়েই একটা ডোবা। ডোবার চারিপাশেই ঘন আগাছার ঝোপজঙ্গল। ডোবায় নামবার কয়েকটা কাঁচা সিঁড়ি। ছোটেলাল পাশের ঝোপটার মুখে দাঁড়িয়ে পড়লো, বললো—এইখানেই দুটো সিন্দুক আছে।

ঝগড়ু বললো—চল দেখি—

হাবুর হাত থেকে বল্লমটা নিয়ে ছোটেলাল দুপাশের ঝোপের উপর খানিক পেটাপিটি করলো। বললো—সাপের ভয় আছে, সাবধানে যেতে হবে।

এবার হাতের রামদা দিয়ে আশপাশের ঝোপঝাড় কোপাতে কোপাতে এগোলো। একটা ঝোপের সামনে এসে বললো—ওই দেখ সিন্দুক!

সত্যিই সামনে একটা বড় কাঠের সিন্দুক রয়েছে।

ছোটেলাল বললো—আর একটু আগে আরো একটা আছে।

ঝগড়ু বললো—এই সিন্দুক সরাতে অন্ততঃ জনা চারেক লোক লাগবে।

ছোটেলাল বললো—সিন্দুক সরাবো কেন, থলি নিয়ে আসবো। সিন্দুক খুলে থলিতে ভরে নিয়ে যাবো। সহজ হবে।

ঝগড়ু একখানা টাঙ্গি নিয়ে এসেছিল। টাঙ্গি দিয়ে সিন্দুকটার উপরে একটা কোপ মারলো। পাশ থেকে একটা সাপ ফোঁস করে লাফিয়ে পড়লো ছোটেলালের উপর। ছোটেলাল সাবধান হবার অবকাশ পেলে না। সাপ ছোবল

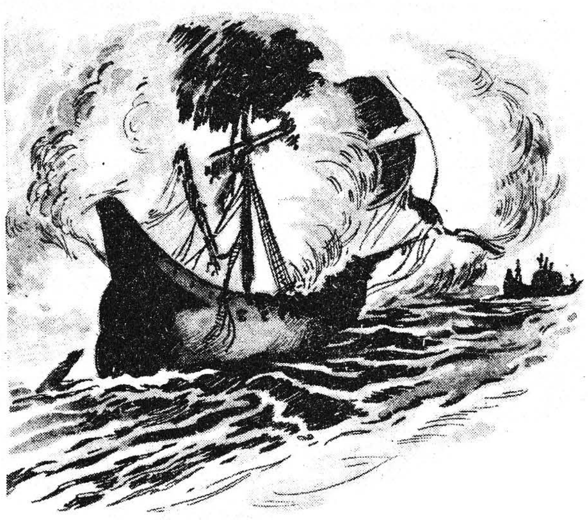

বারুদের পিপে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল

মারলো। ছোটেলাল তৎক্ষণাৎ ডান হাত দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধরলো, বললো—তুই আমাকে কাটলি, আমিও তোকে কেটে যাই।

রামদাখানা বাঁ হাতে ছিল, ছোটেলাল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সাপের মাথাটা কেটে ফেললো।

সাপ তো শেষ হলো। ছোটেলালের মাথার মধ্যেও তখন ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে, সে সেইখানেই বসে পড়লো। ঝগড়ু তার কামড়ানো ক্ষতটা তখনই টাঙ্গি দিয়ে চিরে ফেললো, তারপর মুখ দিয়ে রক্ত চুষতে শুরু করলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেক রক্ত সে টেনে বের করলো বটে, কিন্তু তবু ছোটেলাল আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। ঝগড়ু বললো—সিন্দুক পরে দেখা যাবে। আগে এই সাপে-কাটা মানুষটাকে নৌকায় নিয়ে চল—

ঝোপঝাড় পার হয়ে নদীর ধারে এসেই তারা চমকে গেল। ওদিকে একখানা পানসি থেকে ফিরিঙ্গিরা নামছে। একেবারে তাদের চোখের সামনে এসে পড়েছে।

—হুকুমদার! বলে একজন হাঁক দিল।

ঝগড়ু তাড়াতাড়ি চিৎকার করে উঠলো—জেলিয়া—জেলিয়া—মাছধরা—

লোকটা ঝনাৎ করে বন্দুকটা বগলে চেপে ধরেই দড়াম করে একটা গুলি ছুঁড়ে দিলে। ঝগড়ু লাফিয়ে উঠে সেইখানেই বসে পড়লো। বললে—ব্যাটা, শয়তান, মিছামিছি আমাকে গুলি করলে।

হাবু বললো—কোথায় লাগলো?

—পায়ের গুলিতে।

—গামছাখানা দিয়ে বেঁধে দিই—

কিন্তু বাঁধবে কি, দড়াম করে আরেক গুলি। গুলিটা ঝগড়ুর কপাল ফুটো করে দিলে। ঝগড়ু ঘুরে পড়ে গেল।

হাবু রীতিমত চমকে গেল, ঘাবড়ে গেল, সাহেবের হাতে বন্দুকটা তখনও ধরা আছে। হাবু দৌড় দিল জঙ্গলের মধ্যেই।

খানিকটা গিয়েই হাবুর খেয়াল হলো, সে তো ফিরিঙ্গিদের ছাউনির দিকেই যাচ্ছে, কিন্তু এই জঙ্গলে আর তো কোনো দিকে যাবার পথ নেই।

হাবু আবার দৌড়ালো। ছাউনির সামনে গিয়ে সে ফাঁকায় পড়লো। তারপর সেই ফাঁকার দিকে নজর রেখেই আবার ফিরলো নদীর দিকে। নানা ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে অনেক ঘোরাফেরা করে সে আবার ফিরে এলো নদীর ধারেই। এখান থেকে তাদের নৌকাখানাও নজরে আসছে, নজরে আসছে ফিরিঙ্গিদের জাহাজখানাও। কারও নজরে পড়ার ভয়ে হাবু বসে পড়লো, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তাদের পানসিখানার পানে। তাদের পানসিতে কোনো মানুষ আছে বলে মনে হলো না। তাদের মানুষগুলো গেল কোথায়?

সন্ধ্যার অন্ধকার অবধি হাবু সেই ঘাটেই বসে রইল।

অন্ধকার হতেই কোমরে গামছাখানা বেঁধে হাবু জলে গিয়ে নামলো। নিঃশব্দে চললো তাদের নৌকার দিকে।

নোঙর করার রশিটা ধরে ভয়ে ভয়ে সে নৌকার উপর উঠে এলো। ঘরখানার দরজার পাশ দিয়ে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারলো, তারপর টুপ করে ভিতরে ঢুকে পড়লো। অন্ধকারের মাঝে কয়েকটা মানুষ পড়ে আছে বলে মনে হলো। মড়া নাকি? কিন্তু মরে গেলে তো নদীর জলে ফেলে দেবে, ঘরের মধ্যে থাকবে কেন? ঘরের কোণে উনুনটার পানে নজর পড়লো। হাবু তা থেকে কাঠকয়লার কয়েকটা টুকরো নিয়ে ছুঁড়ে মারলো মানুষগুলোর পানে।

সাড়া উঠলো—আঃ!

হাবু আরও কাঠকয়লার টুকরো ছুঁড়লো।

—আঃ! কে রে?

হাবু জবাব দিলে—কাপতান!

—কে রে হাবু?

—তোমরা এমনভাবে পড়ে আছ কাপতান?

—সে সব কথা পরে, আগে আমাদের হাত-পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দে দিকি।

—এই অন্ধকারে কি বাঁধন খুলতে পারবো?

—ছোরা দিয়ে কেটে ফেল।

—আমার কাছে ছুরিছোরা কিছুই নেই। তোমাদের ছোরা কোথায়?

—সব কেড়ে নিয়েছে। দেখ তো উনুনের পাশে আনাজ কোটার বঁটিখানা আছে কিনা?

হাবু উনুনের পাশে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে বঁটি বের করলো। তারপর শুরু করলো বাঁধন কাটতে।

সবার আগে কাপতান পানসির ছাদের উপর উঠে গেল। তারপর নেমে এসে বললো—হার্মাদী জাহাজে তো আলো নেই, ব্যাটারা সব চরে নেমে গেছে, এই ফাঁকে আমরা কিছু খেয়ে নিই। সেই দুপুর থেকে এক কলকে তামাকও জোটেনি।

নদীর কাছেই ঝগড়ু সর্দার ও ছোটেলাল পড়েছিল। রাত দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যে সেই দেহ দুটি হার্মাদের জাহাজের উপর নিয়ে এলো বাহাদুর সিংয়ের মাঝিমাল্লারা। তারপর জাহাজের ছাদের এক ঘরে অনেক খড় জমা ছিল, হার্মাদরা বোধহয় খড়ের বিছানায় ঘুমাতো। মৃতদেহ দুটির চারিপাশে সেই খড় বিছিয়ে দেওয়া হলো। ডেকের উপর একটা কামান ছিল, একপাশে কয়েকটা গোলাও ছিল। কাপতেন নিচের ঘরে বারুদের পিপে বের করলো। সেই পিপের চারিপাশেও ভালমতো খড় বিছিয়ে দেওয়া হলো। কাপতেন বললো—এবার উপর নিচের খড়ে আগুন দাও। খড়ের আগুন বারুদের পিপেতে পৌঁছুতে যেটুকু সময় লাগবে, তারপরেই জাহাজ শেষ। ঝগড়ু সর্দার আর ছোটেলালের ঠিকমতোই সংকার হলো। নদীতেই তারা জীবনের অনেক দিন কাটিয়েছে, নদীতেই তাদের শেষ কাজ হলো।

চকমকি ঠুকে খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে সবাই নিজেদের পানসিতে ফিরে গেল।

প্রথমে খড়ের আগুন বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। যেটুকু জ্বললো জাহাজের মধ্যেই জ্বললো। তারপর ছাদের উপরের খড়গুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠলো। তখন চড়ার উপরের হার্মাদদের নজরে এলো। তারপর ভাল করে বোঝার আগেই বারুদের পিপে দাউ দাউ করে উঠলো। হার্মাদরা হৈ হৈ করে উঠলো। কিন্তু ভরপেট খাওয়া-দাওয়ার পর তাদের তখন এমন অবস্থা যে বেশিদূর চলাফেরার ক্ষমতা নেই।

পানসি থেকে অনেক দড়ি তিন-চারখানা কুড়ুল নিয়ে শেষ রাতে বাহাদুর চড়ায় নামলো, বললো—দুজন থাক, বাকি সবাই চল।

সাহেবরা তখনও দিব্যি ঘুমুচ্ছে, আটজন মাঝি গোটা পনেরো সাহেবকে ঘুমন্ত অবস্থায় দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো। দেহের সঙ্গে হাত-দুটো আর হাঁটুর নিচে পা দুখানায় দড়ি বাঁধা হলো। ফিরিঙ্গিরা বিড়বিড় করে কি সব বললো, কিন্তু তখনও ঠিক বুঝলো না ব্যাপারটা কি।

তারপর হাবু সবাইকে নিয়ে গেল সিন্দুকটার কাছে। বললো—আগে টাঙ্গি নিয়ে জনা চারেক তৈরি থাকো বাপু, সাপখোপ কোথায় কি আছে জানা নেই, আর বাকি ক'জন কুড়ুল চালাও।

লাঠি নিয়ে আশপাশের ঝোপঝাড়গুলো খালি পেটাপিটি হলো। কয়েকটা সাপ ছিটকে গেল। টাঙ্গিতে তিনটে কাটা পড়লো। কাপতেন বাহাদুর বললো—এবার সিন্দুক ভাঙো।

পুরু শালকাঠের সিন্দুক, একটা দিক কুপিয়ে ভাঙতে সময় লাগলো। সিন্দুকের একপাশের তক্তা যখন সরানো গেল তখন

সূর্য উঠেছে। দেখা গেল আট হাত লম্বা সিন্দুকটা সবটা টাকায় ভর্তি—শুধু টাকা আর টাকা।

হার্মাদের ছাউনিতে থলিও ছিল, ঝুড়িও ছিল। বাহাদুর বললে—ওই থলিতে আর ঝুড়িতে করে সব নিয়ে চল পানসিতে।

চল্লিশ ঝুড়ি টাকা। বাহাদুর বললো—এক এক ঝুড়িতে এক এক মণ হলে হাজার তিনেক হবে, তাহলে চল্লিশ ঝুড়ি মানে লাখখানেকেরও বেশি।৯ এই নিয়েই এখন যাই। আরেকটা সিন্দুক পরে এসে দেখবো। এর মধ্যে এখানকার এই ফিরিঙ্গি হার্মাদগুলো না খেয়ে শুকিয়ে মরুক।

হাবু বললো—এতো টাকা নিয়ে যাবে কোথা? অতো টাকা এই পানসিতেই থাকবে? ডুবে গেলে?

কাপতেন বললো—টাকা থাকবে জঙ্গলে, গাছের নিচে, এক গর্তে—দরকার মতো বেরুবে।

ত্রিবেণী পার হয়েই গঙ্গার তীর ধরে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। সে জঙ্গলের বিস্তার বহু ক্রোশ জুড়ে। সাধারণ মানুষ সেই জঙ্গল এড়িয়ে চলে। সেখানে ডাকাতের ভয় আছে, বাঘ-সাপও কম নেই।

জঙ্গলের মুখেই নদী একটা বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের মুখেই কোম্পানির একটি বুরুজ। বুরুজের উপর একটা ছোট কামান পাতা আছে, আর আছে কয়েকজন সান্ত্রী। বুরুজের মুখে কোম্পানির সিপাইরা নৌকা ধরে আর শুল্ক আদায় করে। কেউ তফাৎ দিয়ে সরে পড়তে চাইলে বুরুজের উপর থেকে কামান দাগে।

হাবুদের পানসি বুরুজের মুখে আসতেই সাড়া উঠলো—হুকুমদার!

বাহাদুর সিং সাড়া দিল—দোস্ত।

—কোথায় যাবে?

—হুগলী।

—ঘাটে নাও ভেড়াও।

বাহাদুর সিং বুরুজের মাথায় নজর করার চেষ্টা করলো। কিছুই ঠাহর হলো না, বললো—দেবুয়া, জোরসে—

পানসি বুরুজকে পাশ কাটালো।

বুরুজের মাথায় সাড়া জাগলো—পানসি রোখো—

কাপতেন সাড়া দিলে না।

বুরুজের উপর ফট্ ফট্ করে দুবার বন্দুকের আওয়াজ হলো। তারপরেই আগুন জ্বললো ও কামান দাগার আওয়াজ হলো।

জ্বলন্ত গোলাটা এসে পড়লো পানসি পার হয়ে।

বাহাদুর জোরে হাঁক দিলে—পানসি ঘাটে ভেড়াও।

হাবুদের পানসি ঘাটে ভিড়লো। বুরুজ থেকে একটু তফাতে।

বুরুজের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে কয়েকজন নেমে এলো। প্রথম-জনের হাতে একটি মশাল।

বাহাদুর নিম্নকণ্ঠে বললো—সড়কি সামলে—ছজন—

চারজন সিপাই ঘাটে এসে দাঁড়ালো, বললো—পানসি আরো কাছে আনো—

বাহাদুর বললো—আর যাবে না, জল কম।

—তক্তা নামাও—

পানসি থেকে জলের উপরেই একখানা তক্তা নামিয়ে দেওয়া হলো। সিপাইরা জলে নামলো। তারা তক্তার উপর একে একে উঠতেই বাহাদুর চাপা গলায় বলে উঠলো—সামালো দুশমন!

চকিতে চারটে সড়কি, চারজনকে ধরাশায়ী করলো। চারজনেই জলে পড়ে গেল।

বাহাদুর বলো—ঠিক হ্যায়, এবার পানসি ছাড়ো—

মুহূর্তমধ্যে তক্তাখানা তুলে নিয়ে পানসি তীরের মতো বেরিয়ে গেল বুরুজের পাশ দিয়ে। পানসির মাঝি-মাল্লারা এ বিষয়ে খুবই পাকা।

একটু পরে বুরুজের উপর থেকে আবার কামান দাগা হলো, হাবুদের পানসি তখন অন্ধকারে মিশে গেছে।

ঘন জঙ্গলের এক জায়গায় মস্ত এক বটগাছ। গাছটা পার হয়ে নদীটা একটু বেঁকেছে, বেশি বেঁকলেই একটা বদ্বীপ হতো। বাহাদুর সিং সেইখানেই নৌকা রাখলো। বললো—এইখানেই সব ব্যবস্থা করবো, এই বটগাছটা চিনতে কোনোদিন কারও ভুল হবে না। দিনের আলো ফুটুক, ভাল করে একবার দেখে শুনে নিই।

নোঙর করে কাপতেন ছাদ থেকে নেমে এলো। বললো—হাবু, তামুক।

তামুক খেয়ে কাপতেন সবাইকে ঘরে ডাকলো, বললো—কাল সকালে ওই ঘাটে নেমে বটগাছতলায় একদল রান্না করবে, আরেক দল তাদের আড়ালে গাছতলায় একটা বড় গর্ত খুঁড়বে। টাকাগুলো সেইখানেই রাখবো। নাও নিয়ে যারা যাবে তারা যেন গর্ত খোঁড়াটা বুঝতে না পারে। এখন সবাই খানিক ঘুমিয়ে নাও। দুপুর রাতে খাওয়া-দাওয়ার আর হাঙ্গামা করে দরকার নেই।

হাবুর যখন ঘুম ভাঙলো তখন সকালের রোদ নৌকার কামরায় ঝলমল করছে। হাবু তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো,

দেখলো ঘাটে উনুন জ্বেলে হাঁড়ি বসানো হয়ে গেছে ! আর যারা গর্ত কেটেছে তারা জলে নেমে হাত-পা ধুচ্ছে।

বাহাদুর সিং বললো—গর্তের মধ্যে কলসী করে টাকাগুলো রাখলেই ভাল হতো, তা অতো কলসী এখন পাই কোথা। কামরায় অনেকগুলো চাটাই আছে, নিচে ও চারপাশে চাটাইয়ের আড়াল দিয়ে তার উপর সব ঢেলে দাও।

তারপর আটজন মানুষ পুরো এক প্রহর ধরে শুধু টাকা সরালো।

এবার বাহাদুর কামরার ভিতর থেকে একটা লাল শালু জড়ানো মোড়ক নিয়ে এলো। মোড়কটি গাছতলায় রেখে গঙ্গায় স্নান করে এলো। তারপর সেই মোড়ক খুলে বের করলো একটি রূপোর ছোট্ট খাঁড়া। গঙ্গামাটির একটি ঢিবির উপর সে খাঁড়াখানি সোজা করে বসালো, বললো—সিঁদুর আর ফুল কই ?

একজন একখানি কচুপাতার উপর খানিকটা গোলা সিঁদুর নিয়ে এলো। আরেকজন একটি পাতার ঠোঙায় কিছু বনফুল সামনে ধরলো।

বাহাদুর সিং খাঁড়াটায় সিঁদুর মাখালো। তারপর সেটার উপর এক একটি করে ফুল ফেলে আর বলে—ওম্ শ্রীকালীমাতায় নমঃ, মহামায়ায় নমঃ, মহাশক্তি নমঃ, মহাভৈরবী নমঃ—

ইতিমধ্যে একজন এক ঠোঙা গুড় এনে সামনে রেখেছে। সেই ঠোঙা সমেত গুড় সে খাঁড়ায় ছোঁয়ালো। তারপর হাঁক দিল—মা মা—কালী করালী মহামায়া মা—তুই সব দেখিস মা—

তারপর মাটিতে মাথা ঠুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

তারপর বললো—এবার শপথ নাও—

পিছনে সব ক'জন মাঝি তখন সারি সারি বসে গেছে।

বাহাদুর বললো—সবাই বল—আমরা মায়ের নামে শপথ করছি, এখানকার এই টাকাপয়সার উপর আমরা লোভ করবো না। আমরা এক একজন একশো টাকা নেবো, বাকি সব টাকা এখানে থাকবে। ইংরাজ কোম্পানি আমাদের উপর অনেক অত্যাচার করেছে ও করছে, তাদেরকে এদেশ থেকে উচ্ছেদ করার জন্য এই টাকা আমরা খরচ করবো। অমর সিং ও ঋতভজন সিংকে আমরা সাহায্য করবো। দেবী মহাকালী আমাদের উপর প্রসন্ন হোন। মহাভৈরবী মহামায়াকে প্রণাম।

সবাই এক একটি বনফুল খাঁড়াটির উপর দিয়ে আভূমি প্রণাম করলো।

এবার বাহাদুর বললো—যদি কেউ লুকিয়ে এই টাকা আত্মসাৎ করতে চাও তাহলে মা ছিন্নমস্তার নামে আমি অভিশাপ দিয়ে রাখছি—সে কুষ্ঠ হয়ে মরবে—সে নির্বংশ হবে।

খাঁড়াটিকে আরেকবার প্রণাম করে বাহাদুর খাঁড়াটি হাতে নিয়ে গঙ্গায় নেমে গেল, ধুয়ে পরিষ্কার করতে।*

ফিরে এসে বললো—এবার সবাই প্রসাদ নাও।

ঠোঙার গুড়টুকু সে সবাইকে ভাগ করে দিলে। খাঁড়াখানি আবার লাল সালুতে জড়িয়ে, নৌকার কামরায় তুলে রেখে এলো। বললো—এবার প্রত্যেকে নিজের নিজের গামছায় একশো করে টাকা বেঁধে নাও। তারপর ওই গর্তে মাটি চাপা দাও। আমি দেখি নদীতে ততক্ষণে দুটো মাছ ধরতে পারি কিনা।

খেতে বসে সবাইকার ভবিষ্যৎ জীবিকা স্থির হয়ে গেল। বাহাদুর সিং আর হাবু নৌকাতেই থাকবে, মাল পারাপার করে জীবন চলবে। আর সবাই এক একখানা করে দোকান দেবে ত্রিবেণীতে। জায়গাটা জমজমাট। হাটবারে অনেক জন-সমাগম হয়।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা হয় না। তা যদি হতো তাহলে আমাদের কাহিনী এইখানেই শেষ হতো।

সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই ঝড় উঠলো, সেই ঝড় চলল পরদিন সকাল অবধি। সেই ঝড়ে নৌকা ও হাবুর দল গঙ্গার বুকে হারিয়ে গেল। বটগাছ তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, তার নিচে সেই টাকাও রইল, কেউ জানলো না।

জানলো কয়েক দশক পরে।

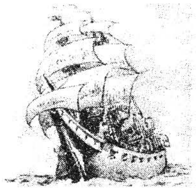

হুগলীর এক সদাগর ঘরে ফিরছিল। সন্ধ্যার পর ঝড় উঠলো। বটগাছটার সঙ্গে সদাগর নাও বেঁধেছিল। একটা ঘূর্ণি বাতাসের টানে নাও চড়ায় এসে উল্টে পড়লো। বটগাছটাও গোড়াসমেত মুখ থুবড়ে পড়লো নদীর জলে। কয়েকজনের কিছু কিছু আঘাত লাগলো, তবে সে তেমন কিছু নয়।

ঝড় থামলো। সকাল হলো। সদাগর চমকে উঠলো, উপড়ে-পড়া গাছের তলে টাকার পাহাড়। কার টাকা ? কোথা থেকে এলো। যাই হোক, সদাগর সেই টাকা ঈশ্বরদত্ত বলে মনে করলেন। শুধুই নানা সৎকাজে সেই টাকা তিনি খরচ করলেন—খ্যাতি হলোঃ লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।•

---

৯ এক টাকা হলো এক তোলা। আশী তোলায় এক সের। চল্লিশ সেরে এক মণ = ৩২০০ টাকা।

* সতেরো-আঠারো দশকে ঠগীরা লুঠতরাজ করতে যাবার আগে এইভাবে ঘাটে মাঠে কালীপূজা করতো। কর্নেল ফিলিপ মেডোজ টেলরের 'কনফেকসন অফ এ ঠগ'এ দ্রষ্টব্য।

•গৌরী সেন অন্যভাবেও নৌকাভর্তি রূপা পেয়েছিলেন—সে কিংবদন্তীও আছে।

ছবি : প্রসাদ রায়

বাঁশবনে চার অপদেবতা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

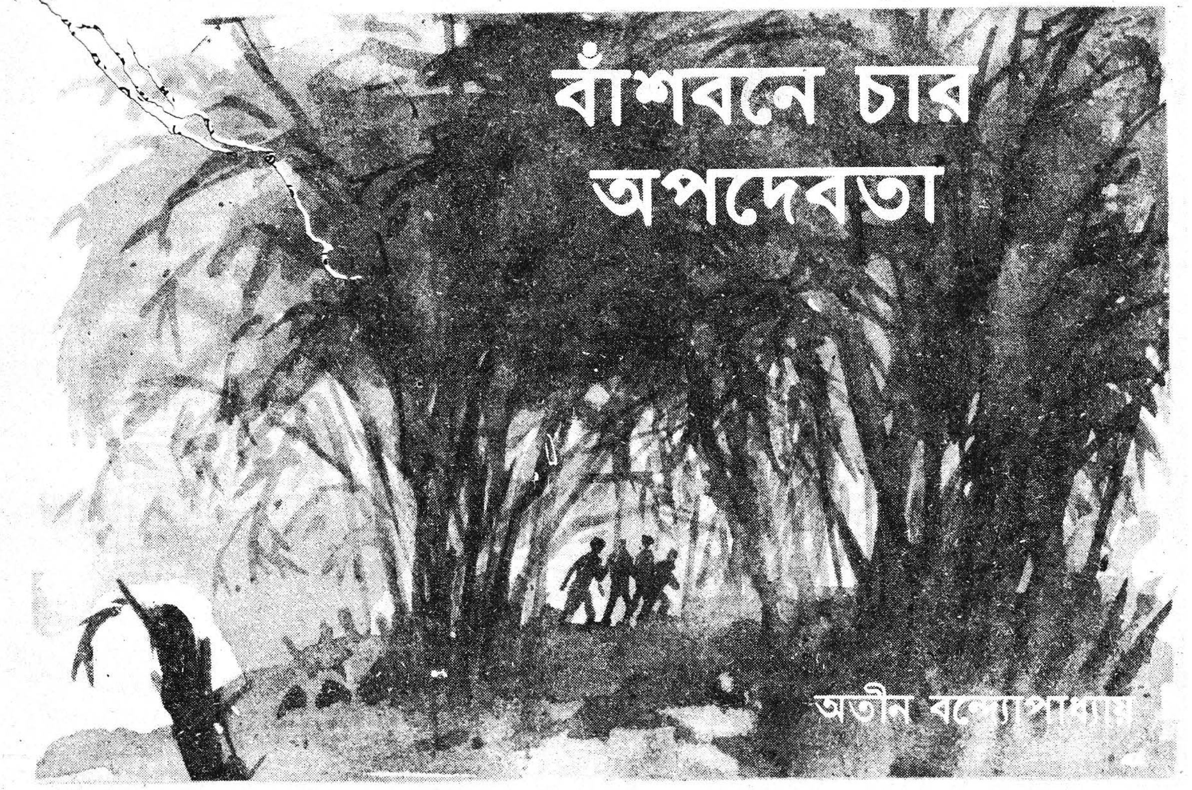

এবারে তিনুকাকা বর্ষাকালে এসে হাজির। বর্ষাকালে তিনি পারতপক্ষে আসেন না। আমরা বড় হয়ে অন্তত দেখিনি। বর্ষাকালে যখন তখন যেখানে সেখানে দলবল নিয়ে বের হয়ে পড়া যায় না। বাড়িতে নৌকা একখানা, গাঁয়ের এ-বাড়ি সে-বাড়ি যেতেও নৌকা লাগে। বাড়ির চারপাশে জল, মাঠঘাট সব জলে ভেসে যায়। দ্বীপের মতো এক একটা বাড়ি নাক জাগিয়ে থাকে। হেন অবস্থায় সতত বিচরণশীল তিনুকাকার ভাল লাগবে কেন। বন্দী গৃহকোণে—তিনুকাকার পছন্দ নয়।

তিনুকাকা আসায় ক'দিন বাড়িতে ভালমন্দ খাওয়া হবে। ঠাকুমার একমাত্র ভাইপো, বাপের বংশে সবে ধন নীলমণি। কাকা এলে তাঁর জিম্মায় আমরা চালান হয়ে যাই। তিনিই তখন অভিভাবক। আমাদের জাঁদরেল মাস্টারমশাই পর্যন্ত ট্যাফো করতে সাহস পান না।

কাকা এসেই আমাদের খবরাখবর নেওয়া জরুরী দায়িত্ব ভেবে থাকেন। আমাদের সুবিধা অসুবিধা সব জেনে নিয়ে সেই মাফিক কাজকর্ম শুরু করে দেন। এবারে আমাদের অভিযোগ অনেক।

এক নম্বর অভিযোগ, লাঙ্গলবন্দের অষ্টমী স্নানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়নি।

দু নম্বর অভিযোগ, মালতির মার মাচান থেকে শসা চুরির দায়ে পাইকারি হারে ছোটকাকার বেদম প্রহার।

তিন নম্বর অভিযোগ, গুপ্তধন আবিষ্কারের আশায় বকির মিঞার কোপে পড়ে যাওয়া। সে রাতে বাড়ির সব চুরি করে নিয়ে গেছে। কথা ছিল দুপুর রাতে দরজা খুলে ওর সঙ্গে বের হয়ে যাব গোপাটের তেঁতুল গাছের নিচে, সে আমাদের সেনেদের ভিটাবাড়িতে নিয়ে গিয়ে গুপ্তধনের খোঁজ দেবে। মেজদা বড়দা ছোড়দা আমি দুপুর রাতে দরজা খুলে ঠিক গেছিলাম, কিন্তু বসিরের পাত্তা পাওয়া যায়নি। সকালে দেখি সব সাফ। ছোটকাকার পাইকারি হারে ঠেঙানো আমাদের কপালে লেখা ছিল। সব তাতেই আমরা আসামী, আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়।

চতুর্থ অভিযোগটি শুনে কাকা কিছুক্ষণ কপাল চুলকালেন। দোহারা চেহারার মানুষ। ফর্সা। মাথায় লম্বা চুল। ঝাকসু ওস্তাদ মার্কা গোঁফ। কাকার অনেক কীর্তির আমরা সাক্ষী। এবারের অভিযোগ শুনে বললেন, কটা হাঁস চুরি গেছে?

—পাঁচটা।

—কে নেয়?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

বড়দা বলল, বল তো সারাদিন হাঁস পাহারা দেব! আমাদের আর কাজ নেই! বর্ষাকাল কোথায় কখন চলে যাবে, আমরা নজর রাখি না কেন; ডিম খাবে সবাই, আর হাঁস চুরি গেলে যত দোষ আমাদের। গান্ডেপিন্ডে গেলা ছাড়া আমাদের নাকি আর কাজ নেই। আমরা ঘুমোই, পড়ি, স্কুলে যাই, দাঁত মাজি, হাডুডু খেলি ঠিক, সে তো সাঁজ লাগার আগে। নৌকায় মাঝে মাঝে বিলে চলে যাই, সেটা কি যে দারুণ, শাপলা তুলে আনলে

ঠাকুমা কি খুশি হন, ছোটকাকার হম্বিতম্বি আর সহ্য হয় না কাকা। আবার হাঁস চুরি গেলে বাড়ি থেকে বের করে দেবে বলেছে। বের করে দিলে আমরা কোথায় যাব!

–কেন আমার বাড়ি। তোদের আর এখানে রাখা যাবে না দেখছি।

আমি বললাম, জান তিনুকাকা, এত মনিব থাকলে মানুষ বাঁচে! ছোটকাকা, মাস্টারমশাই। হরকুমার, যে গোয়াল গরু সামলায় সে পর্যন্ত মনিবি ফলাচ্ছে। বড়দা রেগে একদিন সাফ সাফ বলে দিয়েছে, কিছু হবে না যখন তরকারি বেচে খাব।

–না না, তরকারি বেচে খাওয়া ভাল না। তোরা কত বড় বংশের ছেলে! তোরা যদি পড়া না পারলে মারের চোটে তরকারি বিক্রি করে খাবি বলিস, তবে তোদের বাপ-কাকা জেঠাদের সম্মান থাকবে কেন! এ-ছাড়া পড়া পারতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আমার তো বিদ্যা অষ্টরম্ভা–তাই বলে কি তরকারি বেচে খাই!

ছোড়দা বলল, কি মার মারে না কাকা, মারের চোটে ভূত পালায়। পড়া না পারলে মারতে মারতে কচুকাটা করে ছাড়ে। আর হম্বিতম্বি, ওরে তোরা কি করে খাবি। খুবই ন্যায্য কথা। মাস্টারমশাইরও দোষ দেওয়া যায় না। ইস্কুলে তার মুখ থাকে না। মাস্টারমশাইর মুখ রক্ষার্থে বড়দা জানিয়েছে, তরকারি বিক্রি করে খাবে, মেজদা বলেছে, গামছা বিক্রি করে খাবে। আমরা যে কি বিক্রি করে খাব, ভেবে পাচ্ছি না।

তিনুকাকা আমাদের পুকুরপাড়ে নিয়ে এসেছেন। তেঁতুল গাছের শেকড়ে বসে সলা-পরামর্শ হচ্ছে। তিনুকাকাই বলতে পারবেন, আমরা মানে আমি আর ছোড়দা কি করে খাব। বড় হলে খেতে হবে, বাড়ি থেকে যদি বের করে দেয়, তবে আর এক ফ্যাসাদ। কিছু না করতে পারলে চলবে কেন?

তিনুকাকার মাথায় আসছে না, আমরা কি বিক্রি করে খেতে পারি। তখনই মনে হলো লজেন্স বিক্রি করে খেতে পারি, মুড়িমুড়কি বিক্রি করে খেতে পারি। এমন বলতেই তিনুকাকা বললেন, সাবাস, তোদের মাথা নেই কে যে বলে!

–মাথা আর আছে কোথায়! পাঁচ পাঁচটা হাঁস গায়েব হয়ে গেল। এক ডজন হাঁস বাড়িতে–শেয়ালে খায়, কিন্তু এত সাহস হবে কি করে! সাঁজ না লাগতেই আমরা, আয় তৈ তৈ শুরু করি। ওরা ঠিক যেখানে থাকুক, কি ধানক্ষেত কি পাটক্ষেত কিংবা পুকুরের কচুরিপানার ভিতর যেখানেই থাকুক বের হয়ে আসবে। ঝোপজঙ্গল থেকেও বের হয়ে আসে। আমি এমন সাফাই গাইতেই তিনুকাকা বললেন, শেয়ালেই খায়। বড় ধূর্ত প্রাণী। সংস্কৃত পুঁথিতে শেয়ালপন্ডিত আর কুমীরছানার গল্প পড়িসনি! হাঁস চুরি যায়নি, শেয়ালেই খেয়েছে।

তারপরই তিনি বললেন, শেয়াল রাতে হুক্কা হুয়া করে?

–করে।

–কতদূর থেকে করে। বাঘার কোনো দায়িত্ব নেই। বাঘা কি করে?

বাঘা আমাদের পোষা কুকুর। খায় আর ঘুমোয়। মাঝে মাঝে গিরগিটি দেখলে তাড়া করে।

বললাম, বাঘা তো হরকুমারের পাশে শুয়ে থাকে তখন। দুজনেই ঘুমায়। কেউ কিছু বলে না।

তিনুকাকা খুব বিমর্ষ গলায় বললেন, তোরা দেখছি বাড়িতে কুকুরের থেকেও অধম।

বড়দা বলল, জান ইচ্ছে হয় কোথাও চলে যাই। একদম ভাল্লাগে না। এত শাসন সহ্য হয়! তুমি বল তিনুকাকা!

–সহ্য না হবারই কথা। তবে কি মুশকিল জানিস যাবি কোথায়! এখন তো ত্রেতাযুগের মতো পঞ্চবটী বনও নেই, যে তাড়া খেয়ে সেখানে গিয়ে পালিয়ে থাকবি। দশরথের তাড়া না খেলে রামের বয়েই গেছিল বৌকে নিয়ে বনবাসে যাবার। বইয়ে সত্য কথা লেখা থাকে না জানিস!

এটা আমাদেরও বিশ্বাস। বইয়ে সত্য কথা লেখা থাকে না। লেখা থাকলে শাসনের নামে আমাদের উপর এত অত্যাচার হত না। বাড়ির কুকুরেরও যখন তখন ঘুমোবার, দৌড়াবার স্বাধীনতা আছে। আমাদের তাও নেই। ঘড়ি ধরে চলা। সকালে সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে না উঠলেই তাড়া, হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে না বসলেই তাড়া, পড়া শেষ করে চান খাওয়া করে ইস্কুলে না গেলেই তাড়া। স্কুল থেকে ফিরেও তাড়া–কে কোথায় কি করছে হরকুমারের গোয়েন্দাগিরি। সাঁজ লাগলে পড়তে বসা, রাত দশটার আগে ছুটি নেই। এর উপর কাকার হুমকি, হাঁস যদি খোয়া যায়, সব কটার মাথা ন্যাড়া করে দেব।

কাকাকে বললাম, মাথা ন্যাড়া করা কি ঠিক! আমাদের ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে যদি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখে কি অপমান বল! পাশের বাড়ির শোভা আবু খিলখিল করে হাসবে। তুমি একটা বিহিত কর কাকা। পায়ে পড়ি।

–হবে হবে। আগে বাঘাকে প্রহার করতে হবে।

–কেন?

–সে কি শুধু লেজ নেড়ে আদর খাবে! শেয়ালেরই কাজ। অনেক ভেবে দেখলাম, তেনারা বর্ষায় মাঠঘাট বন জঙ্গল ভেসে যাওয়ায় গাঁয়ের কোনো ঝোপজঙ্গলে এসে উঠেছে। উঠলেই তো হয় না, খেতে হয়! খাবে কি? এ তো আর মাঠ কিংবা বিল নয় যে গর্তে লেজ ঢুকিয়ে কাঁকড়া তুলে খাবে!

বড়দা কাকার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা পুকুরপাড়ে। সাঁজ লাগার আগে হাঁসগুলি তুলে নিতে এসেছি। পুকুরের পাড় জেগে। এদিক ওদিক বনঝোপ। তারপর জল আর জল, ধানক্ষেত পাটক্ষেত। সর্বত্র বুক-সমান অথবা সাঁতার জল। শেয়াল এতটা জল সাঁতরে আসতে পারে ভাবতে বিশ্বাস হয় না। শুধু আমাদেরই হাঁস চুরি যাচ্ছে না–কারও হাঁস মুরগি, ছাগলের বাচ্চাও–এত ধূর্ত তবে!

আমরা ডাকছি, আয় তৈ তৈ।

আমাদের অবস্থা মধুসূদন–ত্রাহি ডাকে গগন ফাটছে–আয় তৈ তৈ।

বড়দা বলল, ল্যাজে কাঁকড়া ওঠে।

তিনুকাকা বললেন, ওঠে। শেয়াল কাঁকড়ার গর্তে লেজ ঢুকিয়ে নাড়ে। আহাম্মক আর কাকে বলে। কাঁকড়ার চিমটি কাটার স্বভাব। গর্তে কোন বেয়াদফ লেজ নাড়ছে! যেই না চিমটি কাটা আর অমনি সুরুত করে টান। কাঁকড়া বাবাজী আটক। তারপর তেনার ভূরিভোজ। সুতরাং বুঝলে, বলে তিনি কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে বললেন, কতদূর?

–কি কতদূর কাকা?

–বাঁশের জঙ্গল, বনবাদাড়। কতদূর?

–সে তো বেনেপাড়া পার হয়ে।

–জেগে আছে না ভেসে গেছে?

–কি জেগে আছে কাকা?

–আরে ডাঙ্গাজমি না জলাজমি।

–ডাঙ্গাজমি কাকা।

–ব্যস। কাল সকালে নৌকায় বুঝলি, কেউ টের পাবার আগে ভেসে পড়া। বাঁশবনে তেনারাই আস্তানা গেড়েছেন। সব ভেসে গেছে জলে, তেনারাই বা যাবেন কোথায়, কিন্তু তাই বলে তোদের দুর্ভোগ আমি সহ্য করব কেন! বাড়িতে গেলেই তোদের জন্য মন খারাপ হয়ে যায়। থাকতে পারি না। চলে আসি। আর শোন, গোটা চারেক লাঠি, কিছু শুকনো লঙ্কা, কিছু খড়কুটো। এই সঙ্গে যাবে। বংশ নির্বংশ না করে ছাড়ছি না।

কাকাকে আমরা জানি, মাঝে মাঝে ভড়কে যাবার স্বভাব। কাকার কথা, সাহস না থাকুক, তেজ আছে। তা কাকার তেজ আছে। এখানে এসে বার তিনেক নিখোঁজ হয়ে গেছিলেন। একবার ভূতের ভয়ে, একবার চোরের ভয়ে আর একবার পুলিশের ভয়ে। আমার ছোটমামা থানার দারোগা হয়ে সোজা ধরাচূড়ো পরে ঘোড়ায় চড়ে হাজির। তিনুকাকা ছিপ ফেলে পুকুরে মাছ ধরছিলেন, না কি যেন করছিলেন–পুলিশ না একবার সাক্ষাৎ দারোগা শুনেই দৌড়। যত ডাকি তত ছোটেন। বছর খানেক পরে উদয় হলে তাঁর এক কথা, ভয় পাইনি বুঝলি, ভড়কে গেছিলাম।

ভয় আর ভড়কে যাওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ–কাকার প্রতি এ-জন্য বিশ্বাস হারাতে পারিনি। আমাদের পোষা হাঁসগুলির জন্যও কষ্ট। কাকার কথামতো চারটা বাঁশের শক্ত লাঠি আর খড়কুটো, শুকনো লঙ্কা নিয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠেই যাত্রা করা গেল। ঠাকুমা দরজা খুলে বের হতেই দেখলেন, সাত-সকালে তিনু কোথায় যাচ্ছে। সহসা হাঁকলেন, আবার তোরা ওর পেছনে লাগলি! ঠাকুমার ধারণা আমাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়েই ভাইপোটি তাঁর নিখোঁজ হয়ে যায়। আমরাই নিরুদ্দেশের মূলে।

কাকার কড়া ধমক, পিসি চুপ করতো–যাচ্ছি শুভকাজে, উনি মাঝখানে বাগড়া দিতে এলেন!

কি এমন শুভকাজ বুঝতে না পেরে শুধু বললেন, ফিরে

নৌকাটা বাঁশের গুঁড়িতে বেঁধে নেমে পড়েছি

আসবি তো?

–আলবৎ আসব।

নৌকা ভেসে গেছে। ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে নৌকা যাবে। আরে লগিই তো নেওয়া হয়নি! বৈঠা মেরে ফের লগির খোঁজে। আমাদের তাড়নায় নৌকা ঘাটে থাকে না, লগি হরকুমার গোয়ালঘরে তুলে রাখে। কি যে রাগ হচ্ছিল! জীবনে স্বাধীনতা পেলে প্রথম কাজই হবে আমাদের, বেটাকে ঠ্যাঙানো। একবার পড়ার টেবিলে মাস্টারমশাইর প্রশ্ন, বড় হয়ে তোমরা কি করবে? বড়দা বলেছিল, হরকুমারকে ঠ্যাঙাব স্যার।

–তোমরা?

–আমরাও স্যার।

–খুব ভাল কাজ। মাস্টারমশাই গুম হয়ে গেছিলেন।

সুতরাং হরকুমারকে ঠ্যাঙানো কত জরুরী এই লগির ক্ষেত্রেও বোঝা গেল। ছোটকাকা টের পেলে আমাদের ধর্মনাশ হবে। যত তাড়াতাড়ি ভেগে পড়া যায়। দ্রুত লগি ঠেলে বাড়ি থেকে অদৃশ্য হতে না পারলে দুই কাকাতে কুরুক্ষেত্র বেধে যেতে পারে। তবে কুরুক্ষেত্র শুরুর মুখে ঠাকুমা ছোটকাকার

পক্ষে, আর শেষ হবার মুখে তিনুকাকার পক্ষে। ফলে তিনুকাকাই জিতে যান। ঠাকুমার কথা সংসারে শেষ কথা। আমার বাবা কাকারা বড় বেশি মাতৃভক্ত–এ-বিষয়ে তাঁদের একটাই তুলনা–বিদ্যাসাগর আর ভগবতী দেবী।

আমরা মাঝিবাড়ি পার হয়ে খালে পড়েছি, খাল ধরে গেলে দক্ষিণ পাড়া, দক্ষিণ পাড়া পার হলে জেলে পাড়া এবং তারপরই বিশাল বাঁশের বন। এই বনেই এখন তেনারা আস্তানা গেড়েছেন। এখন তাদের ডেরা খুঁজে বের করতে হবে। নৌকাটা বাঁশের গুঁড়িতে বেঁধে নেমে পড়েছি। আমার মাথায় খড়কুটোর আঁটি, কাকার কোঁচড়ে পোয়াটেক শুকনো লঙ্কা, মেজদার হাতে চারটা বাঁশ, বড়দার হাতে ধান ঝাড়ার কুলো। কুলোর বাতাসে লঙ্কা পোড়ার ধোঁয়া গর্তের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে পারলেই সুড় সুড় করে ইঁদুরের মতো সব বের হয়ে আসবে। বাঁশের ঝাড় অজস্র–দিনের বেলাতেও মনে হয় অন্ধকার। তবে রক্ষা, বাঁশঝাড়ের নিচে কোনো আগাছা গজাতে পারে না। বৃষ্টি বাদলায় অথবা বর্ষায় দুব্বো ঘাস ছাড়া কিছু গজায় না। কিছুদূর গেলে টের পেলাম বাঁশের ঝাড় ঘন, কোথাও কোনো গর্ত দেখছি না। আরও ভিতরে ঢুকে যেতে হবে। কিন্তু অজস্র কঞ্চি বের হয়ে ঢোকার রাস্তা অগম্য করে রেখেছে। কঞ্চি সরিয়ে ক্রমে আরও গভীরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছি। কাকা একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন–গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে, বের হলেই মাথায় বাড়ি, বুঝলি! তারপর বলির পাঁঠার মতো লাশ সরিয়ে আবার বাড়ি। চারজন পরপর দাঁড়িয়ে থাকবি–চারটা লাঠি হাতে। কাকা বললেন, আমি শুধু কুলোর বাতাস দিয়ে যাব। এই একটাই কাজ আমার, বুঝলি!

আমরা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। কঞ্চি লেগে আমাদের শার্ট-প্যান্ট ছিঁড়ে যাচ্ছে। গায়ে লেগে রক্তপাত হচ্ছে। ভ্রূক্ষেপ নেই। হঠাৎ মেজদা চিৎকার করে উঠল, কাকা পেয়েছি, গর্ত। সুতরাং লেগে পড়া গেল। আগুন, লঙ্কাপোড়া, কুলোর বাতাস। আমরা রেডি। কোথায় কে দাঁড়াবে ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে। কাকার একটাই কথা–লাঠি ফসকালে, ছাল-চামড়া তুলে নেবেন। দ্যাখ কি মজা হয়। কিন্তু কুলোর বাতাসে গর্ত থেকে কেউ মুখ বার করছে না দেখে, কাকা বড় মুষড়ে পড়লেন। বুঝতে দিলেন না, বললেন, আছে আছে–সামনে চল। সামনে যেতে যেতে কোথায় যে ঢুকে যাচ্ছি, মাথার উপর বাঁশের ঘন ছায়া, আর বাতাসে বাঁশ নাড়া খেলে ক্যাঁককোঁক শব্দ, কেমন ভৌতিক এবং এক আজগুবি দেশে আমাদের কাকা নিয়ে এসেছেন। বাড়ির পাশেই এমন একটা গভীর বন আছে, আমরা কাকা না এলে ইহকালে টের পেতাম না। বর্ষার সময় সাপখোপের উপদ্রব বাড়ে–কাকা তারও পরোয়া করছেন না। কাকার তাড়া, আছে আছে, এগোও, একবার না পারিলে দেখ শতবার। রবার্ট ব্রুসের গল্প বলে তিনি আমাদের হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর বাণী ঝাড়তে থাকলেন। এমন একটা জায়গায় এসে গেছি যে এখন কেউ আর নড়তে পারছি না। বাঁশের কঞ্চি হাজার হাজার, আমাদের যেন জালে আটকে ফেলেছে। আমিই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলাম, কাকা বের হতে পারছি না। মেজদাও বললো, বের হতে পারছি না। বড়দাও চিৎকার করছে, বের হতে পারছি না। কাকা পেছনে, সব সময় বিশ ত্রিশ গজ পেছনে। হাওয়া উঠেছে। বৃষ্টিপাত শুরু। ঝড়। কোথা থেকে দমকা হাওয়ায় সব বাঁশগুলোকে কোনো এক অপার্থিব শক্তি যেন এলোমেলো করে দিয়ে গেল। হঠাৎ আমি কেঁদে ফেললাম, কাকা, সামনে পেছনে বাঁশ আর কঞ্চি ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বাঁশ পাতায় গা কেটে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। আমরা পাগলের মতো চেঁচাচ্ছি। কাকাকে দেখতে পাচ্ছি না, সাড়াও পাচ্ছি না। ডাকছি, কাকা, শীগগির বাড়িতে খবর দাও, বাঁশগুলি ঝড়ো হাওয়ায় হেলে দুলে আমাদের আটক করে ফেলেছে। বাঁশগুলি বাঁশ না, ভূত। শীগগির খবর দাও, না হলে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ব।

কোনো সাড়া নেই।

–তিনুকাকা!

আর তিনুকাকা! আমাদের অজ্ঞান হবার যোগাড়। অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমরা আর বাড়ি ফিরতে পারব না, বাঁশবনে ক্যাঁককোঁক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এমন কি কোনো কীট-পতঙ্গেরও না। আমাদের আর্ত চিৎকার কেউ শুনতে পাচ্ছে বলেও মনে হচ্ছে না। আমরা চার ভাই এখানে বাঁশের জঙ্গলে আটকা পড়েছি কেউ জানতেও পারবে না। এখানে আমরা তবে মরে পড়ে থাকব। ভাবতেই শরীর হিম হয়ে গেল। বসে পড়লাম। আমাদের মৃত্যু তবে আসন্ন। মৃত্যুভয় মানুষকে কতটা কাহিল করে এই প্রথম টের পেলাম।

ছোটকাকা এসে উদ্ধার করেছিলেন। তিনুকাকা আবার নিখোঁজ। বাঁশবনে নৌকা বাঁধা দেখেই টের পেয়েছিলেন ছোটকাকা, বাড়ির শয়তানরা এখানে লুকিয়ে আছে। তিনি চিৎকার করে ডাকলে বড়দা বলেছিল, আমাদের ভূতে ধরেছে কাকা। আমাদের কোনো দোষ নেই।

ছোটকাকা শুধু বললেন, তোরা মানুষ না অপদেবতা! ঢুকলি কি করে?

মানুষজন বাঁশ কেটে রাস্তা করছে। আমরা বাঁশ কাটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি শুধু। বাঁশ কেটে সাফ না করলে আমাদের বের করা ভগবানেরও অসাধ্য কাজ বুঝতে পারছি।

বছরখানেক বাদে তিনুকাকার উদয়। বললাম, কাকা, তুমি এত ভীতু। আমাদের ফেলে পালালে।

তিনুকাকার সাফ জবাব, তোদের তিনুকাকা কখনও ভয়ে পালায় না, ভড়কে গেলে পালায়। বুঝলি কিছু!

ছবি ঃ রাহুল মজুমদার

বাহাদুর বেড়াল

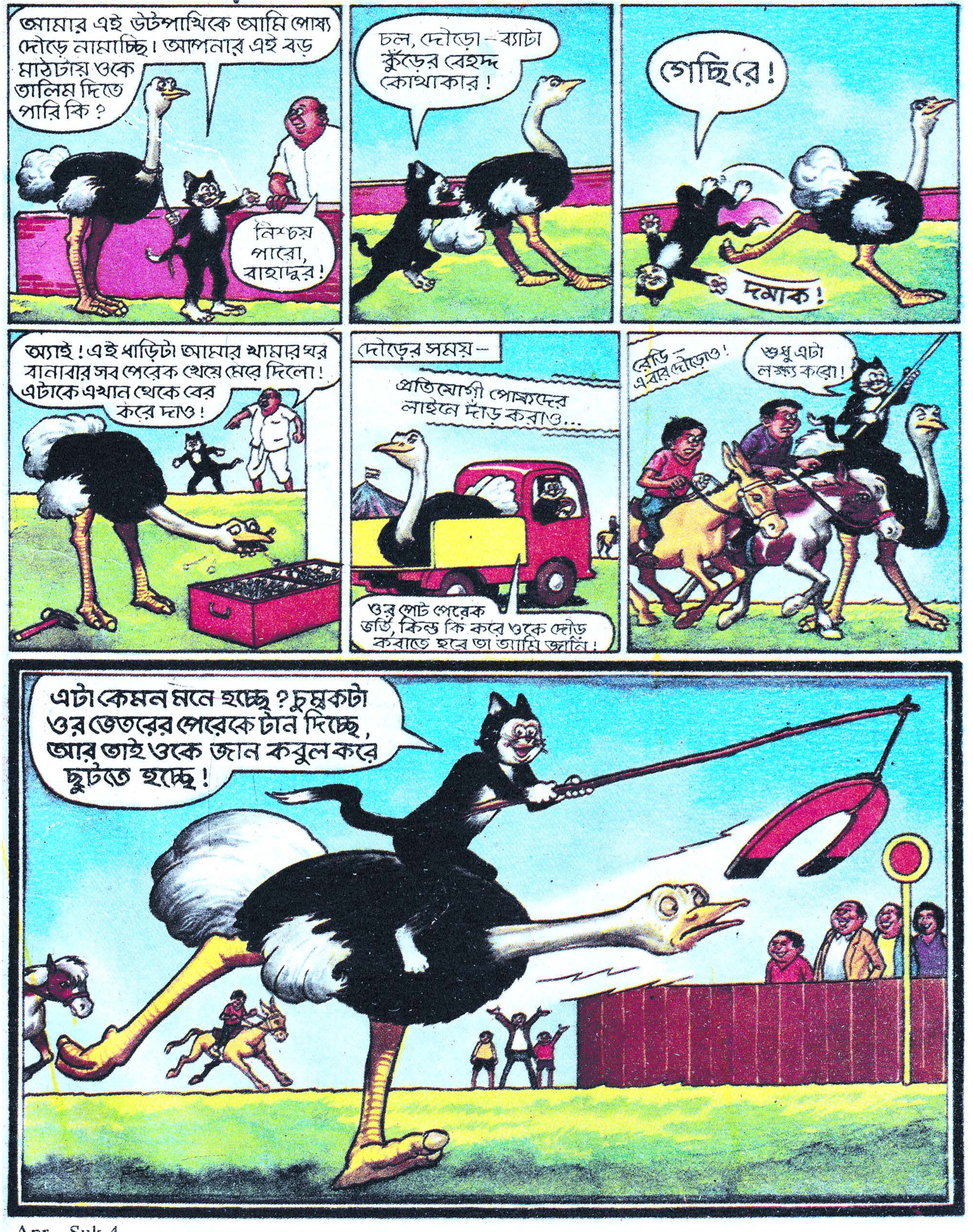
আমার এই উটপাখিকে আমি পোষ্য দৌড়ে নামাচ্ছি। আপনার এই বড় মাঠটায় ওকে তালিম দিতে পারি কি ?
নিশ্চয় পারো, বাহাদুর!
চল, দৌড়ো—ব্যাটা কুঁড়ের বেহদ্দ কোথাকার !
গেছিরে !
দমাক !
অ্যাই ! এই ধাড়িটা আমার খামার ঘর বানাবার সব পেরেক খেয়ে মেরে দিলো ! এটাকে এখান থেকে বের করে দাও !
দৌড়ের সময়—
প্রতিযোগী পোষ্যদের লাইনে দাঁড় করাও...
ওর পেট পেরেক ভর্তি, কিন্তু কি করে ওকে দৌড় করাতে হবে তা আমি জানি !
রেডি— এবার দৌড়োও !
শুধু এটা লক্ষ্য করো !
এটা কেমন মনে হচ্ছে ? চুম্বকটা ওর ভেতরের পেরেকে টান দিচ্ছে, আর তাই ওকে জান কবুল করে ছুটতে হচ্ছে !

তোমাদের পাতা

রূপশ্রী প্রামানিক
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী,
শরৎকুমারী গার্লস হাই স্কুল,
শান্তিপুর, নদীয়া

কালবোশেখী

দুপুরবেলা বেজায় রোদ
বিকেলবেলা একি?
সারা আকাশ ঢাকল মেঘে
আসছে কালবোশেখী।
উড়ছে ধুলো শুকনো পাতা
বইছে বাতাস জোরে,
যে যেখানে ছিল তারা
ফিরছে সবাই ঘরে।
গরু বাছুর লেজ তুলে ঐ
দৌড়ে ঘরে যায়,
গাছগুলি সব ঝড়ের বেগে
মাটিয়ে মিশায়।
বাজ পড়ে ঐ কড়াৎ কড়াৎ
বৃষ্টি এল জোরে,
পাড়ার যত দুগ্গা অপু
আমবাগানে ঘোরে।
একটু পরেই থেমে গেল
কালবোশেখীর ঝড়
মায়ের গলা শোনা গেল,
'খুকু এবার পড়।'

বাণী কর, বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণী
শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম উচ্চবালিকা বিদ্যালয়,
ডানকুনি, হুগলী

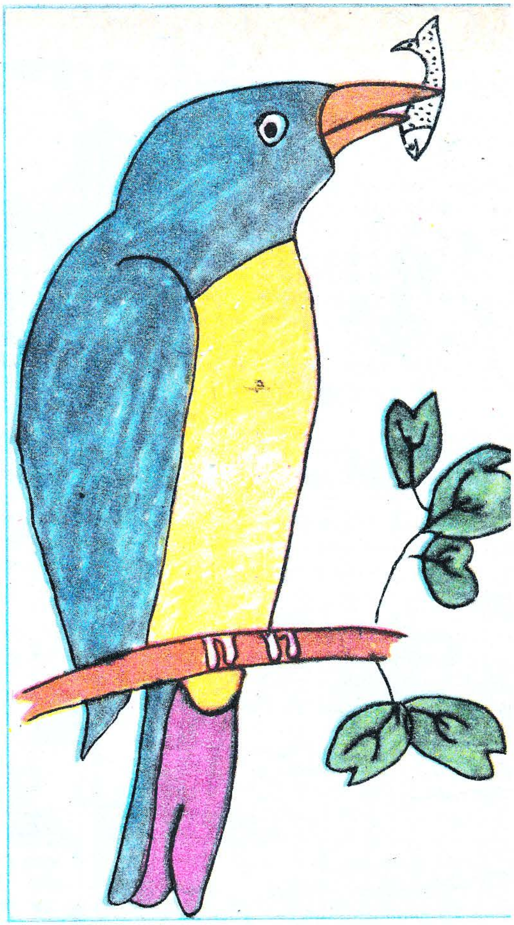

অয়ন মন্ডল
বয়স সাত, প্রথম শ্রেণী,
বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়

পার্থপ্রতিম দাস, বয়স চৌদ্দ, নবম শ্রেণী বাঁকুড়া কলেজিয়েট স্কুল, বাঁকুড়া

যাওয়া আসা

শীত যে গেল, গ্রীষ্ম এল
উল্টে গেল সব,
কাঁথা কম্বল উঠল শিকেয়
ত্রাহি ত্রাহি রব।

ঘুরল পাখা ভন্ ভন্ ভন্
ঢালছি গায়ে জল,
কিন্তু তাতেও হচ্ছে না যে
কোনো কিছুই ফল।

এমনি ভাবেই যাওয়া আসার
ধাক্কা লেগে ভাই,
দুনিয়াটা ঘুরছে সদাই
বুঝে নিলাম তাই।

পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়, বয়স তেরো,
সপ্তম শ্রেণী, অমরেন্দ্র সরণী, উত্তরপাড়া

মন লাগে না কাজে

তৈরি ছিলাম তিন তারিখে
বসবো পরীক্ষায়
চললো গুলি লুধিয়ানায়
বন্ধ কলেজ হায়!

বলতে পারো দাদুমণি
কি হলো আজ দেশে
রক্তস্রোতে আমরা আজ
যাচ্ছি কোথায় ভেসে?

পারছে না কেউ মন খুলে
হা-হা করে হাসতে
পারছে না কেউ হৃদয় দিয়ে
দেশকে ভালবাসতে।

গড়ার কথা ভুলে সবাই
ভাঙতে শুধু চায়
ভাবছি মনে কেমন করে
বসবো পরীক্ষায়।

মারা-মারি, হানা-হানি
কাটা-কাটির মাঝে
সত্যি বলছি দাদুমণি
মন লাগে না কাজে।

মৌসুমী গুপ্তা
চণ্ডীগড় গার্লস কলেজ, চণ্ডীগড়।

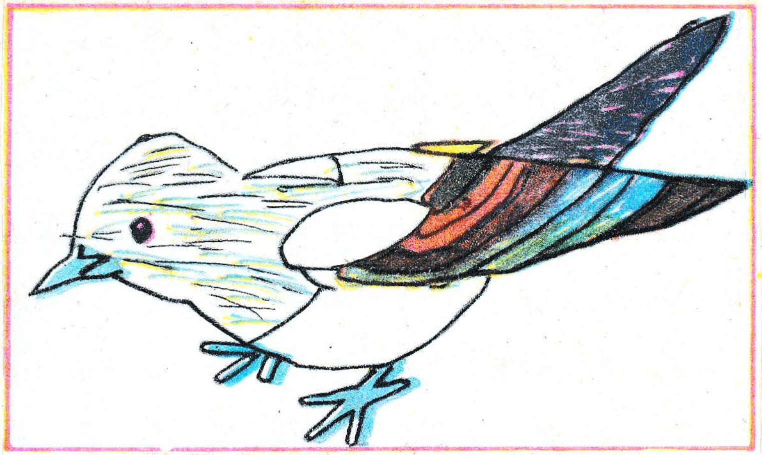

সম্রাট দত্ত, বয়স সাত, প্রথম শ্রেণী, রবীন্দ্রনগর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলিকাতা ৬৫।

জয়ন্ত ধরগুপ্ত
বয়স চোদ্দ, দশম শ্রেণী, সি. এস. আর. এস.
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

শর্মিতা লাহা, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী
লরেটো ডে স্কুল, কলিকাতা।

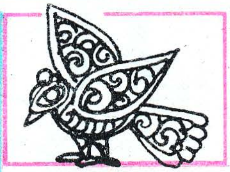

পার্থ নাগ
বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণী, বারাসত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, চব্বিশ পরগণা।

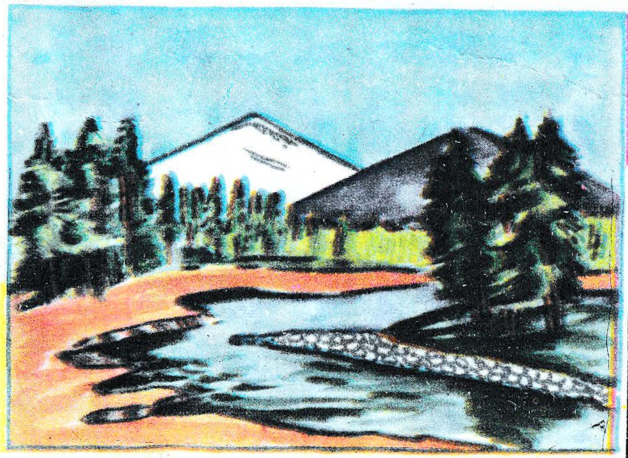

টুকরো হাসি

পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন, বলুন—কার্তিকে মাসি, শুক্ল পক্ষে— বৃদ্ধা কানে একটু কম শোনেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি তো কার্তিকের মাসি নই, বংকার পিসী।

মৌমিতা ভট্টাচার্য বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী
সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল, কলিকাতা।

মহাকাশ বিজ্ঞান

সূর্য যেদিন নিভে যাবে

প্রবীরকুমার আদিত্য

ভোর হতে না হতেই যার আলো দেখে পাখিরা কোলাহল করে, যার আলোতে ঘুম ভাঙে—তা হলো সূর্য। পৃথিবী থেকে কতো দূরে দাউদাউ করে জ্বলছে ঐ সূর্য। সূর্যের আয়তন এবং ভর পৃথিবীর তুলনায় অনেক অনেক গুণ বড়ো। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও অনেক অনেক গুণ বেশি। একজন মানুষকে যদি সূর্যে নিয়ে গিয়ে ওজন করা যায় (!), তাহলে তার ওজন হবে আট টন।

ঐ জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ডের বহিরাবরণের তাপমাত্রা প্রায় ছয় হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা পৃথিবীর যে কোনো বস্তুকে নিমেষে গলিয়ে দেবে। সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা আরও অনেক বেশি, তা হলো প্রায় এক কোটি ছয় লক্ষ ডিগ্রী সেলসিয়াস। চিন্তা করা যায়, কি ভীষণ তাপ সেখানে! একটি বালুকণাতে যদি ঐ তাপ দেওয়া যেত, তাহলে তা একশো কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো মানুষকে ঝলসে দেবে! সূর্যের এবং অন্যান্য সমস্ত নক্ষত্রের এই তাপ কিন্তু নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ফলেই উদ্ভূত হয়।

সূর্যের মোট আয়তনকে যদি সমান চার ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে তার তিন ভাগই কিন্তু হাইড্রোজেনে পরিপূর্ণ। সূর্যের কেন্দ্রে এরা ভীষণ চাপে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে এবং বিক্রিয়া ঘটায়। এই বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেনের বদলে জন্ম নেয় সম্পূর্ণ নতুন এক মৌল পদার্থ হিলিয়াম। সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে সত্তর কোটি টন হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় প্রভূত শক্তি, যা আমরা তাপ এবং আলোক হিসাবে পাই।

প্রতি সেকেন্ডে সূর্যের ওজন চল্লিশ লক্ষ টন করে কমে যাচ্ছে। পৃথিবীর যা ওজন, প্রায় পাঁচ কোটি বছর পরে সূর্যের ওজন ততখানি কমে যাবে। প্রতি মুহূর্তেই সূর্যের একটা বিরাট অংশ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগবে, ভয় জাগবে, যে আমাদের প্রিয় নক্ষত্র—সূর্যের একদিন মৃত্যু হবে। ঘনিয়ে আসবে আমাদের চরম দুর্দিন। অন্ধকারে ডুবে যাবে আমাদের সৌরমন্ডল। সেই দিন আর কতোদূরে।

একটা নক্ষত্রের মৃত্যু হয় তখনই, যখন তার বিশাল জ্বালানী পুড়ে শেষ হয়ে যায়। আজও আকাশের ঐ কোটি কোটি নক্ষত্রের মাঝে অনেক নক্ষত্র আছে, যাদের আলো ভীষণ ম্লান হয়ে এসেছে। জ্বলতে জ্বলতে যখন সমস্ত হাইড্রোজেন জ্বালানী নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন নক্ষত্রের বাইরের গ্যাস-স্তর ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে, আকার ক্রমশঃ বিশাল হতে থাকে। এই সময় ভেতরে একটি নতুন বিক্রিয়া শুরু হয় হিলিয়াম-কণাদের মধ্যে, নক্ষত্রদের ভেতরে ঘটতে থাকে নতুন বিবর্তন। অবশেষে যখন সমস্ত শক্তির উৎস একেবারে শেষ হয়ে যায়, এই নক্ষত্র যদি মাঝারি আকারের হয়, তাহলে তা ক্রমশঃ ছোটো হতে হতে একটা সাদা ছোট্ট গোলকে পরিণত হয়ে যায়। ঠিক তখনই মহাবিশ্ব কাঁপিয়ে প্রচন্ড এক বিস্ফোরণ ঘটে, ভীষণ আলোয় চারিধার আলোকিত হয়ে ওঠে, জন্ম নেয় সুপারনোভা—যেখানে জন্ম নেয় নতুন নক্ষত্রেরা!

এই সাদা খর্বাকার গোলকে পরিণত হবার আগে অনেক ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। খুব সুন্দর নানা রঙের এক বস্তুকে দেখা যায় ঐ স্হানে—এর নাম নীহারিকা।

নক্ষত্রের জীবনটাই যেন যুদ্ধভূমি। প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নক্ষত্রকে প্রবলভাবে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এই আকর্ষণকে রুখে রেখেছে নক্ষত্রের ভেতরের, প্রচন্ড বহির্মুখী চাপ। সূর্য সেদিনই নিভে যাবে, যেদিন তার ভর পৃথিবীর সমতুল্য হবে। না, কোনো প্রবল বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা নেই, কারণ অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় সূর্যের আকার অনেকই ছোটো। শেষের সেই দিনে সূর্য এক বিশাল তেজস্ক্রিয় ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হবে এবং ধিক্ধিক্ করে জ্বলতে থাকবে। অবশেষে একটা সাদা খর্বাকার নক্ষত্র হিসাবে পড়ে থাকবে।

ভয় নেই, সেই দিনটা এখনো অনেক অনেক দূরে। এই মুহূর্তেই যদি সূর্যের সমস্ত বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, তাহলেও তার ভীষণ তাপ এবং আলো আগামী বেশ কয়েক হাজার বছর থাকবে। আমাদের সূর্য এখন একজন মাঝবয়সী নক্ষত্র। সূর্যের তাপোৎপাদী বিক্রিয়া বন্ধ হতে এখনও প্রায় এক হাজার কোটি বছর সময় লাগবে। ততদিনে বিজ্ঞান নিশ্চয়ই অনেক অনেক উন্নতি করবে। আগামীদিনের মানুষেরা নিজেদের বাঁচাবার জন্য তাদের প্রিয় মুমূর্ষু এক নক্ষত্র—সূর্যকে বিদায় জানিয়ে দলবদ্ধ হয়ে চলে যাবে অন্য কোনো নক্ষত্রলোকে, নতুন সূর্যের সন্ধানে—জীবনের সন্ধানে।

ছবি : সুফি

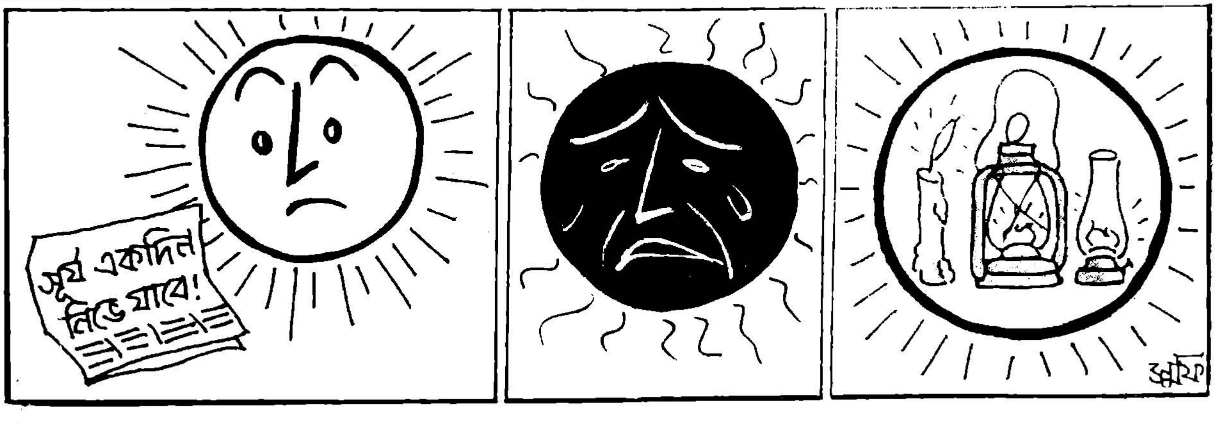

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিলু বলল—তুই কিছু মনে করিস না বাবলু। আসলে হঠাৎ মেজাজটা গরম হয়ে উঠল। এক তো যে কাজে এসেছি সে কাজের শুরুতেই গোলমাল হয়ে গেল। তার ওপর এই মালপত্তর ঘাড়ে নিয়ে হাঁটা। একি ভাল্লাগে? থাকার মতো এমন একটা হোটেল-পত্তরও দেখছি না, যেখানে এগুলো রেখে পাহাড়-টাহাড়গুলো ঘুরে দেখব!

ওরা পায়ে পায়ে হেঁটে অনেকটা পথ এগিয়ে এসে দেখল এক জায়গায় কতকগুলো ওদেরই বয়সী মেয়ে শালোয়ার কামিজ পরে বই নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে।

বাবলু মেয়েগুলোর কাছে গিয়ে বলল—এই যে শুনছেন?

মেয়েদের দল থমকে দাঁড়াল—ক্যা মতলব!

—আপনাদের ভেতর কেউ বাঙালী আছেন?

দুটি মেয়ে বলল—আমরা। কেন বলো তো?

—আচ্ছা, আপনারা কেউ কুসুম নামে কোনো মেয়েকে চেনেন?

মেয়েগুলো খিল খিল করে হেসে উঠল। একজন বলল—বাঃ। এখানে কুসুম টুসুম কেউ নেই। যদি ভালো চাও তো সরে পড়ো।

বাবলু বলল—তোমরা লেখাপড়া-জানা মেয়ে। আমাদের সঙ্গে মালপত্তর দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমরা বাইরে থেকে আসছি। তোমাদের কোনো ভাই যদি এই ভাবে এসে কিছু জিজ্ঞেস করত তাহলে তার সঙ্গেও কি এই রকম ব্যবহার করতে তোমরা? মনে করো না, আমরা তোমাদের দুটি ভাই।

ওদেরই ভেতর থেকে একটি মেয়ে তখন এগিয়ে এসে বলল—না ভাই, কিছু মনে করো না। আসলে এই জায়গাটা খুব একটা ভালো নয়। তা বলো তো কাকে চাই?

বাবলু বলল—মেয়েটির নাম কুসুম। পদবী বলতে পারবো না। বাবার নামও না। শুনেছিলাম ওর বাবা এখানকার স্টেশন মাস্টার। কিন্তু এখানে এসে দেখছি সে ধারণা ভুল। ওর দিদির বিয়ে হয়েছে হাওড়া শিবপুরে।

মেয়েটি বলল—বুঝেছি। পাপ্পুদের বাড়ি।

—পাপ্পু!

—তুমি যাকে কুসুম বলছো ওরই ডাক নাম পাপ্পু। ওর বাবা তো স্টেশন মাস্টার নন। বি. এস. আই.। যাই হোক, এসো আমার সঙ্গে। বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি।

বাবলু বিলু মেয়েটির সঙ্গে এগিয়ে চলল। যাবার সময় মেয়েটি ওর সতীর্থদের বলল—তোরা যা। আমি ভাইয়াকে বাড়িটা দেখিয়ে চলে আসছি।

স্টেশন থেকে প্রায় মিনিট দশেকের পথ হেঁটে যাবার পর মেয়েটি একটি কোয়ার্টারের কাছে এসে বলল—ঐ যে দেখছো জেড ব্লকের ন'নম্বর ঘর, ঐটাই। ওর বাবার নাম এস.কে. রায়। যাও।

মেয়েটি চলে গেল।

বাবলু আর বিলু দরজায় নক করতেই মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন।

বাবলু বলল—আপনি, রায়বাবু? মানে কুসুমের বাবা?

—হ্যাঁ। কোথায় সে? তার কোনো খবর আছে? এসো এসো, ভেতরে এসো। কি দুশ্চিন্তায় যে আছি বাবা।

বাবুল অবাক হয়ে বলল—খবর মানে?

রায়বাবু ডাকলেন—ও মা রুনু! দেখ তো মা এরা কারা। আমার তো ভয়ে হাত পা কাঁপছে।

রুনু ঘরে ঢুকল। ওর মুখ তখন কাগজের মতো সাদা।

রায়বাবু বললেন—কি হলো? হলো কি তোর?

বাবলু বলল—কিছুই হয়নি। উনি ভূত দেখেছেন।

ওদিক থেকে সাড়া এলো—তো—তো—তোমরা এখানে?

—এখন তো শুধু আমরাই এসেছি। এবারে পুলিশ আসবে। বলুন কেন আপনি এইভাবে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলেন? প্যাসিকে কার হাতে তুলে দিয়েছেন শীগগির বলুন? নাহলে কিন্তু আপনার ছেলেকেও আপনি হারাবেন।

রায়বাবু বললেন—এসব হচ্ছেটা কি? আমি তো এর মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

রুনু কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকল—বাবাই।

সেই ফুটফুটে ছোট্ট শিশুটি ঘরে এসে ঢুকল। রুনু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল—শোনো, কোনো মা কখনো তার ছেলের দিব্যি দিয়ে মিথ্যে কথা বলে না। আমিও তাই বলছি। আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করো, আমি একটু মাথা গরম প্রকৃতির মেয়ে। রেগে গেলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। তাই ছেলেপুলেকে একটু বেশি মারধোর করি। আমার সঙ্গে বিশেষ কারো বনে না। তাই পাড়াতেও আমার বদনাম। তবু বলছি, তোমরা আমাকে সন্দেহ করলেও জেনে রাখো আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি কিচ্ছু জানি না, মেয়েটা কি ভাবে চুরি হলো বা কারা এ কাজ করলো।

—আপনার কথা যদি সত্য হয় তাহলে মেয়েটাকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আপনার চলে আসা তো ঠিক হয়নি। আপনার বোন কোথায়? কুসুম?

—জানি না। তারও কোনো খবর নেই। সেও নিখোঁজ। মেয়েটা চুরি যাবার পর ওর সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া হয়। এবং এই ঘটনার জন্য আমি ওকেই দায়ী করি। ও যদি টিফিন পিরিয়ডে শেষ পর্যন্ত থাকত তাহলে এই অঘটন ঘটত না। সেই ঝগড়ার পর আমার বোন আমাকে কিছু না বলেই এক বস্ত্রে বেরিয়ে আসে। এ রকম আরো অনেকবার করেছে ও। কিন্তু এবারে কেন জানি না আমার মনটা একটু বিপদ আশঙ্কা করল। তাই রাতের গাড়িতেই আমি ওর খোঁজে চলে এসেছি এখানে। কিন্তু এসে দেখি সে আসেনি।

—সেকি!

—হ্যাঁ ভাই, কি যে হচ্ছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

রায়বাবু কেঁদে উঠলেন এবার—না না, আমার পাপ্পু আর ফিরবে না। আমার কুসুম অকালেই ঝরে যাবে। ওরা ওকে নির্ঘাৎ মেরে ফেলবে।

বাবলু বলল—ওরা কারা!

—যারা ঐ দুধের শিশুটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

—আপনার জামাই খবর পেয়েছে?

—তার ঠিকানা জানি না বাবা। অফিসের কাজে চারিদিকে যায়। কোথায় কখন থাকে তার ঠিক নেই। এখন শুনছি দুর্গাপুরে আছে। কিন্তু দুর্গাপুর তো একটুখানি জায়গা নয়।

বাবলু বলল—আচ্ছা আপনি সেন্টুমামাকে চেনেন?

—এ কি করে সম্ভব!

—হাউ ডেঞ্জারাস। সেন্টুকে চিনবো না? ওর ভালো নাম জর্জ। বর্ন ক্রিমিন্যাল একটা। জেল-ভাঙা কয়েদী। প্যাসির মামা।

—মামা!

—হ্যাঁ, আপন মামা। ফেরারি আসামী। এর সঙ্গেই

গন্ডগোল বলে আমার জামাই অর্থাৎ অজয় আগেকার শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি। প্যাসি যখন ছমাসের তখন থেকেই মামার বাড়ির সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। ওর মা স্টোভ বার্স্ট করে মারা যায়। আর ঐ ক্রিমিন্যালটার ধারণা হয় অজয় বুঝি তার বোনকে পুড়িয়ে মারে। তাই মাঝে মাঝে ও শাসাতো অজয়কে হয় তার বোনের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক লাখ টাকা দেবে, নয়তো প্যাসিকে কেড়ে নেবে সে। শুধু তাই নয়, আমার রুনুর সঙ্গে যখন অজয়ের বিয়ের কথা হলো তখন একদিন ও এসে শাসিয়েছিল, এখানে বিয়ে না দিতে। বলেছিল ওর বোনের হত্যার প্রতিশোধ ও একদিন না একদিন নেবেই। কাজেই এই রকম জায়গায় বিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক? এই সময় জর্জ একটি পুলিশ খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ে এবং যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হয়। তাই নির্ভাবনায় আমি অজয়ের সঙ্গে রুনুর বিয়ে দিই। প্যাসিকে তাহলে ঐ চুরি করেছে এবং আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য কুসুমকেও। নাহলে কুসুম গেল কোথায়? আমি তাই তো রুনুকে বকছি। আসলে বলব কি বাবা আমার এই মেজো মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। চিরকাল ও অসহিষ্ণু। কিছুতেই কারো সঙ্গে ও মিলিয়ে নিতে চায় না। শুধু এই বাচ্চাটার মোহে কুসুম ওর ওখানে যায়। তাও দু'চারদিনের মধ্যেই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে ওর দুর্ব্যবহারে।

বাবলুরা সব শুনে অনুমান করল ব্যাপারটা। বলল—আপনার বড়মেয়ে কোথায় থাকেন?

—বিলাসপুরে।

—কুসুম সেখানে যায়নি তো?

—না। তার সঙ্গে কোনো একটা ব্যাপারে আমাদের পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কাজেই ও সেখানে যাবে না। তাছাড়া বিলাসপুরের কোথায় যে সে আছে তাও জানি না আমরা।

—কুসুমের ব্যাপারে থানা পুলিশ করেছেন?

—করেছি। তবে বাবা অসুবিধে হয়েছে এই যে ওর বড় বয়সের কোনো ফটোই আমাদের কাছে নেই। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি জর্জের হাতে ও পড়ে থাকলে কারো ক্ষমতা নেই ওকে ফিরিয়ে আনে।

—এবার বলুন তো জর্জের চেহারাটা কিরকম?

—সুন্দর চেহারা। রাজপুত্রের মতো। টকটকে ফর্সা রঙ। পাজামা পাঞ্জাবী পরে। চাপদাড়ি রাখে। আর সব সময় মোটর বাইকে চেপে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ায়।

বাবলু বলল—কিছু যদি মনে না করেন তো বলি, আমাদের অনুমান প্যাসিকে অপহরণ করানোর ব্যাপারে কুসুমের যথেষ্ট হাত আছে। তার কারণ আমরা যার কাছে সেন্টুমামার নাম শুনি সেখানে আপনার মেয়ে কুসুম ছাড়া আর কেউ ছিল না। অথচ কি ভাবে যেন সেটা জর্জের কানে যায়। এতেই আমরা এই রকম একটা ধারণা করছি।

—এ কি করে সম্ভব! বলেই রায়বাবু মাথার চুলগুলো মুঠো করে ধরে বললেন—ওঃ! কি করি! তোমরা যাও। আমি আর কিছু শুনতে চাই না। এবার আমার স্ট্রোক হয়ে যাবে। ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। প্লিজ—গো ব্যাক্।

বাবলুরা আর সময় নষ্ট না করে চলে এলো স্টেশনে।

ঝাঁঝা স্টেশনে তখন ডাউন অমৃতসর মেল ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু স্টেশনে এসেই যা শুনল ওরা তাতে মেজাজ গেল আরো বিগড়ে। স্টেশনের মাইকে তখন ঘোষণা করা হচ্ছে মধুপুরের কাছে একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ার জন্য অমৃতসর মেল শিমূলতলা পর্যন্ত যাবে। কারণ অন্যান্য ট্রেনগুলো জসিডির কাছে গিয়ে লাইন ব্লক করে রেখেছে।

বাবলু বলল—এ যে দেখছি মহা গোলমাল রে ভাই। বাড়ি যখন ফেরা যাবে না তখন শিমূলতলাতেই যাই চল। ওখানে তো শুনেছি চেঞ্জাররা দলে দলে যাতায়াত করে। তার মানে হোটেল লজ সব কিছুই পাওয়া যাবে ওখানে। একটা দিন বিশ্রামও নিতে পারব।

বিলু বলল—বাবলু, আমি বলি কি শিমূলতলায় নেমেই বাচ্চু বিচ্চুদের বরং ট্রাঙ্ককলে জানিয়ে দিই এখানে চলে আসবার জন্য। তাহলে কিছু না হোক হপ্তা খানেক আমাদের দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানোও যাবে। প্যাসির অপহরণের ব্যাপারটা পারিবারিক। ইতিমধ্যে এখানে বসে থেকে দেখিই না কতদূর গড়ায়। ঝাঁঝা তো হাতের কাছেই। কুসুমের ব্যাপারটা এখান থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারব।

বাবলু বলল—দি আইডিয়া। ঠিক বলেছিস রে বিলু। এই কথাটা তো আমার মাথায় আসেনি।

ওরা আর সময় নষ্ট না করে দুটো টিকিট কেটে ট্রেনে উঠল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই শিমূলতলায়।

শিমূলতলায় ট্রেন থেকে নেমেই ওরা বাচ্চু বিচ্চুদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। এখানকার পোস্ট মাস্টার তখন হাওড়া স্টেশনে ফোন করছিলেন। কাজেই বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের। খুব সহজেই লাইন পেয়ে গেল ওরা। বাচ্চু বিচ্চু গতকালই ফিরে এসেছে। তাই বাবলুর ফোন পেয়ে বলল—ভোম্বলদার মুখে আমরা সব শুনেছি। আমরা রেডি। শুধু তোমার নির্দেশের অপেক্ষা করছিলাম। তুফানেই যাচ্ছি আমরা। তোমরা থাকার জায়গা ঠিক করে স্টেশনে থেকো, কেমন?

বাবলু বিলুকে বলল—ভালোই হলো। আজ বিকেলের মধ্যেই ওরা এসে পড়ছে।

ওরা পোস্টঅফিসের বাইরে এসে জিজ্ঞেস করতেই একজন বলল— বাঁদিকের রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। ওদিকে ভালো ভালো অনেক বাড়ি পাবেন। ডাকবাংলো, রানীকুঠি, বিহারীকুঠি। বাবলুরা তাই করল। পায়ে হেঁটে বেশ কিছুটা যাবার পর বিহারীকুঠিতে গিয়ে উঠল ওরা।

বিহারীকুঠির পরিবেশ খুব ভালো। তাছাড়া জায়গাটাও

ডাকব্যাক – ডানপিটেদের স্কুলব্যাগ

স্কুলের বাচ্চাদের কাছে
কিছুই যেন টেঁকে না ! আর
সেইজন্যইতো তাদের চাই
ডাকব্যাক স্কুল ব্যাগ । যত
ডানপিটেই হোক না কেন, এই
ব্যাগের মজবুত গড়ন আর
ভেতরের শক্ত লাইনিং সহজে
ছিঁড়বে না । শুধু তাই নয়, এই
ব্যাগ ওয়াটার প্রুফ কাপড়েও
পাওয়া যায় ।
চাই ডাকব্যাক স্কুলব্যাগ
কারণ অন্য ব্যাগের থেকে
আরো অনেক বেশি টেঁকে ।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিমিটেড
২৩০এ, এ. জে. সি বোস রোড
কলিকাতা-৭০০ ০২০

Mileage/BW/2/87

দারুণ। চারদিকে পাহাড়ের রেখা। ঝাঁঝার পাহাড়গুলো এখান থেকে স্পষ্টই দেখা যায়। এছাড়াও লাট্টু পাহাড়, লীলাবরণ পাহাড় দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

বিহারীকুঠির নির্জন পরিবেশে একটা ঘর ওরা ভাড়া করে নিল। দিনে পনেরো টাকা ভাড়া। বড় ঘর। প্রশস্ত বাথরুম। কিন্তু জল নেই। জল আছে বাইরের কুয়োতে। সেখানে অবশ্য দড়ি বালতি আছে।

বিহারীকুঠিতে যে লোকটি দেখাশোনা করে তার নাম গফুর। দরোয়ান কেয়ারটেকার দুই-ই। বাবলুরা তাকে বলল—দেখো ভাই, আমরা মোট পাঁচজন। এখন দুজন এসেছি। বিকেলের দিকে আরো তিনজন আসবে।

গফুর বলল—ভালোই তো! বেশ হৈচৈ হবে।

গফুরের সঙ্গে কথা বলে ঘরটাকে একটু গুছিয়ে রেখে দরজায় তালা দিয়ে বাইরে এলো ওরা। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। আশেপাশে কোনো মানুষ-জন নেই। দোকান নেই, কিছু নেই। একটু দূরে এক জায়গায় একটি চায়ের দোকান দেখে চা খেতে বসল ওরা। গরম গরম জিলিপি আর চা।

চা খেয়ে ওরা পায়ে পায়ে আবার স্টেশনের দিকে এলো। এখানটা তবু একটু জমজমাট। দোকানপত্তর সবই আছে। কিন্তু খুবই দৈন্য দশা এসবের। সবচেয়ে মুশকিল হলো একটি মাত্র অতি সাধারণ হোটেল ছাড়া আর কিছু নেই এখানে। আসলে যেখানে লোকজনই নেই সেখানে হোটেলে খাবে কে? অফ্ সিজন্ তো। পুজোর পর থেকে শীতের কয়েক মাস সব কিছুই পাওয়া যায়। তারপরই লোকজন চলে গেলে খাঁ খাঁ করে। এখন বাজারেরও হাল খুব খারাপ।

বাবলুরা হোটেলে খাওয়ার আশা পরিত্যাগ করে বিহারী-লজে ফিরে এসে গফুরকে বলতেই সে বলল—ওর জন্যে কিছু চিন্তা করো না খোকাবাবু। এসো আমি একটা দোকানে বলে দিচ্ছি, বলে ওদের যেখানে নিয়ে গেল সেই দোকানেই ওরা চা খেয়েছিল একটু আগে।

দোকানদার বলল—কজন তোমরা? দুজন তো? হয়ে যাবে। তবে একটু দেরি হবে বাবা। আগে যদি বলতে তো এতক্ষণে হয়ে যেত।

বাবলু বলল—কত দেরি হবে?

—এই ধরো না কেন একটা দেড়টা।

—ঠিক আছে। আপাততঃ একটু পাঁউরুটি বা বিস্কুট কোথায় পেতে পারি বলো তো?

—কোথাও পাবে না। পেলেও খেও না। একদম বাজে। এই রকম সময়ে কেউ এখানে বেড়াতে আসে? এরপর শীতের সময় আসবে কেমন?

এমন সময় একটি ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সের সুদর্শন যুবক পান চিবোতে চিবোতে এসে দোকানের সামনে পানের পিক ফেলে নারকেল দড়ির আগুনে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল—ওরা তো বেড়াতে আসেনি। এসেছে অন্য ধান্দায়। তাই না খোকা?

বাবলু বিলু চকিতে ঘুরে তাকাল তার দিকে।

সে তখন ফিক করে হেসে পাশের একটি পানের দোকানের গুমটির গা থেকে মোটর বাইকটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

বাবলু বলল—এই লোকটা কে গো?

—জয়নাল। বদ মতলবি লেড়কা।

—কোথায় থাকে ও?

—কোঈ পতা নেহি। আজ হিঁয়া, কাল হুঁয়া। চোরোঁ কা বাদশা।

বাবলুরা কুঠিতে ফিরে এলো।

বাবলু আর বিলু স্নান করে ওদের সঙ্গে আনা ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে রাস্তার মোড়ে যে টিউবওয়েলটা আছে সেখানে চলল জল আনতে। ইঁদারার জল যতই হজমি হোক ও জল ওদের পক্ষে খাওয়া সম্ভব হবে না। জল নিয়ে ফেরবার সময় একটু অপেক্ষা করে একেবারে চা-দোকানে বসে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিল। ভাত ডাল আর একটা তরকারি। বেশ রান্না।

দুপুরবেলা বিশ্রাম। শুয়ে শুয়ে নানারকম যুক্তি করতে লাগল দুজনে। প্যাসিকে অপহরণ, কুসুমের অন্তর্ধান, আর জয়নালের ঐ বক্তব্য 'ওরা তো বেড়াতে আসেনি, এসেছে অন্য ধান্দায়'—সব কেমন জট পাকিয়ে যেতে লাগল।

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় দরজায় টকটক শব্দ।

—কে?

—আমি।

গফুরের গলা। বাবলু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। গফুর ভেতরে ঢুকল। গফুরের বয়স ষাটের কাছাকাছি। শক্তসমর্থ দেহ। মাথার চুলগুলি পাকা। কালো ময়লা প্যান্ট আর খাকি জামা পরনে। গফুর ভেতরে ঢুকে বলল—খোকাবাবুদের কোনো তকলিফ হচ্ছে না তো?

—না।

—ক রোজ ঠারোগে তুম সব?

—দেখি, হপ্তাখানেক বড়জোর।

গফুর একবার যেন অকারণেই চারপাশ দেখে নিয়ে বলল—না খোকাবাবু, তোমরা এক কাজ করো। দিন ভর ঠারো হিঁয়া পর। কাল সবেরে পাঞ্জাব মেল পাকড়কে দেওঘর, মধুপুর চলা যাও। হিঁয়া মাৎ ঠারো।

বাবলু বলল—কেন?

—খোকাবাবু, কিসিকো মাৎ বোল না। তোমাদের সঙ্গে বড় কেউ নেই এই ভেবেই কিছু বদমাস তোমাদের পিছু নিয়েছে। তুম দোনো ইধার উধার ঘুমোগে আর ও বদমাশ ছিন লেগা তুমহারা সব কুছ।

—সেকি!

—হাঁ খোকাবাবু। একটু আগে জয়নাল এসেছিল।

[চলবে]

ছবি : দিলীপ দাস

পুঁচকের বাহাদুরি

অজেয় রায়

রতন একটা হনুমান পুষেছে।

হনুমানটাকে রতন এনেছিল যখন একেবারে বাচ্চা। ওর মা হঠাৎ মরে গিয়েছিল ইলেকট্রিক তারের শক লেগে। কাকেরা ঠোকরাচ্ছিল মর-মর ছোট্ট বাচ্চাটাকে। আর রাস্তার কুকুরগুলো ওৎ পেতেছিল ছাদ থেকে নিচে নামলেই ওকে ধরবে। অন্য হনুরা কেউ তখন কাছে ছিল না ওকে বাঁচাতে।

বাচ্চাটাকে রতন বাড়ি নিয়ে এল। অনেক সেবাযত্ন করে তাকে সুস্থ করে তুলল। ওর নাম রাখল পুঁচকে।

পুঁচকে রতনের বেজায় ন্যাওটা হয়ে উঠল। রতন বাড়ি থাকলে সব সময় তার পায়ে পায়ে ঘোরে। রতন কাছে কোথাও গেলে পুঁচকে তার কাঁধে চড়ে বেড়ায়। রতন দূরে গেলে পুঁচকেকে বেঁধে রেখে যায়।

চার হাত উঁচু এক বাঁশের খুঁটি। তার ওপর একটা কাঠের বাক্স। পুঁচকের আস্তানা। পুঁচকে লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে খুঁটির মাথায়। কখনো পুঁচকে বাক্সের ওপর বসে চুপচাপ গাল-গলা চুলকোয়। এদিক সেদিক তাকায়। কখনো সে ভারি ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করে। পায়চারি অর্থাৎ ক্রমাগত খুঁটির গা বেয়ে একবার নিচে নামে আবার ওপরে ওঠে।

পুঁচকে সবচেয়ে ভালবাসে রতনের সঙ্গে সাইকেল চেপে ঘুরতে।

রতনের একটা বাইসাইকেল আছে। সাইকেলে চড়ে কাছাকাছি গেলে সে পুঁচকেকে সঙ্গে নেয়।

পুঁচকে যখন ছোট ছিল তখন সাইকেলে বেরলে সে রতনের কাঁধে উঠে বসে থাকত। কখনো বা বসত সাইকেলের হাতলে। সাইকেল ছুটলে ভারি মজা পেত। পিটপিট করে দেখতে দেখতে যেত চারধার। কোনো কুকুর ওকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করলে ঝপ্ করে উঠে বসত রতনের কাঁধে।

দেখতে-দেখতে পুঁচকে আর কিন্তু পুঁচকে রইল না। মস্ত বড় হয়ে গেল। রীতিমত গোবদা হনুমান। রতনের সঙ্গে সাইকেলে বেরলে আর সে রতনের কাঁধে চাপে না। বেজায় ভারি হয়ে গেছে যে। সামনে হাতলে বসলেও মুশকিল। সাইকেল চালাতে অসুবিধা হয়। তাই এখন পুঁচকে বসে সাইকেলের পিছনের সীটে। হাত দিয়ে ধরে থাকে সীটের নিচে অথবা রতনের কোমর। তার লম্বা লেজটা পাছে সাইকেলের চাকায় জড়িয়ে যায় তাই গুটিয়ে সামনে তুলে রাখে।

সব জায়গায় আর তাকে নিয়ে যায় না রতন। অতবড় গোদা হনুকে দেখে অনেকে ভয় পায়। তবে অশথতলার বেদীতে

যখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যায় রতন, তখন অবশ্য পুঁচকে সঙ্গে থাকে। যতক্ষণ রতন গল্প করে পুঁচকে সে সময়ে গাছের ডালে ডালে ঘোরে। গাছে বা কাছাকাছি মাটিতে বেড়িয়ে এটা-সেটা খায়।

একদিন সকালে রতন আড্ডা মারতে বেরচ্ছে অশথতলায়, তার মা বললেন, 'রতন, দোকান থেকে একটু গরম-মশলা কিনে আনিস। এই নে পয়সা। বাজারের মোড়ে দশকর্মা ভান্ডার, সেখান থেকে কিনিস। ওখানকার মশলা ভাল। কিনে এখুনি দিয়ে যেতে হবে না। ফেরার সময় আনলেই হবে। রাতে রান্নার জন্যে লাগবে।'

রতন পুঁচকেকে নিয়ে বেরল সাইকেলে। ভাবল, যাওয়ার পথেই মশলাটা কিনে নিয়ে যাই। নইলে হয়তো ভুলে যাব পরে।

দশকর্মা ভান্ডারের গায়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে রতন ভিতরে ঢুকল। সাইকেলে তালা লাগাল না। ভাবল, একটুখানি মশলা, এখুনি কিনে নিয়ে বেরিয়ে আসব। তার জন্যে আর তালা লাগানোর ঝামেলা করার দরকার কি? তাছাড়া দোকান থেকেই সাইকেলের ওপর নজর রাখতে পারব।

রতনের গরম-মশলা কেনা কিন্তু চট করে হলো না।

দোকানে বেশ ভিড়। কর্মচারিরা ছোটাছুটি করছে।

রতন চাইল তার জিনিস।

দোকানের একজন লোক মুখে বলল বটে, 'দিচ্ছি', তবে দেখা গেল তারা বড় বড় খদ্দের সামলাতে বেশি ব্যস্ত। রতনের ঐ সামান্য জিনিস দিতে কারও আগ্রহ নেই।

রতন জোর তাগাদা শুরু করে দিল।

এই সময় একটি লোক গুটিগুটি এসে দাঁড়াল রতনের সাইকেল ঘেঁষে। সে একটু দূরেই ছিল। নজর রাখছিল অন্যদের সাইকেলের দিকে। সে লক্ষ্য করল রতনের সাইকেলে তালা পড়ল না। লোকটা একজন সাইকেল চোর।

সাইকেল চোর উঁকি মেরে দেখে নিল যে রতন দোকানের ভিড়ের আড়ালে। এবং সাইকেলের দিকে রতনের চোখ নেই। অমনি ঝট্ করে সাইকেলটা টেনে নিয়ে চেপে বসল চোরটা। সে উধাও হয়েই যেত কিন্তু পারল না।

পুঁচকে দোকানের এক কোণে বসে মেঝে থেকে চাল গম ছোলা এইসব খুঁটে খুঁটে তুলে খেয়ে সময় কাটাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল, একটা অচেনা লোক তাদের সাইকেলটা নিয়ে চলে যাচ্ছে। পুঁচকের মনে ভারি ধোঁকা লাগল। তার বোধ হলো, লোকটার রকম ভাল নয়। ওকে আটকানো উচিত।

অমনি পুঁচকে 'হুপ' বলে এক ডাক ছেড়ে লম্বা লাফে পড়ল গিয়ে সাইকেলের চোরের ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মুঠো করে আঁকড়ে ধরল লোকটার চুলের গোছা।

চোর তো 'বাপ্রে' বলে সাইকেলসুদ্ধু হুমড়ি খেয়ে পড়ল চৌরাস্তায়।

'কি হলো? কি হলো?' লোকজন ছুটে এল। হৈ হৈ কান্ড।

অন্যদের সঙ্গে রতনও ছুটল ব্যাপার দেখতে। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়েই সে থ'। আরে এ যে তারই সাইকেল পড়ে আছে রাস্তায়। আর পাশেই কাত হয়ে শোওয়া একটা লোকের ওপর চেপে বসেছে পুঁচকে। এক হাতে সে পাকড়ে ধরেছে লোকটার চুল এবং ভীষণ ভাবে দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে লোকটাকে।

রতন বুঝে ফেলল, ওই লোকটা নির্ঘাত সাইকেল চোর। ভাগ্যিস পুঁচকে ধরেছে। সে চারপাশে ঘিরে থাকা জনতাকে চটপট বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা।

ব্যস, তারপরই–'মার মার।' খুব পিটুনি খেল চোরটা।

এর পর থেকে লোকের মুখে মুখে শুধু পুঁচকের বাহাদুরির গল্প।

ছবি: সরোজ সরকার

জিজ্ঞাসার ডাইরি

শিবকৃষ্ণ

১ নিচের প্রশ্নগুলির চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে, সঠিক উত্তর বার করো, যদি কোনোটাই ঠিক না হয় তবে (৫) এ দাগ দাও।

☐ কোন প্রাচীন গ্রীক বৈজ্ঞানিক আণবিক তত্ত্বের ধারণা দেন–
(১) আর্কিমিডিস (২) পিথাগোরাস (৩) ইউরেকা (৪) ডিমোক্রিটাস (৫) কোনোটাই নয়।

☐ চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় প্রায়–
(১) এক ঘণ্টা (২) একদিন (৩) এক মাস (৪) এক বছর (৫) কোনোটাই নয়।

☐ কোন গ্রহকে খালি চোখে কখনই দেখা যায় না–
(১) বুধ (২) শুক্র (৩) মংগল (৪) নেপচুন (৫) কোনোটাই নয়।

☐ পৃথিবী থেকে মংগল গ্রহের দূরত্ব প্রায়–
(১) ৮০ লক্ষ কিলোমিটার (২) ১ কোটি কিঃ মিঃ (৩) ৮ কোটি কিঃ মিঃ (৪) ৮০ হাজার কিঃ মিঃ (৫) কোনোটাই নয়।

☐ কোন পদার্থের কোন মান মহাবিশ্বের সমস্ত অবস্থায় নিরপেক্ষ–
(১) আয়তন (২) তাপ গ্রহণক্ষমতা (৩) ওজন (৪) ভর (৫) কোনোটাই নয়।

☐ মানুষ চাঁদে পৃথিবীর থেকে কম টান (অভিকর্ষ বল) অনুভব করে কারণ–
(১) চাঁদ পৃথিবীর থেকে আয়তনে কম (২) চাঁদে সমুদ্র নেই (৩) চাঁদে বায়ুমণ্ডলের চাপ নেই (৪) চাঁদের কোনো মেরু নেই (৫) কোনোটাই নয়।

২ আমাদের সূর্যকে মাঝখানে রেখে ঘুরে চলেছে যে সব গ্রহের দল তাদের এক একজনের দিন রাতের মাপ এক একরকম। এসো নিচের তালিকায় মেলাবার চেষ্টা করি পৃথিবীর তুলনায় তাদের দিন কাটে কত ঘণ্টায়। সেই সংগে মিলিয়ে নেব এই সব গ্রহের প্রতীক চিহ্নগুলিকে যা ব্যবহার হয়ে আসছে অতি প্রাচীন যুগ থেকে। এদের সংগে চাঁদকেও ধরে নেব কারণ প্রাচীন কালে চাঁদকেও গ্রহ মনে করা হতো।

১ বুধ,	ক।। ২৭ দিন ৮ ঘঃ,	অ।।	⛢
২ শুক্র,	খ।। ৫৯ দিন,	আ।।	♀
৩ পৃথিবী,	গ।। ১৩ থেকে ২৪ ঘঃ	ই।।	♂
৪ চন্দ্র,	ঘ।। ১৮ ঘঃ ৩০ মিঃ	ঈ।।	☿
৫ মংগল,	ঙ।। ১০ ঘঃ ৪০ মিঃ,	উ।।	♇
৬ বৃহস্পতি,	চ।। ৬ দিন ৯ ঘঃ	ঊ।।	♆
৭ শনি,	ছ।। ২৪৩ দিন,	ঋ।।	♄
৮ ইউরেনাস,	জ।। ৯ ঘঃ ৫৫ মিঃ,	ঌ।।	♃
৯ নেপচুন,	ঝ।। ২৪ ঘঃ ৩৭ মিঃ,	এ।।	☾
১০ প্লুটো	ঞ।। ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ,	ঐ।।	⊕

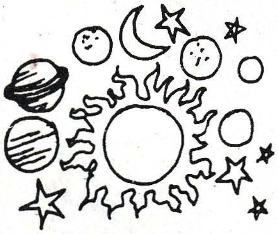

একদিন প্রতিদিন

পৃথিবীর সমস্ত জল যদি আধ লিটার দুধের দুটো বোতলে ভরে দেওয়া যেত তবে পানীয় জলের পরিমাণ হবে মোট এক চামচ।

তাই তৃতীয় বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের (যার অর্ধেক শিশু) মৃত্যু হচ্ছে যে রোগে তার কারণ জল।

কিন্তু পৃথিবীতে যা বৃষ্টি হয় তাতে প্রতিদিন ৩১,০০০ লিটার জল মানুষ প্রতি বরাদ্দ করা যেত। তবে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মহাসাগর, তাই পৃথিবীতে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মোটে তিন মিলিমিটারের কিছু বেশি।

আর একজন আমেরিকাবাসী একজন ভারতীয়ের সাতগুণ বেশি জল নিত্য ব্যবহার করছে।

যে কথাটা ঘুরছে মনে

ছবি দুটো দেখলেই বুঝতে পারবে একটা জল-ভর্তি বোতলকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা হচ্ছে বরফ দিয়ে–কিন্তু তোমার মতে কোন ব্যবস্থায় বেশি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে–আর হলেই বা তার কারণ কি?

বোতলটি বরফের নিচে রাখলেই তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে। কারণ ঠাণ্ডা তরলের ঘনত্ব বেশি। বোতলের ওপর দিকের জল কিছুটা ঠাণ্ডা হলেই তার ঘনত্ব বেড়ে যাবে এবং তা নিচে চলে যাবে। তখন অপেক্ষাকৃত গরম ও হাল্কা জল ওপরে উঠে আসবে এবং ঠাণ্ডা হবার সুযোগ পাবে। এই ভাবে তাপ বিনিময় (পরিচলন) করে পুরো বোতলের জলই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু গরম করার সময় ঠিক উল্টোটি করা হয়। কেন বলো তো?

বিজ্ঞানের বিবর্তন

'মোনালিসা' লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ছবি। লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) এক নতুন যুগের পত্তন করলেন যার অস্ত্র ছিল বিজ্ঞান, আর এই বিজ্ঞানের রূপকার দা-ভিঞ্চিই এনেছিলেন ইউরোপে 'নবজাগরণ' (রেনেসাঁ)।

এই মাসে গাব্রিল ডানিয়েল ফারেনহাইট (জন্ম ১৪ই মে ১৬৮৬) ফারেনহাইট শব্দটার সংগে আমরা সকলেই পরিচিত। আমাদের দেহের তাপমাত্রা এখনও ফারেনহাইটের হিসাবেই মাপা হয়। এই স্কেলের উদ্ভাবন করেন জার্মান বৈজ্ঞানিক ফারেনহাইট। ইনিই প্রথম থার্মোমিটারে অ্যালকোহলের বদলে পারদ ব্যবহার করেন এবং তার ফলেই এল নিখুঁত মাপের স্কেল ^{0}F। তরলের স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় পদ্ধতিও ফারেনহাইটের আবিষ্কার। তবে তাঁর স্কেলের ডিগ্রী ভাগ করার ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নিউটন। ১৭৩৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ফারেনহাইটের মৃত্যু হয়।

১ উত্তর (৪), (৩), (৪), (৩), (৪), (১)
২ উত্তর
১, খ, ঈ; ২, ছ, আ; ৩, ঞ, ঐ; ৪, ক, এ; ৫, ঝ, ই; ৬ জ, ঌ; ৭, ঙ, ঋ; ৮, গ, অ; ৯, ঘ, ঊ; ১০, চ, উ

Apr—Suk 6

স্টার ট্রেক

রন হ্যারিস ও শ্যারমান ডিভোনো

-(পূর্ব প্রকাশিতের পর)-

মিমিট কিজিনটি-দের রাজ্য সীমানার ঠিক বাইরে।
হ্যাঁ, আর একটা জিনিস আমরা জানতাম না যে কিজিনটিরা বছরে একবার করে ঐ দানব শিকারে মিমিটে আসে।
ওরা আমাদের প্রাণে বাঁচায়।
কিন্তু ক্রীতদাস করে রাখে।
বিবিবিবিকিউদের পক্ষে ঠিক হলেও মিমিট কিজিনটিদের কাছে এই উপগ্রহটা তো নেহাতই ছোট...
অন্তত এখনো পর্যন্ত !
ক্যাপ্টেন কার্ক তোমার দলের অন্যরা এখন নিরাপদ। এবার তোমাকে আর প্রথম হাই কাউন্সিলকে ট্রানসপোর্টারের মাধ্যমে আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাবো......
কিজিনটি খুনে-দল এখনই এসে পড়বে !
বিবিবিবিকিউরা তাদের লুকানো যন্ত্রের সাহায্যে ক্যাপ্টেন কার্ক এবং তাদের দলের সদস্যদের নিরাপদ ঘাঁটিতে এনে ফেললো......
ও......
এখন বুঝতে পারছি ট্রানসপোর্টারের মাধ্যমে ওরা আমায় এখানে এনে ফেলেছে।
DIST. BY ASIA FEATURES
ওদিকে কিজিনটির খুনে-দল এসে গেছে ধ্বংস হওয়া সাটলটার কাছে......
All Rights Reserved Dist by L.A. Times Synd © 1982 Paramount Pictures Corp
তখন সাটলের মধ্যে......

[চলবে]

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক

প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী

শিবাজী শূদ্র, রাজা হইবার যোগ্যতা নাই তাঁর,
ভোঁসলে বংশ, পতিত ব্রাত্য, ভুলেছে শাস্ত্রাচার।
সেই বংশের শিবাজী কেমনে পাইবে সিংহাসন?
ক্রোধে গর্জায় মারাঠা দেশের যত খল ব্রাহ্মণ।
সেনানী কাবজী, শিবাজী ভক্ত, ভ্রূকুটি কুটিল নয়নে
দারুণ ঘৃণায় উচ্চকন্ঠে কহে ব্রাহ্মণগণে—
"বিদেশী মোগলে কর দিতে বুঝি নাহি কোনো অপমান,
হাবসী সিদ্দি(১), মেথর খাটায়, তাতে থাকে সম্মান?
তুলজাপুরের ভবানীমূর্তি গুঁড়ো করে আফজল,
কোন বীর এর দিয়েছিল জানো সমুচিত প্রতিফল?"
থামিল কাবজী, উঠিল এবার মহাবল পালকর(২),
বিষাদে মগ্ন কিন্তু তীব্র ধীর গম্ভীর স্বর —
"হিন্দু রাজ্য কাহার স্বপ্ন কে রাখে নারীর মান,
কাহার কৃপাণে সভয় মোগল বিদেশী কম্পমান?
যাহার কৃপায় শাস্ত্রচর্চা কর হয়ে নির্ভয়,
বধূ, কন্যারা থাকে নিরাপদে সে নাকি 'যোগ্য' নয়!
সে যদি শূদ্র, ক্ষত্রিয় কেবা বল দেখি ব্রাহ্মণ,
চিনেছ কেবল বৃত্তি 'বতন'(৩), সোনার মুদ্রা 'হোন'।
পতাকায় যার গেরুয়ার রঙ অন্তরে বৈরাগী,
ধর্মরাজ্য লক্ষ্য যাহার, 'অযোগ্য' হয় সে কি?
এমন মহানে অপমান কর এমনি তোমরা ক্ষুদ্র,
গো-ব্রাহ্মণ রক্ষাকারীকে ঘৃণাভরে কহ শূদ্র?"
ব্রাহ্মণদের প্রতিবাদ শুনি হাসিয়া শিবাজী কন,
"শাস্ত্রবিধান মানি আমি, নাই তর্কের প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণ ওরা, ভোগী নয়, ত্যাগী যজন -যাজন করে,
স্বয়ং ব্রহ্মা জন্ম দেছেন নিজ মুখগহ্বরে(৫)।
রাজসভা নয়, ত্যাগীদের স্থান তপোবনে যাক ফের,
'বতনে' তাদের কিবা প্রয়োজন, বতন দিয়েছি ঢের।
ব্রাহ্মণ হবে অপ্রতিগ্রাহী দারিদ্র্যে নাহি ভয়,
ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই শান্তি এই তো শাস্ত্রে কয়।
ফিরে যাক তারা আপন কুটিরে অরণ্যবন মাঝে,
পূজা-অর্চনা বেদপাঠ লয়ে ব্যস্ত থাকুক কাজে।
দাও নীল প্রভু(৬), ঢ্যাঁড়া পিটে পিটে এ আদেশ জারি করে,"
বলেন শিবাজী মুন্সীরে ডাকি মহা কৌতুক ভরে।
আবজীরে কন,"গাগাভট্টের(৭) খোঁজে যাও কাশীধাম,
জাতি কেনাবেচা, ক্রেতা আমি আজ, দেব যত লাগে দাম।"
লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ লয়ে গাগাজী দিলেন পাঁতি—
শিবাজী-জন্ম, ক্ষত্রিয় কূলে,নন তিনি হীন জাতি।

ভট্টের পাঁতি ! শেষ কথা তাহা কেবা খন্ডন করে !
নিষ্ফল ক্রোধে নিন্দুকদল গালি দেয় এরে ওরে।
'বতন' এবং বেতন-ভোগীরা ঢ্যাঁড়া শুনে পায় ভয়,
শিবাজীর পায়ে কেঁদে পড়ে বলে, শিবাজী 'শূদ্র' নয়।
রামদাস গুরু, জীজাবাঈ মার নিয়ে পদধূলি শিরে,
স্বাধীন হিন্দু নৃপতি বসিল সিংহাসনের পরে।
'রায়গড়' হতে তোপের আওয়াজে জানিল ভারতবর্ষ,
'হিন্দবী স্বরাজ' হয়েছে সফল দিকে দিকে জাগে হর্ষ।
পুণ্যভূমির মাটিতে পড়েছে বনস্পতির বীজ,
মুম্বাই দ্বীপে কাঁপে ইংরেজ, গোয়ায় পর্তুগীজ।
দিল্লীতে ক্ষোভে, রোষে গর্জায় বাদশা আলমগীর,
'ছত্রপতির' জয়ধ্বনিতে কাঁপে সাগরের তীর।
হিন্দবী রাজ সফল করেছে মহারাষ্ট্রের বীর,
পাঁচ শতকের হতমান জাতি উচ্চে তুলেছে শির।
অভিষেক দিনে, শিবাজীর চোখে বাষ্পের ঘন মেঘ,
একি আনন্দ ? না, না, বেদনায় জাগে মনে উদ্বেগ !
শ্রেণী বর্ণের দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ মারাঠার ঘরে ঘরে
বলে নাকো কেউ মোরা এক জাতি একে অন্যের তরে।
দেশস্থ(৮) যত ব্রাহ্মণ তারা যদি 'কোঙ্কণ'(৯) জানে,
পংক্তি ভোজনে বসে নাক আর অপমান বলে মানে।
'চিৎপাবনেরা' ঈর্ষাকাতর 'দ্বিজ শেনবী'র(১০) নামে,
আপন স্বার্থ চিন্তায় ফেরে, স্বার্থ বিকায় দামে।
বিদ্যায় বড় 'কায়স্থ' যদি ধনে, মানে পায় খ্যাতি,
'গ্রামণ্য'(১১) করে ব্রাহ্মণগণ জানে শুধু বজ্জাতি।
লুব্ধ সবাই উৎকোচ আর 'বতন' বৃদ্ধি নিয়ে,
কোন প্রয়োজন হইবে সাধিত স্বদেশের হিত দিয়ে ?
জ্যেষ্ঠ তনয়, জেনেছেন ভাল, একেবারে অপদার্থ,
হস্তে তাহার হবে না রক্ষা স্বদেশের কোনো স্বার্থ।
অভিষেক কালে মাথায় তাঁহার ঝরিল তীর্থজল,
জানিল না কেউ, মিশিল তাহাতে শিবাজীর আঁখিজল।

---

(১) ভারত মহাসাগরের মঞ্জিরা দ্বীপের (বোম্বাই-এর ৪৫ মাইল দক্ষিণে) অত্যাচারী হাবসী সর্দার ব্রাহ্মণদের ধরে নিয়ে গিয়ে মেথরের কাজ করাতো।
(২) নেতাজী পালকর। বীরত্বের জন্য এঁকে ২য় শিবাজী বলা হত।
(৩) ব্যক্তিগত চাষের জমি ও জমিদারী।
(৪) বর্তমানের সিকির আকারের ক্ষুদ্র স্বর্ণমুদ্রা।
(৫) পুরাণে আছে ব্রাহ্মণদের জন্ম ব্রহ্মার মুখ থেকে।
(৬) শিবাজীর খ্যাতিমান বিদ্বান মুন্সী-'জিজিয়া' কর রহিতের জন্য আওরঙ্গজেবের কাছে শিবাজীর পত্র ফারসীতে লেখেন।
(৭) মারাঠা জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত। পুরো নাম বিশ্বনাথ ভট্ট (ডাকনাম গাগাভট্ট)।
(৮) পুনা অঞ্চলের স্থানীয় ব্রাহ্মণ।
(৯) চিৎপাবন শাখার ব্রাহ্মণ।
(১০) গোয়া অঞ্চলের গৌড়-সারস্বত শাখার ব্রাহ্মণ।
(১১) একঘরে।

ছবি : দিলীপ দাস

এক মিনিটের ডিটেকটিভ গল্প

সর্বিলক

জোড়া খুন হয়েছে। পরীক্ষিৎ দাশগুপ্ত বললেন :

নিমাই, হরেন ও আমি শিকারে বেরব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। ওরা অবিশ্যি আমার আগেই এসে পৌঁছে গিয়েছিল। রাস্তা দিয়ে আসতে আসতেই আমি ওদের কথাবার্তার আওয়াজ পাই। কাছাকাছি আসতে শুনি ওরা বেশ চেঁচামেচি করছে নিজেদের মধ্যে। বুঝলাম, রেগে গেছে, কিন্তু রাগের কারণটা ধরতে পারলাম না। অবিশ্যি ওই দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হতো।

ওরা ঝগড়া করতেই এত ব্যস্ত যে আমাকে দেখতে পেল না, আমি কতো কাছে এসে গেছি। হঠাৎ দেখি, নিমাই হরেনকে গুলি করল। হরেনও পাল্টা গুলি চালাল। চারবার গুলির আওয়াজ পাই আমি। আমি ছুটে ওদের কাছে আসতে দেখি—দুজনেই মারা পড়েছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেল, দুজনেরই বুকের বাঁদিকে দুটি করে গুলি লেগেছে। দুজনেরই রিভলবার থেকে দুটি করে বুলেট খরচ হয়েছে। ডিটেকটিভ পরীক্ষিৎকে জিজ্ঞেস করলেন, নিমাইবাবু কি ন্যাটা ছিলেন ?

ঠিক জানি না তো !

আপনাকে আমি খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করলাম।

ডিটেকটিভ কী প্রমাণ পেয়েছিলেন ?

সমাধান : বুকের যে অংশে গুলি লেগেছিল, তাতে একবার গুলি খাওয়ার পর কারুরই পাল্টা গুলি চালাবার কথা নয়। পরস্পরের দিকে দু বার নিখুঁত গুলি চালানো এবং টিপ করে—অসম্ভব।

ছবি : দিলীপ দাস

কী করে লেখাপড়া মনে রাখতে হয়

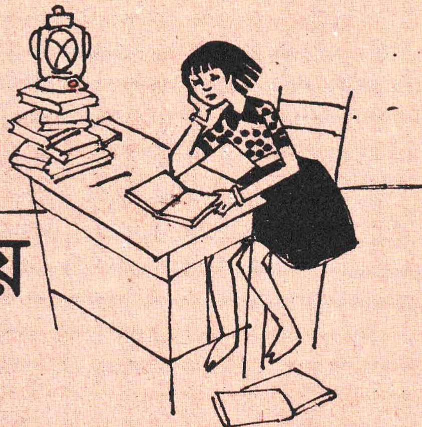

বিশ্বনাথ রায়

লেখাপড়া মনে রাখা কিন্তু মোটেই শক্ত কাজ নয়, খুব সোজা এ কথা বড় বড় ডাক্তারবাবুরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। কী ভাবে মনে রাখতে হয়, সে কথায় পরে আসছি, তার আগে পাস ফেলের কথা একটু বলে নিই।

দেখো, তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত ক্লাশে উঠেছ, অনেকে উঠতে পারোনি। অনেকে হয়ত ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়েছ। যারা পাস করতে পারোনি, তারা একটুও মন খারাপ করবে না। পরীক্ষা হচ্ছে ফাইনাল খেলার মতো। অনেক সময় দেখো না, খুব বড় বড় খেলোয়াড় ফাইনাল খেলতে গিয়ে একদম খেলতে পারলেন না, আবার কোনো খেলায় ভীষণ ভাল খেললেন। সুনীল গাভাসকারের কথাই ধরো। কোনো খেলায় সেঞ্চুরি করলেন আবার কোনো খেলায় দশ বারো রান করে আউট হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁকে কি খারাপ খেলোয়াড় বলবে? পাস ফেলও তাই। এবারে ফেল করেছো তো কী হয়েছে, এর পরের বারে যাতে পাস করতে পারো সেই জেদ করতে হবে। মনে মনে জেদ না করলে কিন্তু কিছু হবে না। মনে জেদ রেখে আমি যেভাবে বলছি, সেই ভাবে পড়ে দেখ, নিশ্চয়ই পরের বারে পাস করবে।

যারা পাস করেছ, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়েছ, তারা কিন্তু মনে একদম অহংকার আনবে না। অনেক সময় দেখা গেছে, এ বছর ভালো রেজাল্ট হলো তো, পরের বছর রেজাল্ট খুব খারাপ হয়ে গেল। সেইজন্যে পাস করার পর দু একদিন আনন্দ করবে, কিন্তু স্কুল খোলার আগেই নিজের মনকে তৈরি করে ফেলতে হবে। আর একটা কথা, যারা ফেল করেছে, তাদের দেখে রাগাবে না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে না, হেয় জ্ঞান করবে না। তুমি তার চেয়ে ভাল জানো বলেই তো পাস করেছ, কিন্তু তুমি যদি তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর, দেখবে পরের বছর তুমি ফেল করে গেছ আর সে পাস করে গেছে।

এইবার এসো কী করে লেখাপড়া মনে রাখা যায়, তার গল্প বলি। এ গল্প কিন্তু আমার নয়। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই তথ্য বার করেছেন। তোমাদের জন্য সহজভাবে বলার চেষ্টা করছি।

পড়াশুনার ব্যাপারটা একটা কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স্। এটা ডাক্তারি ভাষা হয়ে গেল, তোমাদের কাছে শক্ত লাগবে, কিন্তু আমি যা বলছি সেগুলো করতে, তোমাদের একটুও শক্ত লাগবে না। দেখবে কিছুদিন অভ্যেস করলেই আপনা থেকেই সব করতে পারছ। এই যে আপনা থেকেই যে অভ্যেস তৈরি হয়, তাকে বলা হয় কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স্। মহামতি প্যাভলভ্ এই কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স্ আবিষ্কার করেছিলেন, সে গল্প আর একদিন বলব।

তোমরা নতুন ক্লাশের বই পেলে, তাতে মলাট দেবে। ধরো ভূগোলে নীল, ইতিহাসে লাল, ইংরিজীতে সাদা, বাংলায় হলদে এই রকমভাবে মলাট দিয়ে তাকে সাজিয়ে রাখবে। মলাটের ওপর কিছু লিখবে না। শুধু তোমার নাম, স্কুলের নাম আর ঠিকানা ছাড়া। এইবার মলাটের রঙ দেখে মনে করতে চেষ্টা করবে কিসের বই তুমি বার করেছ? প্রথম প্রথম ভুল হবে। হয়ত ভাবলে ভূগোল, বার করে দেখলে অংকের বই, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখবে, তুমি মলাটের রঙ দেখেই চিনতে পারছ তোমার বইটা কিসের বই।

এবার এসো পড়াশুনোর ব্যাপারে।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠবে। ভাল করে মুখ হাত-পা ধুয়ে ফেলবে। হাতের কনুই পর্যন্ত, পায়ের হাঁটু পর্যন্ত। তারপর যেখানে বসে তুমি পড়াশুনা কর, সেই জায়গাটা পরিষ্কার করবে। যদি পার একটা ধূপ জ্বেলে দেবে। এর মধ্যে মা দিদি ঘুম থেকে উঠে যদি তোমার খাবার করে দেন, তাহলে খেয়ে নেবে। একটা কথা, খেলে রোজ খেতে হবে, একদিনও বাদ গেলে চলবে না। সকালের খাওয়া খেয়ে পড়তে বসবে। আগেই বলেছি, পড়াশুনা করা এক রকমের কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স্। যেই তুমি সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত-পা ধুয়ে, কিছু খেয়ে তারপর পড়ার জায়গায় ধূপ জ্বালবে, অমনি দেখবে তোমার পড়াশুনার ইচ্ছে জেগে উঠবে।

রোজ সকালবেলায় লেখার কাজ করবে। সোমবার সন্ধ্যেবেলায় তুমি যা পড়বে, বুধবার সকালবেলায় সেই পড়া বই বা নোট না দেখে লিখবে। ঠিক করে নেবে পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিটের মধ্যে লেখা শেষ করবে। তাড়াতাড়ি লেখার

অভ্যেস করতে হবে, কারণ পরীক্ষার সময় একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমাকে কোশ্চেনের উত্তর দিতে হবে। তারপর সেটা বন্ধ করে, অন্য আর একটা বিষয় অমনিভাবে লিখবে। প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য আলাদা খাতা করবে। ভূগোলের খাতায় ভূগোল লিখবে, অঙ্কের খাতায় অঙ্ক কষবে।

সকাল বেলায় দু ঘণ্টা লিখবে। তারপর বই-খাতা গুছিয়ে রাখবে। স্কুলের রুটিন দেখে তোমার বই-খাতা, পেনসিল, কলম, ইরেজার, জ্যামিতির বাক্স ইত্যাদি যা যা স্কুলে দরকার সব গুছিয়ে স্যুটকেস বা ব্যাগের মধ্যে সাজিয়ে বন্ধ করে উঠবে। এবার মা বাবা ভাইবোনদের সঙ্গে গল্প করতে চাও করবে, খবরের কাগজ পড়তে চাও, পড়বে। ঠিক সময়ে স্নান করে নেবে। তারপর স্কুলের জামাকাপড় পরে রেডি হয়ে নেবে। স্কুলের বাস যদি থাকে ভাল কথা, যে সময়ে বাস আসবে, তার চেয়ে মিনিট পাঁচেক আগে তৈরি হয়ে বাস যেখানে এসে দাঁড়ায়, সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। সেখানে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করবে। কখনো ছুটোছুটি করে রাস্তা পার হয়ে বাস ধরতে যাবে না।

স্কুলে গিয়ে ক্লাশে হৈ হৈ করবে না। তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়লে দিদিমণি বা মাস্টারমশায়রা যা পড়াবেন বা লেখাবেন, তা তোমাদের মাথায় ঢুকবে না। ঢুকলেও মনে থাকবে না।

ক্লাশে একদম গোলমাল করবে না। ক্লাশঘর হচ্ছে পুজোর ঘর। মাস্টারমশায় বা দিদিমণি হচ্ছেন দেবী সরস্বতীর প্রধান পুরোহিত। লেখাপড়া হচ্ছে সরস্বতী দেবীর পুজোর মন্ত্র। পুজোর সময় কি কেউ কোনো গোলমাল করে? করে না, কক্ষণো করবে না। যেখানটা তুমি বুঝতে পারবে না, সেখানটা খাতায় লিখে রাখবে। ক্লাশে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না, তাতে মাস্টারমশায়দের পড়াতে অসুবিধে। টিফিনের সময় মাস্টারমশায়ের ঘরে গিয়ে তোমার খাতা হাতে নিয়ে বলবে, এই জায়গাটা আমি বুঝতে পারিনি। দেখবে মাস্টারমশায় বা দিদিমণি খুশি হয়ে তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি যা বুঝিয়ে দেবেন, তুমি তা খাতায় লিখে নেবে, তারপর টিফিনে যেখানে বসে খাবার খাও, সেখানে বসে খাবার খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করবে।

রাফখাতা দুটো করবে। একটা টিফিনের আগের ক্লাশের জন্যে, আর একটা টিফিনের পরের ক্লাশের জন্যে। তোমায় মনে রাখতে হবে কোনটা টিফিনের আগের খাতা, আর কোনটা টিফিনের পরের খাতা। টিফিনের পরের ক্লাশগুলোতে যা পড়ানো হবে, মনোযোগ দিয়ে শুনে রাফখাতায় লিখে নেবে। আগে বুঝে নেবে, দিদিমণি বা মাস্টারমশায় কি বলছেন, তারপর সেটা লিখে নেবে। না বুঝে কক্ষণো লিখবে না। না বুঝতে পারলে বুঝে নেবে।

টিফিনে খুব পেট ভরে খাবে না। তাতে ভাল হজম হবে না আর টিফিনের পরের ক্লাশগুলোতে ঘুম পাবে। বেশি খেলে মাথা থেকে বেশির ভাগ রক্ত পাকস্থলী অন্ত্রের কাছে চলে আসে হজম করাবার জন্যে, ফলে মস্তিষ্কের দিকে রক্তাল্পতার সৃষ্টি হয়। সেইজন্যে ঘুম পায়। যে রাতে তুমি দিদি দাদাদের সঙ্গে ঝগড়া করে, কি রাগ করে খাবে না, সে রাতে দেখবে ক্ষিধের জ্বালায় আর ঘুম আসছে না। তখন বেশির ভাগ রক্ত মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, ফলে মস্তিষ্ক সজাগ থাকে এবং ঘুম আসে না।

সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বসবে যে কোনো একটা বিশেষ সময়ে— ধরো সাতটায়। যাদের বাড়িতে টি.ভি. আছে, তাদের টি.ভি. দেখা একটা অভ্যেস হয়ে গেছে। দেখো না টি.ভি! ক্ষতি নেই। ছোটদের অনুষ্ঠান সাতটার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তোমরা যখন টি.ভি-র প্রোগ্রাম দেখবে, খাতা কলম নিয়ে বসবে। কি নিয়ে প্রোগ্রাম হচ্ছে, সেটা লিখবে, তারপর প্রোগ্রাম দেখবে। প্রোগ্রামে অনেক ভাল ভাল জিনিস দেখানো হয়। তা থেকে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে। যদি কোথাও মনে হয় ওঁরা ভুল বলছেন বা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, তক্ষুণি খাতায় সেটা লিখে নেবে।

তোমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেই উঠে পড়বে। তারপর ভাল করে মুখ হাত-পা সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে নেবে। এবার পড়ার ঘরে বসে ধূপ জ্বেলে পড়তে বসবে। সন্ধ্যেবেলায়

পড়ার কাজ করবে। পরের দিন রুটিনে যে সব বিষয়ে পড়া আছে, সেগুলি পড়বে। তাহলে পরের দিন মাস্টারমশায় বা দিদিমণি যখন পড়াবেন, তখন বিষয়টা বুঝতে পারবে। যদি তোমাদের পাড়ায় বেশি লোডশেডিং থাকে, তাহলে রোজ তুমি হ্যারিকেনের আলোয় পড়বে। একবার ইলেকট্রিকের আলো, একবার হ্যারিকেনের আলোয় পড়লে চোখ খারাপ হয়ে যেতে পারে। একই রকম আলোয় পড়া উচিত। সেইজন্যে রোজ সন্ধেবেলায় হ্যারিকেন জ্বেলে বা টেবল ল্যাম্প জ্বেলে সেই আলোতে পড়বে। দেখবে কোনো অসুবিধে হবে না। বিদ্যাসাগরের মতো মানুষও রাস্তার আলোতে পড়াশুনা করেছেন। তবে তুমি যে ঘরে পড়ছ, সেই ঘরের সুইচটা নিবিয়ে রেখে দেবে, কারণ ঝপ করে আলো এসে গেলে চোখে লাগবে আর পড়া থেকে মন সরে যাবে।

সন্ধ্যেবেলায় পড়বে। প্রথম প্রথম জোরে জোরে চেঁচিয়ে পড়বে। চেঁচিয়ে পড়লে দুটো সুবিধে হয়। মনে থাকে বেশি আর তুমি যদি ভুল পড়, দাদা, বাবা, দিদি, মা শুনতে পেলে ঠিক করে দেবেন। রোজ সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত পড়বে। দশটার সময় বইপত্তর গুছিয়ে রেখে খেয়ে দাদা-দিদিদের সঙ্গে গল্প করে শুয়ে পড়বে।

সোমবার সকালে যে বিষয়ে লিখেছিলে বুধবার সকালে বই-খাতা মিলিয়ে দেখবে ঠিক লিখেছ কিনা? যদি ভুল লিখে থাক, অন্য রঙের পেনসিল কি কলম নিয়ে কেটে ঠিক কথাগুলো লিখবে। তারপর আগের দিন স্কুলে যা যা পড়ানো হয়েছে, সেই সেই বিষয় বই-খাতা না দেখে মাস্টারমশায় দিদিমণি যা বলেছেন, তাই মনে করে লিখবে। এমনি ভাবে অভ্যেস করতে করতে দেখবে সব লেখাপড়া তোমার মনে আপনা থেকেই রয়ে যাচ্ছে। তোমাকে মনে রাখার জন্যে একটুও কষ্ট করতে হচ্ছে না।

টি. ভি. দেখে তুমি যদি মনে করে থাক, ওঁরা ভুল বলেছেন, তুমি পরের দিন সকালে টি. ভি.র 'দর্শকের দরবার'-এ চিঠি লিখে দেবে। একটুও লজ্জা করবে না। তোমার নাম ঠিকানা অবশ্যই দেবে। দেখবে ওঁরা তোমার চিঠির ঠিক উত্তর দিয়েছেন। তোমাদের শেখানোর জন্যেই তো ওঁদের অনুষ্ঠান।

আমাদের মস্তিষ্কে যত কোষ আছে, তার মধ্যে কুড়ি লক্ষ (২ মিলিয়ন) কোষ যে কোনো ব্যাপার মনে রাখার ক্ষমতা রাখে। একটা জিনিস যদি খুব গভীরভাবে মনে থাকে, অন্য আর একটা জিনিস ভুলে যেতে হয়। অনেকটা টেপ-রেকর্ডারের মতো। আগের গান মুছে গিয়ে পরের গান রেকর্ড করা হলো। সেইজন্যে পড়াশুনার কথা যদি সব সময়ে মনে রাখ, দেখবে অন্য আর কিছু মনে পড়ছে না, শুধু পড়ার কথাই মনে থাকছে। স্ট্রাইক হোক, ছুটি হোক, বন্ধ হোক, রোজ কিন্তু সকাল সন্ধ্যে পাঁচ ঘণ্টা লেখাপড়া করতে হবে। তাহলেই দেখবে সব পড়া আপনা থেকেই মনে গেঁথে গেছে।

ছবি: দিলীপ দাস

জেনে রাখ

অতীতের অতিকায়রা মরল কিসে?

ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে যে সব অতিকায় প্রাণীরা ঘুরে বেড়াত তারা মরল কি করে এ নিয়ে নানা বৈজ্ঞানিকের নানা মত। চীন দেশের বৈজ্ঞানিকরা এক নতুন কথা বলছেন। খুঁজে পাওয়া ডাইনোসারদের হাড় ইত্যাদি পরীক্ষা করে তাঁরা দেখছেন যে তাতে দশ লক্ষ ভাগের মধ্যে প্রায় একশ থেকে একশ ষাট ভাগের মতো আর্সেনিক বিষ পাওয়া যাচ্ছে। এই পরিমাণটা প্রাণীদের মরার পক্ষে যথেষ্ট। ডাইনোসাররা সাধারণত জলাভূমির আশপাশেই বাস করত। তাদের প্রধান খাদ্যই ছিল জলজ উদ্ভিদ। যাতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি থাকা সম্ভব। সুতরাং সেই অতিকায় প্রাণী-গোষ্ঠীর মধ্যে ডাইনোসারদের মৃত্যুর কারণ আর্সেনিক বিষ হতে পারে।

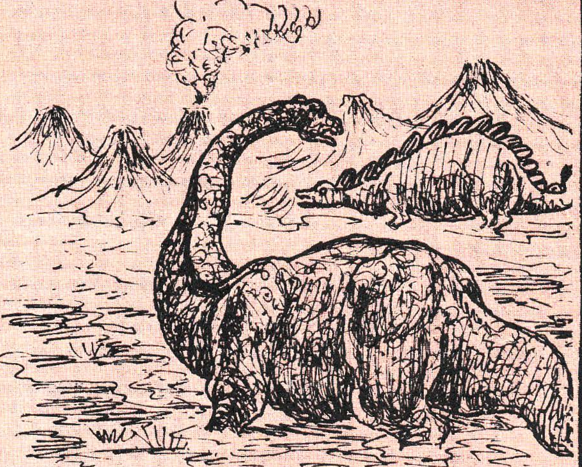

ইংলিশ চ্যানেলের একপারে ডোভার। ডোভারের শ্বেতশুভ্র খাড়াই পাড়টি চক অর্থাৎ এক জাতীয় চুনাপাথরের, যা তৈরি হয়েছে প্রধানত এককোষী প্রাণীদের দেহাবশেষ দিয়ে। আজ থেকে প্রায় দশ কোটি বছর আগে এইসব প্রাণীরা বাস করত সমুদ্রের জলে।

ছবিঃ দিলীপ দাস

গরমাগরম . . .

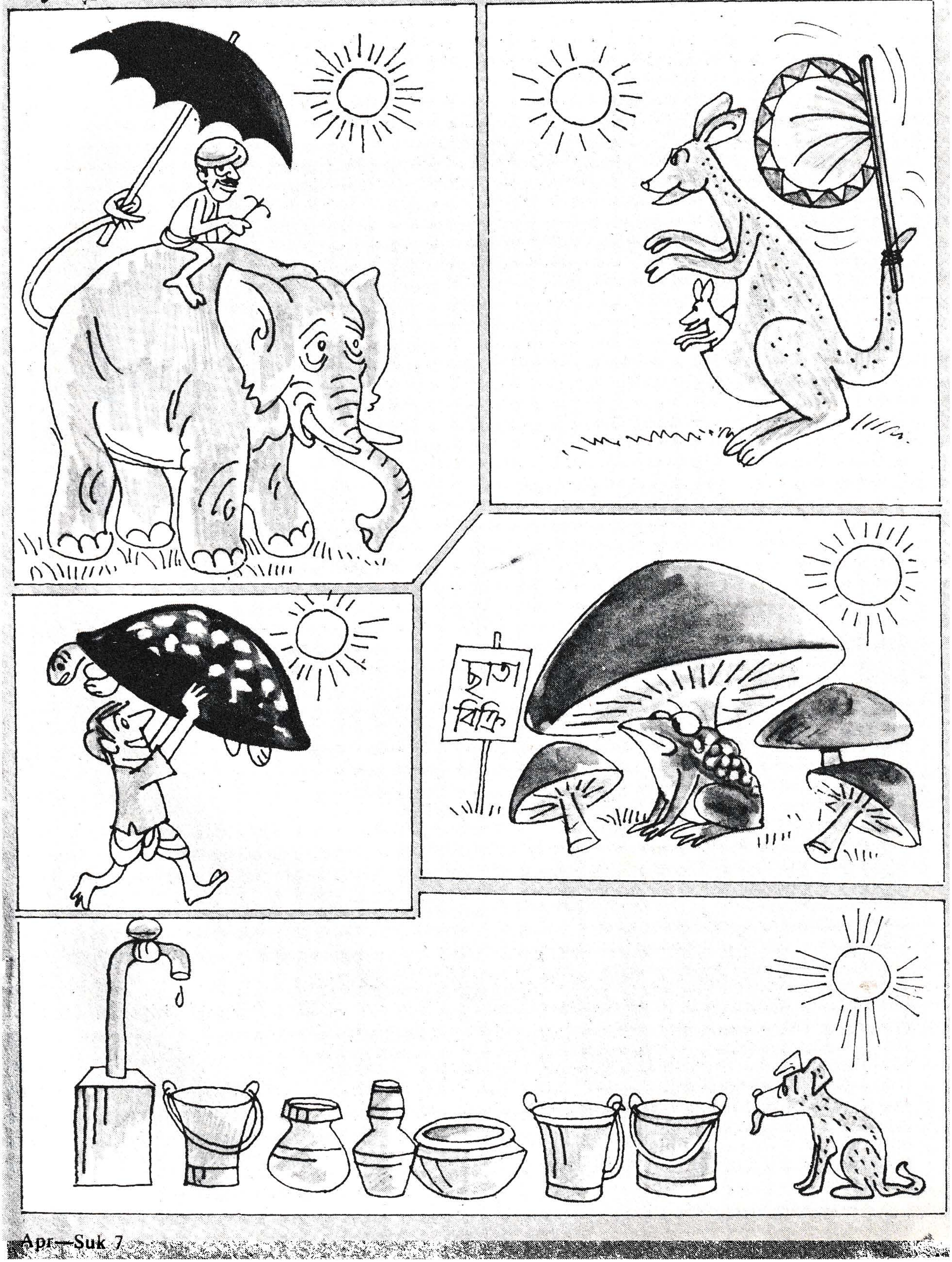

যাদুর দেশে টারজান

সব্যসাচী

হাতি নিয়ে মাঠ পেরুতে পেরুতে মাহুতদের মধ্যে একজন বললো– "আমি এক পলক দেখেছি গুন্ডাটাকে। অত বড় জন্তু দেখা যায় না হামেশা। যেমন মস্ত, তেমনি বিশ্রী। একটা দাঁত সাদা, অন্যটা প্রায় কালো। কিম্ভূতকিমাকার।"

অন্য মাহুত বললো–"বুধ-রাজার আমলে বুনো হাতি ধরতে বেরুতেন বড় বড় যোদ্ধারা আর জমিদারেরা। মাহুতেরা তখন মাহুতগিরিই করত। বন থেকে জানোয়ার ধরে আনার ভার তখন আমাদের উপর ছিল না।"

কে একজন হেইও বলে চেঁচিয়ে উঠল সম্মুখ দিকে।

ম্যাগনোন বুঝিয়ে দিল হেক্টরকে–"গুন্ডা দেখা দিয়েছে।"

সত্যই তাই। মাঠের শেষে দিগন্তবিথারী বাঁশবন। তারই ভিতর থেকে বেরুলো গুন্ডা। ম্যাগনোন শিস দিয়ে উঠল–"হয় যদি বিশ্রী, ক্ষতি কী তাতে? ধরতে গিয়ে মজা পাওয়া যাবে। কিন্তু হেক্টর, সাবধান, জন্তুটার মুখোমুখি যেন পড়ে যেয়ো না কোনোমতেই। যে যাই বলুক, ভাব দেখাবে এমনি যেন নিজের হাতি সামলাতে পারছ না তুমি–আরে দেখ, দেখ, ঠিক আমাদের দিকেই তেড়ে আসছে গুন্ডা। মানুষকে বিন্দুমাত্র ভয় নেই ওর।"

"এখন আমাদের করণীয় কী?"

"এমন কিছু নয়। গোটা কতক পোষা হাতি নিয়ে যেতে হবে ওর কাছে। তারা ওকে দলে ভিড়িয়ে আস্তে আস্তে শহরের দিকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবে। দেখ–দেখ–"

গুন্ডা হাতিটার বিশাল শুঁড় উঁচিয়ে উঠল, একটা গগনভেদী বৃংহণের সঙ্গে। কোনো সন্দেহ নেই, ও আক্রমণ করবে এক্ষুণি। "এগিয়ে যাও! এগিয়ে যাও"–চ্যাঁচাচ্ছে সবাই, কিন্তু নিজে কেউ এগুচ্ছে না। এরা তো কেউ যোদ্ধা বা জমিদার নয়! যত সাহসই দেখাক, বীরত্বের স্বীকৃতি পাবে না রাজার কাছ থেকে। তবে কিসের লোভে জীবন বিপন্ন করা?

গুন্ডা দেখল তার ঠিক সামনেই কয়েকটি হস্তিনী দাঁড়িয়ে আছে সারি বেঁধে। সেই সারি তছনছ করে দিয়ে গুন্ডা চলে এল লাইনের ভিতর দিকে। সেখানে সর্দার মাহুত ছিল নিজের প্রিয় হাতিটি নিয়ে। এইবার হলো একটা প্রচন্ড সংঘাত। সর্দার মাহুত ছিটকে পড়ল তার হাতির কাঁধ থেকে। কিন্তু পড়েই আবার উঠল, আর উঠেই দৌড়লো প্রাণপণে। এইটিই করল মারাত্মক ভুল। যে কোনো হিংস্র জানোয়ারের এইটিই স্বভাব যে কাউকে পালাতে দেখলেই তার পশ্চাদ্ধাবন করবে। গুন্ডাও করল তাই। ছুটল পলাতকের পিছনে। পাহাড়ের মতন দেহ নিয়েও জিঘাংসু হাতিরা কত দ্রুত দৌড়োতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মুহূর্তমধ্যে সর্দার মাহুতের

দেহটা শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে আকাশে ছুঁড়ে দিল গুণ্ডা, আর সেটা মাটিতে পড়া মাত্র পা চাপিয়ে দিল তার উপরে।

কিন্তু আশ্চর্য! এর পরেই গুণ্ডাটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে এল, হস্তিনীরা আবার এসে যখন তাকে ঘিরে ধরল শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে, সে আর তেড়ে গেল না তাদের দিকে। এর পর হস্তিনীর বেষ্টনীটা ধীরে ধীরে এগুতে থাকল খোলা মাঠের পানে, আর সেই বেষ্টনীর মধ্যে শান্তভাবে অবস্থান করে গুণ্ডাও ক্রমশঃ অগ্রসর হতে লাগল নগরতোরণের দিকে।

হেস্টর খুব বাহবা পেয়ে গেল এই ব্যাপারটা থেকে। শেষকালে গুণ্ডার পায়ে শিকল পরানোর দুঃসাহসিক কাজটা সেই সমাধা করেছে, যদিও এমন কাজে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। ম্যাগনোনের উপদেশটি সে মনে রেখেছে, কোনো কারণেই সমুখে যায়নি প্রমত্ত গজরাজের। তার পেটের তলা দিয়ে সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়েছে। আর ফাঁক বুঝে শিকল পরিয়ে দিয়েছে একটা একটা করে চার পায়ে।

এই কৃতিত্বের দরুন ভলপোন একটু সদয় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এখন হেস্টরের দিকে। খেদা থেকে নগরে ফেরার পরে তাকে বলেছে—"ইচ্ছে করলে কয়েদখানার ভিতরে বেড়িয়ে বেড়াতে পার এদিক ওদিক।" বসে বসে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে সে তো অনেক ভাল, ভলপোনের অনুমতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে লাগল হেস্টর। একটা বড় দরোজা আধেক খোলাই ছিল। তার ওপারে বহু লোকের কথা শোনা যায়। কৌতূহলী হয়ে হেস্টর আধখোলা দরোজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল ভিতরে, আর প্রথম মুহূর্তেই যা দেখল সেখানে, তাতে বাধ্য হলো স্থান-কাল-পাত্র ভুলে ভিতরে ঢুকতে।

দেখেছে দু'খানা অতি পরিচিত মুখ। আলবুর্জ-রীকির।

বস্তুতঃ ঐ ভিতরের অংশটাই কারাগারের প্রধান মহল। পাঁচ মিশেলী অপরাধীরা এইখানেই বাস করে। বাইরের অংশটা থাকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীর জন্য সংরক্ষিত। আলবুর্জ-রীকিদের বিশেষ শ্রেণীতে কেন স্থান দিল না ভলপোন, অথচ হেস্টরকে দিল বিনা বাক্যব্যয়ে, তার কারণ নির্ণয় করতে হলে বোধ হয় এই কথাই বলতে হয় যে চারিত্রিক আভিজাত্য মানুষের আকৃতিকে যে-মর্যাদায় মণ্ডিত করতে পারে, তা হেস্টরের ভিতরে ছিল পরিস্ফুট, আলবুর্জ-রীকির ভিতরে ছিল অনুপস্থিত।

দরোজা ঠেলে ভিতরের আঙিনায় প্রবেশ করেছে হেস্টর, আলবুর্জ-রীকি তখনই তাকে দেখে ফেললো, আর প্রথমটা খুব চমকে উঠলেও, তারপরেই বেশ ঠাণ্ডাভাবে, গদাইলস্করী চালে পা ফেলে ফেলে ঘনিয়ে এল তার দিকে। হেস্টর শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করল তাদের—"এমরেল্ডার সঙ্গে যোগাযোগ আছে তোমাদের?"

"মোটেই না"—জবাব দিল আলবুর্জ। "পথ চলতে চলতে সেই যে এদের একদল শিকারীর সমুখে পড়ে গেলাম, তারপরে আর কোনো খবরই পাইনি তার। না তার, না সবুজমণির। মণিটা তার কাছেই থাকত কিনা! যদিও মণিকে দিয়ে কোনো কাজ সে করিয়ে নেয়নি এ যাবৎ। অথচ ঐ মণিই যে আসল সবুজমণি, তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। অতি অবিবেচক, একগুঁয়ে স্বভাবের মেয়ে ঐ এমরেল্ডা, ভাঙবে তবু মচকাবে না। তা সে যা-ই হোক, তোমার সঙ্গে আমাদের যে কোনো ঝগড়া আছে কোনো বিষয় নিয়ে, তা এখানে প্রকাশ না করাই ভাল। যতক্ষণ এই কয়েদখানায় আছি, আমরা সবাই ভাই-ভাই, কী বল?"

হেস্টর কী জবাব দিত এ-প্রস্তাবের, তা কে বলবে? হঠাৎ প্রকাণ্ড কারাগারের সমস্ত মহলে, বহু শত কয়েদী যুগপৎ চঞ্চল, উৎসুক, উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। ভলপোন আর একজন কয়েদী নিয়ে এসেছে। হেস্টরকে এনেছিল খোলা-হাত-পায়ে। একে এনেছে শৃংখলিত করে। তাতেও কী দৃপ্ত ভঙ্গী এ-বন্দীর চলা-ফেরায়। শালপ্রাংশু ব্যূঢ়োরস্ক পুরুষটিকে শত শত মানুষের দঙ্গলে দেখা যাচ্ছে যেন ফেরা-পালে-বেষ্টিত কেশরীর মতো। কে এ? টারজান নয় তো?

মধ্য পশ্চিম আফ্রিকা থেকে তিনটি পথ উত্তর পানে। প্রায় সমান্তরাল এই তিনটি পথই। পরস্পর থেকে খুব দূরেও নয়।

এর একটা দিয়ে স্বপ্নের দেশে পাড়ি দেবার চেষ্টা করছিল আলবুর্জ-রীকি, তাদের বন্দিনী এমরেল্ডাকে নিয়ে। অন্য দুইটির একটা ধরে অগ্রসর হচ্ছিল পল হেস্টর, অন্যটি ধরে টারজান। সেই বন্দিনী এমরেল্ডারই উদ্ধার কামনায়।

তা ঘটনাচক্র এমনভাবে ঘুরল, তিনটি দলই এসে মিলিত হলো উত্তর আফ্রিকার এক গোপনতম প্রায়-অজ্ঞাত শহর, এই গজদন্তপুরীতে। বাসিন্দারা এখানে অসভ্য বা বর্বর নয়। তবে যে-ধরনের সভ্যতা এরা গড়ে তুলেছে এদেশে, তার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের সভ্যতার সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী।

সান্ত্রীনেতা ভলপোন হেস্টরকে কারাগারে এনেছিল শৃংখলমুক্ত করে। কারণ তার আকারে প্রকারে সে লক্ষ্য করেছিল একটা চারিত্রিক আভিজাত্য যা মানুষমাত্রকেই অনির্বচনীয় এক মর্যাদায় মণ্ডিত করার শক্তি রাখে। বলা বাহুল্য, গাত্রচর্মের বর্ণটা সাদা কি বাদামী কি মসীকৃষ্ণ, তার সঙ্গে এই বিশিষ্ট আভিজাত্যের কোনোই সম্পর্ক নেই।

হ্যাঁ, হেস্টরকে এনেছিল ভলপোন, মুক্ত-হাতে-পায়ে, পাশাপাশি হাঁটিয়ে। কিন্তু টারজানের বেলায় সে-সাহস পায়নি ভলপোন। না, না, তার কারণ এটা নয় যে টারজানের ভিতরে সে-সহজাত আভিজাত্যের কোনো অভাব ভলপোন লক্ষ্য করেছিল। কারণটা হলো এক কথায়, 'ভয়'। মরু-সাহারার পিঙ্গল মহাসিংহের মতো দৃপ্ত ভঙ্গিমায় টারজান যখন লাফিয়ে নামল এক মহাবনস্পতির তেতলা থেকে, তখন এই মূর্তিমান ঝঞ্ঝাদেবতাকে শৃঙ্খলবদ্ধ না করা পর্যন্ত ভলপোন নিজেকে বা সঙ্গী শিকারীবর্গকে নিরাপদ বিবেচনা

করতেই পারেনি। সে তাই শৃংখল পরিয়ে দিল বন্দীকে। বন্দীও তাতে আপত্তি করেনি। তার প্রয়োজন তখন, যে-কোনো পরিচয়ে কোনোমতে অদূরবর্তী ঐ গজদন্তের শহরটার ভিতরে ঢোকা। এমরেল্‌ডাকে নিয়ে অপহরণকারীরা ঐখানেই আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে, এরকম একটা সম্ভাব্যতার কথা তার মনের কোণে উঁকি দিয়েছে বই কি!

হেক্টর এগিয়ে এল টারজানকে দেখে, পিছিয়ে গেল আলবুর্জ-রীকি। ঐ দুটো চোর হেক্টরকে বলেছিল, তাদের পারস্পরিক শত্রুতার কথাটা যেন কোনমতেই ফাঁস না হয়, এই কারাগারে থাকার কালে। কিন্তু সে-রকম কোনো অনুরোধ টারজানের কাছে গিয়ে করতে তারা সাহসই পেলো না।

হেক্টরে টারজানে আলোচনা বেশীক্ষণ হতে পেলো না। ভলপোন এসে টারজানকে নিয়ে গেল এক নিভৃত কক্ষে। একটা প্রস্তাব উত্থাপন করল। "আমাদের দেশে মল্লযুদ্ধ জিনিসটাকে আমরা খুব ভালবাসি। মানুষে মানুষে, জন্তুতে মানুষে, জন্তুতে জন্তুতে। যতরকম মল্লযুদ্ধ হতে পারে, সুযোগ হলেই আমরা তার অনুষ্ঠান করি। তা রাজা নার্শ্ব সিংহাসনে বসার সময়েই প্রজাদের আশা দিয়েছিলেন যে যত শীঘ্র সম্ভব তাদের আনন্দদানের একটা ব্যবস্থা তিনি করবেন, মস্ত বড় এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। তা সুযোগ তো এসে গিয়েছে। তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি যে তুমি মহা বীরপুরুষ। তোমার সঙ্গে লড়বার মতো যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীও তুমি পাবে। আমাদের দেশের সেরা পালোয়ান ওডেনকে তুমি দেখনি। সে সব দিক দিয়ে তোমার সঙ্গে লড়বার উপযুক্ত। তাছাড়া, জানোয়ারের সঙ্গে লড়তে যদি তোমার ইচ্ছে হয় একটা পাহাড় সমান গুণ্ডা হাতি আজই ধরা পড়েছে—"

টারজান আর শুনতে চাইল না—"আমি ওডেনের সঙ্গেও লড়ব, গুণ্ডা হাতির সঙ্গেও লড়ব। তবে জানতে চাই, লড়াইয়ে জেতার পরে আমি কী পুরস্কার পাব?"

হেসে ভলপোন বললো—"যা চাইবে, তাই পাবে। শুধু রাজার রাজ্যটি ছাড়া।"

"এক বিদেশিনী বালিকাকে চুরি করে এনেছিল দুই শ্বেতাঙ্গ চোর। চোর এবং চোরাই বালিকা, সবাই আছে এখানে বন্দী হয়ে। চোর দু'টোর সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। প্রথম লড়াই যেটা জিতব আমি, তারই পুরস্কার হিসাবে সেই বালিকার, এই হেক্টরের, এবং আমার নিজের মুক্তি আমি চাই।"

"তা অবশ্যই।" জবাব দিল ভলপোন—"কিন্তু মুক্তিলাভের পরে তুমি দ্বিতীয় লড়াইটা লড়তে অস্বীকার করবে না তো আবার? তাহলে সব আনন্দ মাটি হবে, ক্ষেপে উঠবে জনতা—"

"না, দ্বিতীয়, তৃতীয়, দশম, পঞ্চাশৎ, শততম লড়াইতেও আমার অনিচ্ছা দেখতে পাবে না। আমার বরং সন্দেহ আছে যে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বী জোটাতে পারবে কিনা—"

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। ভলপোন রাজার কাছে খবর দিতে গেল। জানিয়ে গেল যে সারা রাত্রি তার এক মুহূর্ত বিশ্রাম মিলবে না। সারা রাত্রিই মল্ল-প্রতিযোগিতার তোড়জোড় চলবে। ক্রীতদাসেরাই করবে সব মেহনতের কাজ, কিন্তু তদ্বির-তদারকের ভার তো ভলপোনেরই উপর!

ভলপোনের সৌজন্যে টারজান আর হেক্টর একই স্থানে রাত্রি যাপনের অনুমতি পেয়েছে আজ, হাতির মাংসের শুরুয়া, হাতির মাংসের কাবাব এবং হাতির মাংসেরই অন্য পাঁচ রকম নাম-না-জানা খাদ্য দিয়ে উদর পূর্তি করে নিয়ে—

হ্যাঁ, উদরটা পূর্ণ করতে হলো বই কি। রাত ভোর হলেই জীবনমরণ সংশয়; দু' দুটো মারাত্মক লড়াই লড়তে হবে যাকে, সে কখনো উপোস দিতে পারে? কিন্তু খেয়ে তিলমাত্র তৃপ্তি পেলো না ওরা। না হেক্টর, না টারজান। টারজান কাঁচা মাংসও পরিতোষ করে খায়। কিন্তু এই বুড়ো হাতীর মাংস কি চিবানো যায়? টারজান যে টারজান, তারও দাঁত যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে চায় সেই লৌহদণ্ডের মতো শক্ত মাংস-খণ্ডগুলোকে চিবোতে গিয়ে।

যাই হোক, খাওয়ার পর্ব শেষ করে হেক্টরের সঙ্গে এমরেল্‌ডার প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক আলোচনা হলো টারজানের। ধরা যাক, কাল মল্ল-ক্রীড়ার পরে মুক্তি পেলো ওরা সবাই, তারপরে কী হবে? এমরেল্‌ডার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে অনেক। সে-সব জেনে শুনেও হেক্টর তাকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাইছে। নিয়ে যাওয়ার পরেও সে কি মেয়েটাকে নিজের কাছে রাখতে পারবে?

"অবশ্যই পারব"—দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল হেক্টর—"আমি ওকে ধর্মপত্নী রূপেই গ্রহণ করব। ওর দেহে নিগ্রো-রক্ত আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। থাকেও যদি, আমি গ্রাহ্য করি না সেটা।"

পরদিন ভোরে—

পূর্বাকাশে ঊষার আলো ফুটবার আগেই সারা শহরের লোক শহর ছেড়ে মাঠে গিয়ে জমায়েত হয়েছে। বিশাল মাঠখানাতে আর যেন তিলধারণের স্থান নেই। তবে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা বৃহৎ বৃত্তাকার ভূখণ্ড ফাঁকা রাখা হয়েছে। ঐটিই হবে রঙ্গভূমি। ওর একদিকে বড় দরোজা একটা, তা দিয়ে হাতিও ঢোকানো যাবে প্রয়োজনে। আর অন্যদিকে? সেদিকেও দরোজা একটা আছে বটে, তবে তা অনেক ছোট। বড় দরোজা ওখানে রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ ওটা দিয়ে ভিতরে কেউ ঢুকবে না, শুধুমাত্র বহির্গমনের জন্যই ব্যবহার হবে। আর সে-বহির্গমনও কোনো জ্যান্ত প্রাণীর নয়, মৃতের। মল্ল-ক্রীড়ায় অংশ যারা নিতে যাচ্ছে, তারা মরবে তো বেশীর ভাগই। দাসেরা তাদের দেহগুলো অপসারিত করবে ঐ ছোট্ট দরোজা দিয়ে। বাইরে তৈরী আছে হস্তীবাহন। দশ বিশটা দেহ জমলে তারা পিঠে করে নিয়ে যাবে দূর অরণ্যে। সেখানে আগুন জ্বলছেই,

দেহগুলোর সৎকার হতে বেশী সময় লাগবে না।

বৃত্তাকার ফাঁকা জায়গাটার চারদিকে গোল করে সাজানো হয়েছে জমকালো সব আসন। টানা লাইনে নয়। খুপরিতে খুপরিতে। একটাই মোটে আসন একটা খুপরিতে। সব চেয়ে বর্ণাঢ্য পাশাপাশি দু'টো খুপরিতে রাজার আর রাণীর সিংহাসন। সাতসকালেই রাজা আর রাণী তাতে এসে অধিষ্ঠান করেছেন। ম্যাগনোর্ন বললো হেক্টরকে–"সকাল-সকাল না এসে করে কী? নগরবাসীদের সামনে দিয়ে ওদের রাস্তায় চলাচলের সাহস আছে নাকি? ওদের যা চরিত্র, রাস্তার ধারের প্রতি বাড়ি থেকে ঢিল এসে পড়বে ওদের মাথায়।"

খুপরিগুলো বানানো হয়েছে একটা মাচার উপরে, সে মাচা এত উঁচু যে বড় বড় হাতিও শুঁড় উঁচিয়ে তার নাগাল পাবে না। রাজা-রাণী এবং আমন্ত্রিত জমিদারদের শারীরিক নিরাপত্তার জন্যই এই সতর্কতা। আগে আগে এমন ঘটনা নাকি ঘটেছে যে হাতী তার শুঁড় দিয়ে টেনে নামিয়েছে দর্শকদের, বা সিংহ লাফিয়ে উঠে গিয়েছে তাদের আসনে।

রাজার খুপরির নীচে জয়ঢাক নিয়ে বসে আছে একদল বাদক। উৎসবের শুরু, মধ্যবর্তী বিরতি এবং চূড়ান্ত বিরতি সেই ঘোষণা করবে ঢাক বাজিয়ে। বাজাবার আদেশ অবশ্য রাজাই দেবেন। তাঁর হাতের কাছেই এক মন্ত্রী আছেন রাজাদেশ বাদককে জানাবার জন্য।

[চলবে]

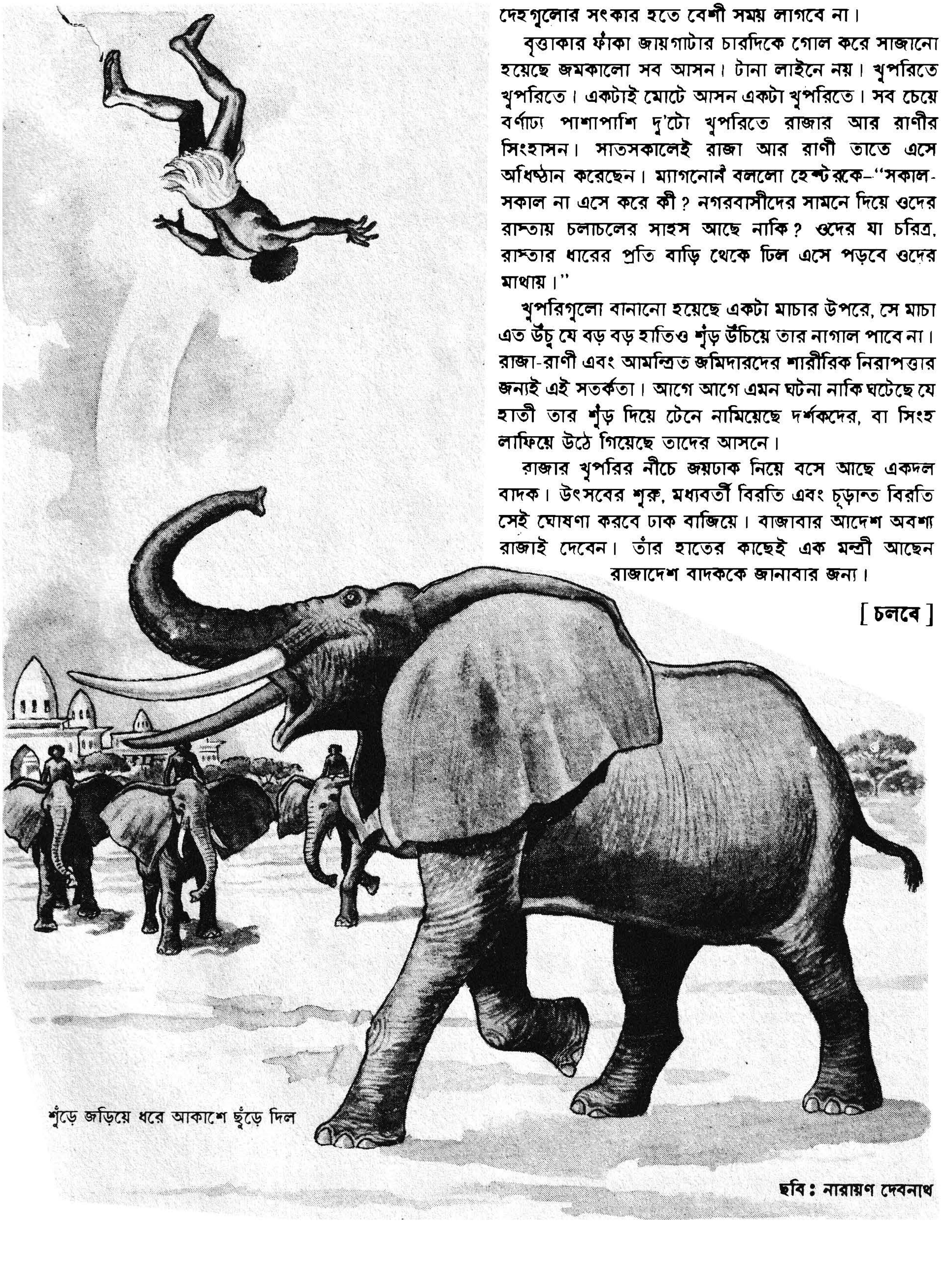

শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে আকাশে ছুঁড়ে দিল

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

CLARION/NC/8572

জিতলেন ইমরানই

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ইমরান খান যা চেয়েছিলেন তাই হলো শেষ পর্যন্ত। ইমরান বলেছিলেন, আমি ভারতে এসে ভারতের মাটিতে জিততে চাই। তাই জিতলেন তিনি। মাত্র ১৬ রানের জন্যে পারলো না ভারত পাকিস্তানকে হারাতে। ১৯৫২ সালে ভারতে প্রথম খেলতে এসে আব্দুল হাফিজ কারদারের দল দিল্লির প্রথম টেস্টে হেরে যাবার পর লক্ষ্ণৌয়ের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতকে হারিয়ে দিয়েছিলো। সেই খেলায় পাকিস্তান জিতেছিল এক ইনিংস ও ৪৩ রানে। আর এতোদিন পরে এবার আবার জিতলো পাকিস্তান। জিতলো অত্যন্ত কম ব্যবধানে। ভারতের মাঠে ভারতকে পাকিস্তান দ্বিতীয়বার হারালো মাত্র ১৬ রানে। মাদ্রাজ, কলকাতা, জয়পুর, আমেদাবাদের অমীমাংসার খেলার পর মীমাংসা হলো বাংগালোরে।

বাংগালারের পিচ ছিলো জঘন্য। খেলা আরম্ভ হবার আগে থেকেই পাকিস্তানের অধিনায়ক ইমরান খান পিচ নিয়ে কড়া কড়া কথা বলেছিলেন। মাত্র ১১৬ রানে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যাবার পর ইমরান বলেছিলেন–এইরকম পিচ বানিয়ে ক্রিকেটকে হত্যা করা হচ্ছে। তারপর ভারত যখন ১৪৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলো আর পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে আড়াইশো মতো রান তুলে নিল তখন কিন্তু চুপ করে গেলেন ইমরান। তারপর ভারতকে হারাবার পর বললেন, পিচ তেমন কিছু ভয়ংকর রকম খারাপ ছিল না।

সত্যিই কিন্তু পিচ ছিল জঘন্য রকম খারাপ। পিচে পড়ে কোন বলটা লাফাবে, কোন বলটা নিচু হয়ে যাবে তা বোঝা ছিল শিবেরও অসাধ্য। আর বল ঘুরেওছে বনবন করে। ঐ পিচে ভারতের সুনীল গাভাসকার দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেললেন। দলের পুরো দায়িত্ব তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। মাত্র ৪ রানের জন্যে তিনি পারলেন না সেঞ্চুরি করতে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে লড়ার মতো খেলোয়াড় তিনি একজনও পাননি। পেলে পাকিস্তান নয় ভারতই বাংগালোর জিততো। তবে সুনীল গাভাসকার ৯৬ রান করে আউট হয়ে যাবার পর সকলে ধরে নিয়েছিলেন ভারত আর পারবে না। কপিলদেব আর রবি শাস্ত্রী যদি গাভাসকারের পাশে আর একটু দাঁড়াতে পারতেন তাহলেই ভারত জিততো। ভারতের হেরে যাবার জন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী ব্যাটসম্যানরা। যে দলের ব্যাটিং শক্তি বলা হয় বিশ্বের সেরা–সেই দলের একজনও এসে দাঁড়াতে পারলেন না সুনীল গাভাসকারের পাশে। পাকিস্তানের

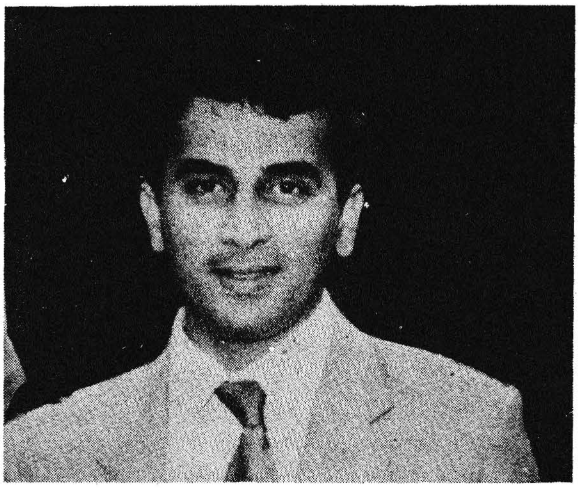

অধিনায়ক ইমরান এবং নিচের সারির ব্যাটসম্যানরা যে দায়িত্ব পালন করেছেন ভারতীয়রা তা পারলে বাংগালোর টেস্টে ভারতের জয় ছিল অবধারিত। তাই বলতে বাধা নেই যে ভারত জিততে পারলো না নিজেদেরই দোষে।

সকলে বলছেন, বাংগালোরেই সুনীল গাভাসকার তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচটি খেললেন। সুনীল নিজে অবশ্য সে কথা বলেননি। বরং বলেছেন, বিশ্বকাপ ক্রিকেটের শেষ বলটি হয়ে যাবার পর তিনি তাঁর অবসর নেবার কথা বলবেন। এখন ওসব নিয়ে কিছু চিন্তা করছেন না। তাঁর ইচ্ছে, একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে একটি সেঞ্চুরি করা। টেস্ট ক্রিকেটে ৩৪টি সেঞ্চুরি করলেও একদিনের ক্রিকেটে সুনীল এখনও তা পারেননি। তাঁর সেই ইচ্ছে অপূর্ণ রয়ে গেছে।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আগে ভারত আর টেস্ট খেলছে না। বিশ্বকাপের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতে রয়ে যাবে। ভারতের সংগে পুরো মরশুম খেলবে তারা। গাভাসকার হয়তো তখন আর খেলবেন না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলতে শুরু করার আগেই তিনিও সরে যাবেন ক্রিকেট মাঠ থেকে। বাংগালোরে যদি সুনীল সত্যিই শেষ টেস্ট খেলে থাকেন তাহলে আমাদের আপসোস হবারই কথা। সুনীল যে কতো বড় খেলোয়াড় এবং এখনও তিনি যে কতো দক্ষ তার প্রমাণ তিনি বাংগালোরের ঐ জঘন্য পিচে ৯৬ রান করে দিয়েছেন। দুর্ভাগ্য মাত্র ৪ রানের জন্যে তিনি সেঞ্চুরি পেলেন না। যদি তিনি সত্যিই শেষ টেস্ট খেলে থাকেন তাহলে সেঞ্চুরি আর ভারতের জয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবন শেষ হলেই ভালো হতো।

সুনীল মনোহর গাভাসকার টেস্ট খেলতে শুরু করেছিলেন ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে। তারপর ১৬ বছর কেটে গেছে। এই ষোল বছরে তিনি বিশ্ব বিজয় করেছেন। ভেঙেছেন অজস্র রেকর্ড। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে দশ হাজারের ওপর রান করেছেন। করেছেন সব থেকে বেশি সেঞ্চুরি আর হাফ সেঞ্চুরি। খেলেছেনও সব থেকে বেশি টেস্ট। সুনীল বাংগালোরে খেললেন তাঁর ১২৫তম টেস্ট। ঐটিই যে তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট একথা ভাবতেও

ইচ্ছে করছে না। কারণ গাভাসকার এখন তাঁর ফর্মের তুংগে আছেন। তাঁর যে এখনও কয়েক বছর খেলার তাকত আছে তা বোধহয় না বললেও চলে। কিন্তু বাংগালোরে টস করতে যাওয়াই আমাদের চিন্তাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। একজন বড় খেলোয়াড় যখন অবসর নেবার সিদ্ধান্ত নেন তখন তাঁকে বিশেষভাবে সম্মান দেখাবার জন্যে দলনেতা টস করতে পাঠান। গাভাসকারও তাই গিয়েছিলেন। তবে কি সত্যিই গাভাসকার অবসর নিচ্ছেন। তবে টস করে এসেই গাভাসকার বলেছিলেন, এই নিয়ে যেন কিছু ভেবে বসবেন না। কপিল আমায় টস করতে পাঠিয়েছিল যদি আমি টসে জিতে ভাগ্য বদলাতে পারি। তা অবশ্য পারেননি গাভাসকার। তিনিও হেরেছিলেন টসে। আর বাংগালোরের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট ম্যাচটি জিতে পাকিস্তান জিতে গেলো রাবার।

এই লেখা ছাপা হবার আগেই শারজায় চার দেশের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়ে যাবে। ভারত, পাকিস্তান, ইংলন্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে কোন দেশ জেতে সেইটাই বিশেষ ভাবে দেখার দরকার। আসলে বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দিন এগিয়ে আসছে তো–তাই একদিনের প্রত্যেকটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার গুরুত্ব এখন যথেষ্ট।

এই সংখ্যা তোমাদের হাতে পৌছুবার আগেই শেষ হয়ে যাবে কলকাতার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। বাংলা গত কয়েকবছর চ্যাম্পিয়ান হতে পারছে না। এবার নিজেদের মাঠে সন্তোষ ট্রফি জেতার জন্যে বাংলা অনেকদিন আগে থেকেই তৈরি হয়েছে। চ্যাম্পিয়ান হয়ে তারা সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলতে পারে কিনা দেখা যাক।

সন্তোষ ট্রফির পর এখন চলছে এয়ারলাইনস গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। ভারতের সেরা ক্লাবগুলি এই প্রতিযোগিতায় খেলছে। এই প্রতিযোগিতা শেষ হবার পরই শুরু হয়ে যাবে ফেডারেশন কাপের খেলা। এবার ওড়িশায় হবে ফেডারেশন কাপের খেলা। আর তারপরই কলকাতার ফুটবল লীগের খেলা। সব থেকে জমজমাট লড়াই। তবে লীগের লড়াইয়ে তিন প্রধান নেই। গত বছর অনেকগুলো ম্যাচ না খেলায় মহামেডান স্পোর্টিং নেমে গেছে খ বিভাগে। ক বিভাগে আছে মোহনবাগান আর ইস্টবেংগল। তাই এ বছর বড় খেলা শুধু ক বিভাগেই নয় খ বিভাগেও হবে। লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যে লড়বে মোহনবাগান আর ইস্টবেংগল। আর মহামেডানকে খেলতে হবে ক বিভাগে ওঠার জন্যে।

ক্রিকেটের লর্ড ক্লাইভ

বাইশ

ল্যান্স গিবস জানতেন, তাঁর গড়া বিশ্ব রেকর্ড বেশি দিন টিকে থাকবে না। আজকাল এতো বেশি টেস্ট খেলা হচ্ছে আর যেভাবে উইলিস, লিলি, বথামরা এগোচ্ছেন তাতে তিনশ উইকেট দখল করাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। তবে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে, আলাদা উত্তেজনা আছে। গিবস তাতেই খুশি। ইংলন্ডের ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যানের নজির তিনি ভেঙেছেন–সেইটেই বড় কথা।

ঐ রেকর্ড গড়ার জন্যেই এতদিন তাঁর টেস্ট খেলা। না হলে কবে তিনি সরে যেতেন মাঠ থেকে। তাঁর জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে তরুণ কোনো খেলোয়াড়কে। কিন্তু সেই রকম স্পিনার তো আর ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে তৈরি হচ্ছে না। সবাই জোরে বল করতে চায়। যতো জোরে পারে বল করবে, যতো জোরে পারে ব্যাট হাঁকাবে–ফলে তেমন স্পিনার তৈরি হয় না।

গিবসের সান্ত্বনা তাঁর ছোট ভাইয়ের ওপরেই এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভার, সে দিব্যি খেলছে। তার নেতৃত্বে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট আবার পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছে। ফ্রাংক ওরেল যখন অধিনায়ক ছিলেন তখন ছিলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বর্ণযুগ। গ্যারি সোবার্সের হাতে পড়ে সেই দল ধীরে ধীরে শোচনীয় অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিলো। গ্যারি মস্ত বড় খেলোয়াড়। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে তিনি দিয়েছেন সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয়। রোহান কানহাই দলনেতা হয়ে চেষ্টা করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টেনে তুলতে। খানিকটা সফল হয়েও ছিলেন। ক্লাইভ লয়েড এসে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আবার টেনে তুললেন সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায়। ক্লাইভের নেতৃত্বেই একদিনের ক্রিকেটে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এই রকমই একটা অবস্থায় বিষেণ সিং বেদীর নেতৃত্বে ভারত এলো ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে খেলতে। সুনীল গাভাসকার এর আগেরবার ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলতে এসে চমকে দিয়েছিলেন সমস্ত ক্রিকেট বিশ্বকে। সেই গাভাসকার আছেন দলে। আছেন গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, মহিন্দর অমরনাথের মতো খেলোয়াড়রা।

কিন্তু বার্বাডোজের প্রথম টেস্টে ভারত দাঁড়াতেই পারলো না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অতি সহজে জিতে গেল এক ইনিংস ও ৯৭ রানে। এই পরাজয়ের পরই রুখে দাঁড়ালো ভারত। লয়েডের ক্যারিবিয়ান দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ভারত তখন প্রস্তুত। কুইনস পার্কেই ভারত বদলা নিল। অথচ প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ভারত ১৩১ রানে পিছিয়ে পড়েছিল। চারশর ওপর

(এরপর ২২১ পাতায়)

গাভাসকার গাভাসকার

যে ছেলে একদিন মার সঙ্গে খেলতে গিয়ে জোরে বল মেরে মার দাঁত ভেঙে দিয়েছিলো, মামা মাধব মন্ত্রীর কাছে কাউন্টি ক্যাপ চেয়ে শুনেছিলো—ঐ টুপি অনেক সাধনা আর পরিশ্রম করে পেতে হয়-যাকে একদিন বাবা বলেছিলেন, প্রত্যেকটি সেঞ্চুরির জন্যে দশ টাকা করে পুরস্কার দেবেন-আর তাই দিতে গিয়ে প্রত্যেক মাসে তাদের বাড়ির বাজেটে টান পড়তো —সেই সুনীল মনোহর গাভাসকার বিশ্বের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এবার টেস্ট ক্রিকেটে দশ হাজার রান পূর্ণ করলেন। এ যে কতো বড় কৃতিত্ব তা তো আমরা সকলেই জানি। টেস্ট ক্রিকেটের বয়েস একশ দশ বছর হয়ে গেলো। স্যার ডন ব্রাডম্যান, স্যার গ্যারি সোবার্স, জিওফ বয়কট, ওয়ালি হ্যামণ্ডের মতো কতো নামকরা খেলোয়াড় বিশ্ব ক্রিকেটকে মাতিয়ে দিয়ে গেছেন, সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি করেছেন, শত শত রান তুলেছেন—কিন্তু কেউই দশ হাজারে পৌঁছুতে পারেননি! ৮১১৪ রানে পৌঁছে থেমে গিয়েছিলেন জিওফ বয়কট। ১৯৮৩-৮৪ সালে আমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে বয়কটকে ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন সুনীল। এবার সেই আমেদাবাদেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে পৌঁছে গেলেন দশ হাজার রানের কোঠায়।

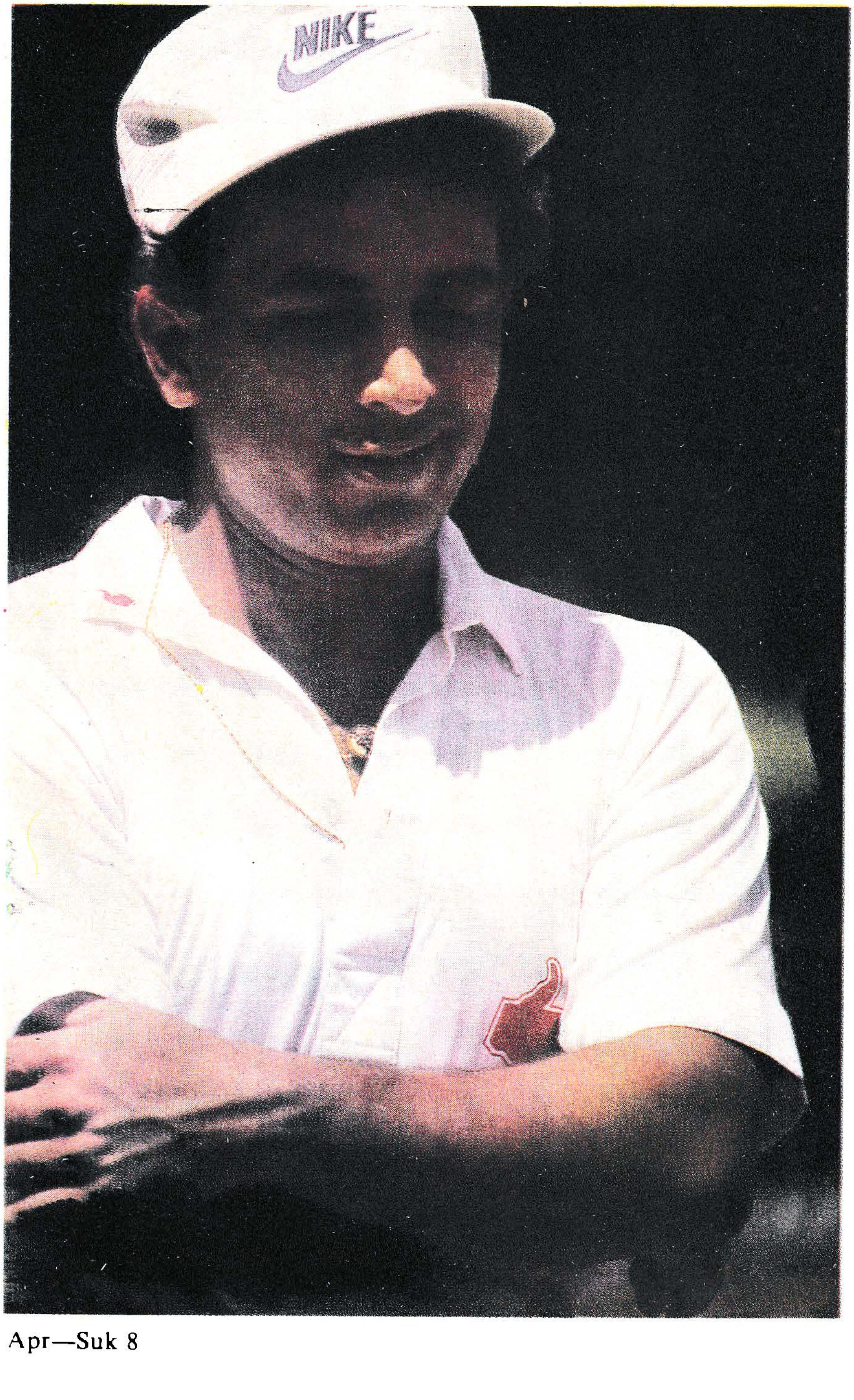

দশ হাজার ,রান করার পর প্যাভিলিয়নে ফিরে এসে সুনীল বলেছিলেন, কী যে ভালো লাগছে তা বলে বোঝাতে পারবো না। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। দশ হাজার রান পূর্ণ হতেই নিজেকে নিজে বলেছিলাম—তা'হলে তুমি পারলে সুনীল!

একটু থেমে সুনীল আবার বললেন, বর্ডার, রিচার্ডস—ওরাও হয়তো একদিন দশ হাজার রান করবে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে দশ হাজার রানের কথা উঠলে আমার নাম করতেই হবে। তেনজিং, হিলারী সবার আগে এভারেস্টে

উঠেছিলেন। তারপর আরও কতো অভিযাত্রী সফল হয়েছেন এভারেস্ট অভিযানে। কিন্তু এভারেস্টের কথা উঠলে সবার আগে তেনজিং-হিলারীর নামই সকলের মনে আসে। দশ হাজার রানের ব্যাপারেও তাই। ও কথা উঠলেই আমার মানে সুনীল গাভাসকারের নাম উঠবেই। সেই কথা মনে করে আরও ভালো লাগছে।

আমেদাবাদে সুনীল গাভাসকার খেললেন তাঁর ১২৪তম টেস্ট। এই টেস্টের তৃতীয় দিন–শনিবার, ৭ মার্চ চা পানের বিরতির একটু পরেই ইজাজ ফাকির একটি বল কাট করে দুটি রান নিয়েই গাভাসকার পৌঁছে গেলেন লক্ষ্যে। টেস্ট ক্রিকেটে পূর্ণ হলো তাঁর দশ হাজার রান।

সুনীল গাভাসকার টেস্ট খেলা শুরু করেছিলেন পোর্ট অফ স্পেনে ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ। আর ১৯৮৭ সালের ৭ মার্চ পূর্ণ করলেন টেস্ট ক্রিকেটে দশ হাজার রান। এই ১৬ বছরে গাভাসকার খেলেছেন ১২৪টি টেস্ট। একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক এই ১২৪টি টেস্টে গাভাসকার কি করেছেন না করেছেন তার ওপর–

টেস্ট – ইনিংস – অপরাজিত – মোট রান – সর্বোচ্চ – গড়
১২৪ – ২১২ – ১৬ – ১০০০৫ – ২৩৬* – ৫১.০৪

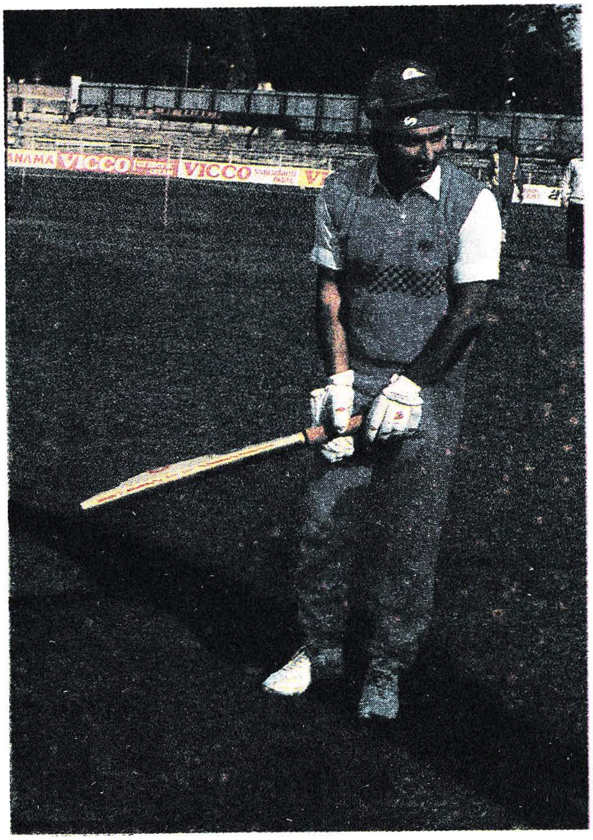

সুনীল গাভাসকার

শতরান – অর্ধশতরান – শূন্য – ক্যাচ লুফেছেন – বল করেছেন
৩৪ – ৪৪ – ১২ – ১০৭ টি – ৩৫৬ টি –
মেডেন – রান – উইকেট–
১৪ – ১১১ – ১ – *অপরাজিত

বোলারের ভূমিকায় সুনীল গাভাসকার

দশ হাজার রানের পথে

রান	টেস্ট	ইনিংস	কোথায়	কার বিরুদ্ধে	সাল
১০০০	১১	২১	কানপুর	ইংলন্ড	১৯৭২-৭৩
২০০০	২৩	৪৪	পোর্ট অফ স্পেন	ওঃ ইন্ডিজ	১৯৭৫-৭৬
৩০০০	৩৪	৬৬	পার্থ	অস্ট্রেলিয়া	১৯৭৭-৭৮
৪০০০	৪৩	৮১	কলকাতা	ওঃ ইন্ডিজ	১৯৭৮-৭৯
৫০০০	৫২	৯৫	বাংগালোর	অস্ট্রেলিয়া	১৯৭৯-৮০
৬০০০	৬৫	১১৭	এডিলেড	অস্ট্রেলিয়া	১৯৮০-৮১
৭০০০	৮০	১৪০	লাহোর	পাকিস্তান	১৯৮২-৮৩
৮০০০	৯৫	১৬৬	দিল্লি	ওঃ ইন্ডিজ	১৯৮৩-৮৪
৯০০০	১১০	১৯২	এডিলেড	অস্ট্রেলিয়া	১৯৮৫-৮৬
১০০০০	১২৪	২১২	আমেদাবাদ	পাকিস্তান	১৯৮৭

পিচ দেখতে যাচ্ছেন কপিলদেব ও ইমরান খান

কোন দেশের বিরুদ্ধে কতো রান

		টেস্ট	রান	গড়	মোট
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে	ওদের দেশে	১৩	১৪০৪	৭০.২০	২৭৪৯
	ভারতে	১৪	১৩৪৫	৬১.১৩	
ইংলন্ডের বিরুদ্ধে	ওদের দেশে	১৬	১১৫২	৪১.১৪	২৪৮৩
	ভারতে	২২	১৩৩১	৩৫.৯৫	
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে	ওদের দেশে	১১	১০০১	৫৮.৮৮	১৯৭২
	ভারতে	১২	৯৭১	৫৩.৯৪	
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে	ওদের দেশে	১১	৯২০	৫১.১১	১৫৫০
	ভারতে	৯	৬৩০	৫২.৫০	
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে	ওদের দেশে	৬	৩৯২	৪৩.৫৫	৬৫১
	ভারতে	৩	২৫৯	৪৩.১৬	
শ্রীলংকার বিরুদ্ধে	ওদের দেশে	৩	১৮৬	৩৭.২০	৬০০
	ভারতে	৪	৪১৪	১০৩.৫০	

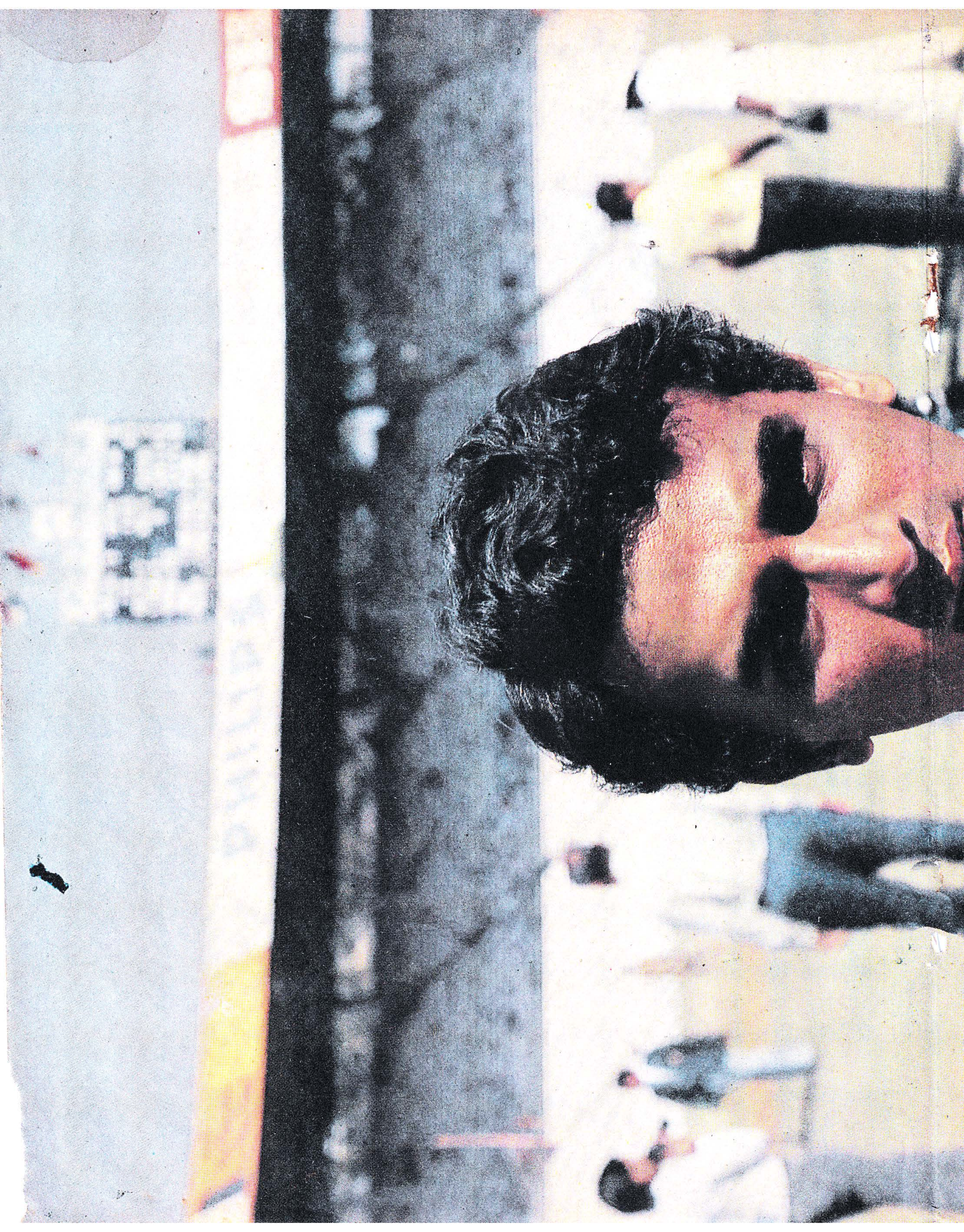

গাভাসকারের বিশ্বরেকর্ড

সর্বাধিক রান	১০০০৫
সর্বাধিক টেস্ট	১২৫
সর্বাধিক ইনিংস	২১২
সর্বাধিক সেঞ্চুরি	৩৪
সর্বাধিক হাফসেঞ্চুরি	৪৫
সর্বাধিক শতরানের জুটি	৫৭
এক টেস্টে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি	৩
এক ক্যালেন্ডার বছরে হাজার রান	৪ বার
টানা টেস্ট খেলা	১০৬টি
প্রথম টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক রান	৭৭৪ (৪টি টেস্টে)

সুনীল গাভাসকার যে ৩৪টি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন সেই খেলাগুলির মধ্যে ভারত ৬টি টেস্টে জিতেছে, হেরেছে ৫টি টেস্টে, বাকি খেলাগুলি শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে।

গাভাসকারের সেঞ্চুরি

	সেঞ্চুরি	স্বদেশে	বিদেশে	টেস্ট
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৩	৬	৭	২৭
অস্ট্রেলিয়া	৮	৩	৫	২০
পাকিস্তান	৫	২	৩	২৩
ইংলন্ড	৪	২	২	৩৮
নিউজিল্যান্ড	২	১	১	৯
শ্রীলংকা	২	২	০	৭
	৩৪	১৬	১৮	১২৪*

তিন বোলার—মনিন্দর সিং, কপিলদেব ও চেতন শর্মা

গল্প হলেও সত্যি

সেদিন হাসপাতালে দারুণ গোলমাল। বাচ্চা বদলে গেছে। কেউ কিছু বুঝতে পারেননি। বাচ্চার মাও না। তিনি যে বাচ্চাটিকে নিয়ে বসে আছেন সেটি যে তাঁর নয় অন্য কারো তা খেয়ালও করেননি। কিন্তু বাচ্চাটিকে দেখে চমকে উঠলেন তাঁর দূর সম্পর্কের এক দেওর। এ কী ! এ কী করে হয়–কালই তিনি দেখে গেছেন সদ্যোজাত বাচ্চার কানের লতি কাটা। আর আজ এসে দেখছেন কাটা-টাটা কিচ্ছু নেই। কথাটা তিনি তাঁর দাদাকে বললেন। তারপরই সমস্ত হাসপাতাল জুড়ে হৈ চৈ। মা কাঁদছেন। অন্য সকলে ছুটোছুটি করছেন। সে এক বিশ্রী অবস্থা। সারা হাসপাতালে খোঁজ খোঁজ রব।

নার্সরা ছুটোছুটি করছেন। ডাক্তাররা এগিয়ে এসেছেন সাহায্য করতে। আয়ারা হন্যে হয়ে ঘুরছেন–কোথায় সেই কানের লতি কাটা ছেলে। কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে সময় কেটে যাচ্ছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষপর্যন্ত পাওয়া গেলো সেই কানের লতি কাটা ছেলে। এক জেলে বউয়ের পাশে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ছে। জেলে বউও তার পাশে খুশি খুশি মুখ করে বসে আছে।

খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা হাসপাতালে। পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে–কানের লতি কাটা ছেলে পাওয়া গেছে। ছুটে এলেন ছেলের বাবা, কাকা। বাচ্চাটিকে দেখেই চিনতে পারলেন সকলে। ঐ তো, ঐ তো আমাদের ছেলে। কাকাই এগিয়ে গেলেন–হ্যাঁ–এই তো সেই, কানের লতিতে একটু কাটা। নিয়ে আসা হলো হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে। জেলে বৌয়ের কাছে দিয়ে আসা হলো তার ছেলে। সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেই হলো আজকের সুনীল মনোহর গাভাসকার। সুনীল সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ভাগ্যিস নানকাকা হাসপাতালে এসেছিলেন। তা না হলে কী হতো একবার ভাবুন। ক্রিকেট মাঠে ব্যাট হাতে নিয়ে না ঘুরে আমায় হয়তো সমুদ্রে মাছ ধরে কাটাতে হতো....।

শুকতারার জন্যে এই ছবিটি তুলিয়েছেন আজহারউদ্দিন

তোমাদের ? জিজ্ঞাসা

বাণী চ্যাটার্জি (উদয়ডিহি, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন ঃ গলফের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার নাম জানতে চাই।

উত্তর ঃ গলফের নানা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আছে। সমস্ত বিশ্বজুড়েই হয়।

অমিতকুমার মজুমদার (টি.বি হাসপাতাল, মেদিনীপুর)

উত্তর ঃ এবারের ঘরোয়া ফুটবল লীগে (কলকাতার) কোন দল সব থেকে শক্তিশালী তা তো জেনেই গেছো।

সুদীপ কুমার রায় (তমলুক, মেদিনীপুর)

উত্তর ঃ তোমার তৈরি ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম ছেপে দেওয়া হলো–

গাভাসকার, শ্রীকান্ত, গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, আজহারউদ্দিন, কীর্তি আজাদ, কপিলদেব (অধিনায়ক), পঙ্কজ রায়, রবি শাস্ত্রী (সহ অধিনায়ক), কিরমানি (উইকেটরক্ষক), বেংসরকার, রজার বিনি, মহিন্দর অমরনাথ, মনিন্দর সিং ও চেতন শর্মা।

সুদীপ্ত দাশগুপ্ত [মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা (উঃ)]

উত্তর ঃ আপনার গড়া বিশ্বের সেরা ফুটবল দলটির খেলোয়াড়দের নাম ছেপে দেওয়া হলো–

গোল ঃ দাসাহেভ; ব্যাক ঃ প্যাসারেল্লা, জুনিয়ার, ব্রিগেল ও রুসো; হাফে ঃ প্লাতিনি, জিকো, মারাদোনা; ফরোয়ার্ডে ঃ র‍্যামস, স্মোলারেখ, রুমেনিগে (অধিনায়ক)।

কপিলদেব ও মহিন্দর অমরনাথ

উক্তি

(আমেদাবাদে ৭ মার্চ ১৯৮৭ সালে সুনীল গাভাসকার টেস্ট ক্রিকেটে দশ হাজার রান পূর্ণ করার পর যে যা বলেছিলেন।)

অভিনন্দন সুনীল। তুমি আমাদের দেশের গৌরব। তোমার জন্যে আমরা সকলেই গর্বিত।

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী

আমি আশা করি তুমি আরও অনেকদিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করে যাবে।

রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং

দশ হাজার রান করার পর আমার যে কী অনুভূতি হয়েছিলো তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। সেই মুহূর্তে আমি নিজেকে নিজে বলেছিলাম—সানি তাহ'লে তুমি সত্যিই পারলে।

সুনীল মনোহর গাভাসকার

দশ হাজার রানের পর্বতশৃঙ্গে ঐ ছোট্ট মানুষটিকে দেখে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া—গর্ব এবং রোমাঞ্চ। তা তো হয়েছেই। আমি সুনীলকে এখন 'রানমেশিন' বলে ডাকি। সূর্যকে কোনো কিছু দিয়ে প্রতিরোধ করা যায় না। রানমেশিন গাভাসকারও তাই। টেস্টে দশ হাজার রান কোনো মানুষ করতে পারে? বিশ্বাস করাও কঠিন ছিলো। সেই অবিশ্বাস্য কঠিন কাজটিই সুনীল করেছে।

কপিলদেব নিখাঞ্জ

কেন জানি না, এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী, সবচেয়ে গর্বিত মানুষ বলে নিজেকে মনে হচ্ছে। আমার গড়ফাদার সুনীল গাভাসকার টেস্ট ক্রিকেটে দশ হাজার রান পূর্ণ করল। জানি এই মুহূর্তে সমস্ত ভারতবাসী, সমস্ত ক্রিকেটপ্রেমী গর্বিত, আনন্দিত। সুনীল কারো একার নয়—সে সারা ভারতের। তবু আমি নিজেকেই সব থেকে গর্বিত মনে করছি।

রবিশংকর শাস্ত্রী

(২১২ পাতার পর)

রানে এগিয়ে গিয়ে লয়েড যখন ভারতকে দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে পাঠালেন তখন তিনি ভেবেছিলেন—জয় তাঁর মুঠোয়। ভারতকে আবার হারিয়ে এগিয়ে যাবেন ২–0 টেস্টে।

কিন্তু লয়েডের চ্যালেঞ্জের জবাব ভারতীয় খেলোয়াড়রা এইভাবে দেবেন তা লয়েড কেন—কেউই বোধহয় কল্পনা করতে পারেননি। দ্বিতায় ইনিংসে ৪০৬ রান করে জেতা চাট্টিখানা কথা নয়। ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন নজির আছে মাত্র কয়েকটিই।

সুনীল গাভাসকার আর গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ দুর্দান্ত হয়ে উঠলেন। লয়েড তাঁর ভয়ংকর ফাস্ট বোলারদের দিয়ে চেষ্টা করিয়েও কিছু করতে পারলেন না। দুজনে ধীরে, সুস্থে এবং দারুণ খেলে ভারতকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন জয়ের পথে। বাকি কাজটুকু সারলেন মহিন্দর অমরনাথ। দরকারের মুহূর্তে ঝলসে উঠল্লে তাঁর ব্যাট। ভারত জিতলো। বার্বাডোজের হারের বদলা নিল কুইনস পার্কে। মাত্র চারটি উইকেট হারিয়ে ভারত পৌঁছে গেল জয়ের লক্ষ্যে।

[চলবে]

পড়ার সঙ্গে খেলা

বেথুন স্কুল

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যশালী বেথুন স্কুল পড়াশুনার সংগে তাল রেখে খেলাধুলাতেও সমান পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। এই স্কুলের ছাত্রীরা অ্যাথলেটিক্স্, সাঁতার, জিমন্যাসটিক্স্, যোগব্যায়াম প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

১৯৮৬ সালে Y.M.C.A আয়োজিত ইন্টার স্কুল স্পোর্টসে জুনিয়ার গ্রুপে এই স্কুলের অপর্ণা মজুমদার ১00 মিঃ দৌড়ে প্রথম ও সায়ন্তনী চ্যাটার্জী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সায়ন্তনী ২00 ও ৩00 মিঃ দৌড়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ব্রড জ্যাম্পে মিতালি নন্দী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

সিনিয়ার গ্রুপে ১00 মিঃ দৌড়ে সুবর্ণা ঘোষ ও দীপ্তি অধিকারী এবং ২00 মিঃ দৌড়ে রূপা চক্রবর্তী ও সুবর্ণা ঘোষ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ৪00 মিঃ দৌড় ও ব্রড জ্যাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করে রূপা চক্রবর্তী। রিলে রেসে সায়ন্তনী চ্যাটার্জী, সুবর্ণা ঘোষ, অপর্ণা মজুমদার ও রূপা চক্রবর্তী প্রথম হয়। সিনিয়ার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয় রূপা চক্রবর্তী। বেস্ট ডিসিপ্লিনড্ টিম হিসেবে এই স্কুলের ছাত্রীরা ডিসিপ্লিন ট্রফি পায়।

সুদেষ্ণা বিশ্বাস

নর্থ ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট স্কুল স্পোর্টসে এই স্কুলের ছাত্রীরা প্রতি বছর অংশগ্রহণ করে থাকে। '৮৬তে সিনিয়ার গ্রুপে অজন্তা ঘোষ লং জ্যাম্পে প্রথম, সোহিনী সেনগুপ্ত ডিসকাসে তৃতীয়, সুলক্ষ্মা চক্রবর্তী ও বর্ণালী রাজবংশী হাই জ্যাম্পে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আসে। জুনিয়ার গ্রুপে ৪00 মিঃ দৌড়ে প্রথম ও লং জ্যাম্পে দ্বিতীয় হয় রূপা। শটপুটে অনুপা সরকার দ্বিতীয়, হাই জাম্পে দ্বীতি অধিকারি প্রথম ও পারমিতা চৌধুরি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

সিনিয়ার গ্রুপে ১00 মিঃ দৌড়ে শ্রাবণী ঘটক ও বিশাখা ঘটক যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় এবং ২00 মিঃ দৌড়ে শ্রাবণী ঘটক ও পারমিতা ঘোষ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়। ৪00 মিঃ দৌড়ে পারমিতা ঘোষ প্রথম ও শ্রাবণী ঘটক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেয়ে বেথুন স্কুল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

এই স্কুলের রূপা চক্রবর্তী অ্যাথলেটিকসে স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপে চতুর্থ স্থান পায়। সাব জুনিয়ার গ্রুপে জিমন্যাস্টিক স্টেট সিলেকশনে প্রথম হয় এই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী সুদেষ্ণা বিশ্বাস।

এই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী দেবযানী সেনগুপ্ত সাঁতারে উল্লেখযোগ্য নাম। দেবযানী ইন্টার এসোসিয়েশন একুয়েটিক মিটে ৫0 মিঃ ফ্রি স্টাইল-এ দ্বিতীয় (৪৩.৯২ সেঃ) ও ৫0 মিঃ ব্যাক স্ট্রোকে প্রথম (৫0.৪৩ সেঃ) হয়। খিদিরপুরে অল বেংগল মিটে ৫0 মিঃ ব্যাক স্ট্রোকে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ক্যালকাটা স্পোর্টসে ৫0 মিঃ ব্যাক স্ট্রোকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

এই স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে বসুধারা মিত্র, যশোধরা ভাদুড়ী, চন্দনা সাহা যোগাসনে উল্লেখযোগ্য নাম।

বেথুন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি অপর্ণা দত্ত ও গেমস টিচার অনিতা ঘোষ সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখেন যাতে মেয়েরা পড়াশুনার সংগে তাল রেখে খেলাধুলাতেও সমান পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারে। অপর্ণা দেবী জানালেন স্কুল কর্তৃপক্ষ খেলাধুলার বিষয়ে সব রকম সহযোগিতা করে থাকে।

ছবি : সুজিত ভট্টাচার্য

এই সংখ্যার সব ছবি সমীর চট্টোপাধ্যায়ের তোলা।

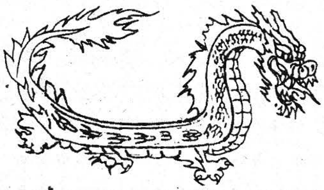

ব্রুস লি

ডিভোনো ও ম্যাটেরা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ক্রুস গলি দিয়ে খোলা জায়গায় আসতেই......
আমি দুঃখিত.....তোমার ঐ ভাবে আমার পিছু নেওয়া উচিত হয়নি!
চার্লির নির্দেশ আছে, ওকে খুন করতে হবে!
বুঝতে পারছি, আমাকে ধরার জন্যেই এইভাবে ফাঁদ পাতা হয়েছিলো!
আমি তোমাদের বস চার্লিকে কথা বলার সুযোগ দিতে চাই...
মনে হয় কোথাও একটা ভুল হচ্ছে!
ভুল হয়ে থাকলে- তোমার জন্যেই হয়েছে!
এরা দেখছি রাস্তার গুন্ডাদের মতো নয়... সৈন্যদের মতো ট্রেনিং নেওয়া
হা আ আ আপ.....
ম্যাগি, স্যার ম্যালকমদের সংগে তোমাদের যে গোলমাল আছে তা মিটিয়ে দেওয়া যাবে.....
কিন্তু তার আগে তোমায় সত্যি কথা বলতে হবে!
সে কথা বললে চার্লির লোকজন আমাকেও খুন করবে!

[চলবে]

অমৃতের পুত্র

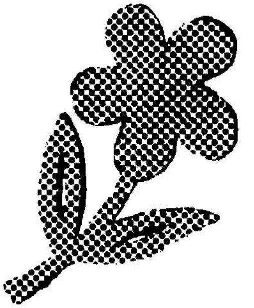

নন্দলাল ভট্টাচার্য

দূর থেকে শোনা যায় ঢাকের আওয়াজ। জোড়কাঠিতে বাজছে ঢাক—ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং। শোনা যায় সুরেলা গলায় আওয়াজ—ও ভাঙের ভোলার চরণের সেবা লাগে—মহা-দেব!

আওয়াজ শুনেই থমকে দাঁড়ায় ফ্নু। বন্ধুদের হেঁকে বলে, ওঠ রে, আসছে গাজনের সন্ন্যাসী।

হৈ-হৈ করে বন্ধুর দল। ভয়ে নয়, আনন্দে। ওরা জানে ফ্নু কেমন করে জব্দ করে ওই সন্ন্যাসীদের। যখন জব্দ-সন্ন্যাসীরা নানা কাকুতিমিনতি করে তখন ভারি মজা হয় ওদের। হা-হা করে হাসতে থাকে তারা।

আবার শোনা যায় ডাক— বাবা ভোলানাথের চরণের সেবা লাগে—মহা-দেব!

ফ্নুও সংগে সংগে সুরেলা গলায় গেয়ে ওঠে—'শিব হে—শিব হে'। গাজনের গান গাইতে গাইতেই ফ্নু তার বন্ধুদের নিয়ে দাঁড়ায় রাস্তার মাঝে। ওদিক থেকে আসছে সন্ন্যাসীর দল। কাছাকাছি আসতেই ফ্নুর বন্ধুরা কাঠি দিয়ে টানা একটা দাগ কেটে দেয় রাস্তায়। ব্যস, অমনি দাঁড়িয়ে পড়ে সন্ন্যাসীর দল।

এ এক আশ্চর্য খেলা—মজার সংস্কার। গাজনের ছড়া কাটাকাটি আর প্রশ্নোত্তরের পালা শুরু হবে এবার। সন্ন্যাসীরা যদি প্রশ্নের জবাব দিতে পারে তাহলেই ছেলেরা মুছে দেবে ওই দাগ—সন্ন্যাসীরাও চলে যাবে পথ ধরে। কিন্তু যদি না পারে—তা হলে তাদের যেতে হবে ঘুর পথে। তাই গাজনের সন্ন্যাসী দেখলেই দাগ কাটে ছেলেরা।

বারাসাতের এই ছোট্ট শহরে ছেলেদের নেতা ফ্নু। বছর দশেক বয়স—কিন্তু এরই মধ্যে মুখস্থ তার শিবের হরেক রকম ছড়া। গাজনের আগে থেকেই বন্ধুদের নিয়ে খাতায় সে লিখে রাখে নানা প্রশ্ন আর তার উত্তর। সবাই মিলে সে সব কূটকচালি প্রশ্ন আর উত্তর রাখে সড়গড়। তারপর যেই আসে চৈত্র—বাজে গাজনের ঢাক—অমনি ওদের যেন জিব সড়সড় করে। সন্ন্যাসী দেখলেই ধেয়ে যায়। রাস্তায় দাগ কেটে থামায় তাদের—তারপর নানা প্রশ্নে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। জবাব দিতে না পেরে সন্ন্যাসীরা যখন ঘুর-পথে যায় তখন দুয়ো দিয়ে ওঠে ছেলের দল।

ফ্নুর কাছে কিন্তু অত সহজে নিস্তার পায় না সন্ন্যাসীরা। ফ্নুদের পাড়ায় যাতায়াতের দুটো রাস্তা। একটা সদর আর আরেকটা ফ্নুদের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে। সন্ন্যাসীরা হেরে গিয়ে যখন পেছনের রাস্তা ধরে অমনি ফ্নু সে রাস্তাতেও দাগ কেটে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ন্যাসীরাও যেতে পারে না। অসহায়ের মতো ফ্নুকে বলে, দে না বাবা, দাগটা মুছে দে না।

কেউ বলে, ও বামুন ঠাকুর, আমরা কি তোমার মতো পন্ডিত গো। আমরা হলাম গিয়ে মুখ্যসুখ্য মানুষ। আমাদের তুমি রেহাই দাও। দাগ মুছে দাও চলে যাই।

এমনিভাবে নানা জনে করে কাকুতি আর ফ্নু তার বন্ধুদের নিয়ে বুক ফুলিয়ে শোনে সে সব। তারপর একসময় বন্ধুদের বলে, দে তবে দাগটা মুছে দে—ওরা হেরো।

ফ্নুর বাবা রামকানাই ঘোষাল বারাসাতের নামকরা মোক্তার। রানী রাসমণির তিনি বাঁধা মোক্তার। থাকেনও যশোর রোডে। পয়সার অভাব নেই। ফ্নু তাঁর একমাত্র ছেলে। তাই তার কোনো আবদারই অপূর্ণ রাখেন না।

ফ্নুর সবচেয়ে প্রিয় খাবার জিলিপি। তাই আদালত থেকে বাবা ফিরলেই সে গিয়ে বলে, কই বাবা, আমার জিলিপি কই, আমায় জিলিপি দাও।

ছেলের বায়না মেটান বাবা। ময়রাকে বলে বিশেষ বরাত দিয়ে থালার মতো বড় বড় জিলিপি করান তিনি, তারপর সেই জিলিপি আনেন তিনি ফ্নুর জন্য। আর ফ্নুও খানিকটা নিজে খায় আর বাকিটা খাওয়ায় তার কুকুরকে। পড়শীরা বলে, লাই দিয়ে দিয়ে রামকানাই ঘোষাল ছেলেটার মাথা একবারে খেলে।

রামকানাইয়ের কিন্তু সে দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ছেলের ভাওয়ে ভাও দিয়ে চলেন। আর মা বামাসুন্দরী দেবীও বাপ ছেলের এই ভাবটা দেখে আনন্দে মনটাকে ভরিয়ে রাখেন সব সময়। রাখবেন না কেন—তিনি যে অনেক সাধ্য-সাধনার পর পেয়েছেন তাঁর ফ্নুকে—তাঁর তারককে।

তারকনাথের দোরধরা বলে বাবা মা ছেলের নাম রেখেছিলেন তারক—তারকনাথ ঘোষাল। তা ছেলে যেন শিবের মতোই পাগল—আপনভোলা। কোনো কিছুতেই তার যেন আকর্ষণ নেই—আবার যা অতি সামান্য তাই নিয়ে মেতে থাকে সে। পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এই নিয়ে কথা শোনায়, কিন্তু কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই বাবা মা'র।

মোক্তারি করে রামকানাইয়ের যে আয় হয় তা থাকে একটি হাতবাক্সের মধ্যে। সবাই জানে তা—ফ্নুও। এই বাক্সটির ওপর তার যেন অদ্ভুত আকর্ষণ। প্রায়ই গিয়ে বসে থাকে বাক্সটার কাছে। তারপর বাক্স থেকে দু হাত ভরে টাকা পয়সা নিয়ে ছুট লাগায় সে পুকুরপাড়ে। হাতের সেই সব টাকা

পয়সা এক এক করে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পুকুরে। টুপটুপ করে একটা পয়সা ডোবার শব্দ হয় আর আনন্দে হেসে ওঠে ফনু।

ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে কেউ হয়ত রামকানাইকে গিয়ে বলল, দেখুন গিয়ে ফনু কি করছে।

কি করছে?

আপনার বাক্স থেকে টাকা পয়সা নিয়ে পুকুরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে।

তাই নাকি? কোথায়?

ওই তো ওই পুকুরপাড়ে।

কই চলো তো দেখি। রামকানাই তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে আসেন পুকুরপাড়ে। দেখেন তাঁর আদরের ফনু টাকা পয়সা জলে ফেলে হাততালি দিয়ে হাসছে আনন্দে। ছেলের আনন্দ দেখে বাবাও হেসে ওঠেন আনন্দে। বাপ ছেলের আনন্দ দেখে যে নালিশ করেছিল সে তো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রামকানাই তাকে বলেন, ওহে, এতে হাসব না তো হাসব কখন? বেটা আমার শিব, দেখছ না ওর কাছে টাকা পয়সার কোনো দামই নেই।

মা বামাসুন্দরীও একই রকম। বাড়িতে কুড়ি পঁচিশটা ছেলে থেকে পড়াশোনা করে। সব খরচ রামকানাই দেন। আর বামাসুন্দরী সব সময় ব্যস্ত থাকেন সেই সব ছেলের দেখাশোনা আর রান্নাবান্নার কাজে। রামকানাই রান্নার জন্য লোক রাখতে চেয়েছেন—কিন্তু বামাসুন্দরী রাজী হননি। বলেছেন, ওরা-ও তো সব আমারই ছেলে। ফনুর জন্য রাঁধতে পারব আর ওদের জন্য পারব না। তাই একা হাতে তিনি করে যান সব।

এত খাটাখাটুনি করতে গিয়ে মা কিন্তু ছেলের দিকে নজর দেওয়ার সময়ই পান না। কেমন যেন হেলায় ফেলায় থাকে ফনু। এই নিয়ে কেউ বামাসুন্দরীকে বলতে গেলে তিনি বলতেন, তারক আমার শিবের দোরধরা—ওকে বাবা তারকনাথই দেখবেন।

ফনু থাকে তার আপন মনে। বাড়িতে ছিল বড় বড় লোমওয়ালা প্রকান্ড একটা কুকুর। সেই কুকুরই ছিল ফনুর খেলার সবচেয়ে বড় সাথী। তাকে নিয়েই সারাদিন যত রাজ্যের খেলা। রাতেও তাকে নিয়েই শুতো বিছানায়। প্রথম প্রথম মা একটু আপত্তি করেছিলেন। অমনি ফনু একদম কেঁদে কেটে একসা। কুকুরকে ছাড়া সে বিছানায় শোবে না।

ছেলের জেদ দেখে মা মত বদলাতে বাধ্য হলেন, তখন ছেলের সে কি ফূর্তি। কুকুরকে জড়িয়ে সে শুয়ে থাকত। তা না হলে তার রাতে ঘুমই হতো না।

শুধু কুকুর নয়, সব রকম জীবজন্তুর প্রতিই ফনুর ছিল এই রকম ভালবাসা—এই রকম টান। শুধু ছোটবেলাতেই নয়, পরে অনেক অনেক বড় হয়ে তিনি যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা পেলেন—তাঁর ভক্তসন্তান হয়ে হলেন স্বামী শিবানন্দ—হলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ তখনও রাস্তার সামান্য নেড়ি কুকুরের প্রতি ছিল তাঁর ঠিক এমনি দরদ।

শ্রীরামকৃষ্ণর দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ এবং আরো কয়েকজনের সঙ্গে ফনু বা তারকনাথ যখন থাকতেন বরাহনগর মঠে তখন তাঁদের দিন কাটত খুবই কষ্টে। কত দিন দু বেলা দূরের কথা একবেলাও ভরপেট খাবারও পেতেন না তাঁরা। তবু তারই মধ্যে তারকনাথ তাঁর খাবার থেকে একটা অংশ দিতেন তাঁর পোষা একটা শিয়ালকে।

শিয়ালটা অবশ্য বনেই থাকত। কিন্তু যেই তারকনাথ জোর গলায় ডাকতেন ভোঁদা ভোঁদা বলে—অমনি জঙ্গল থেকে শিয়ালটা চলে আসত একবারে বরাহনগর মঠের দোরগোড়ায়। তারকনাথ ওপর থেকে ছুঁড়ে দিতেন রুটির টুকরো আর ভোঁদা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সেই রুটি মুখে নিয়ে আবার চলে যেত জঙ্গলে। আনন্দে নাড়ত তার লেজটা।

সেসব অবশ্য অনেক পরের কথা। এখন ফনুর ছোটবেলার কথাই শোনা যাক। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ফনুর জন্ম। তার জন্মের পরই রামকানাই ডেকে এনেছিলেন বড় বড় জ্যোতিষীদের। তাঁরা সেদিন গণনা করে বলেছিলেন, বড় হয়ে এ ছেলে রাজার মতো থাকবে সংসারে। কিন্তু—

উদ্বিগ্ন বাবা মা ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, থামলেন কেন? কিন্তু কি?

না, ভয় পাবার মতো কিছু নয়। এ ছেলের রয়েছে সন্ন্যাস যোগ। তবে সন্ন্যাসী হলেও এ থাকবে রাজারই মতন।

গণনা শুনে মা-বাবার কিন্তু দুঃখ হয়নি। গৃহীই হোক, আর

সন্ন্যাসীই হোক, ছেলে যে রাজসম্মানে থাকবে এটাই ছিল তাঁদের আনন্দ।

ছেলের রকম সকম দেখে তাঁরা প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন, ছেলে তাঁদের আর পাঁচজনের মতো নয়। ছেলেরা খেলা করে, ফুনুও করে। দলের সেই নেতা। নানা রকম দুষ্টুমিও আসে তার মাথায়। কিন্তু খেলতে খেলতে কি যে হয়, মাঝে মাঝেই কেমন যেন উদাস হয়ে যায় সে। বাইরের জগতের সঙ্গে সব সম্পর্কই যেন কেটে যায় তার। বন্ধুরা তখন যদি তার গায়ে ধাক্কা দিয়েও বলে, কি রে কি হলো, খেলবি না আর—তবু সাড়া পায় না ফুনুর। ছেলের দল আবার মেতে ওঠে খেলায়। কিছুক্ষণ বাদে হয়ত আপনা থেকেই ফুনু আবার আগের মতোই হৈ হৈ করে খেলতে থাকে।

বাবা রামকানাই মোক্তারি করলেও নিজে কিন্তু মা কালীর মস্ত ভক্ত। তিনি ছিলেন এক মস্ত তান্ত্রিক। দিনে নানারকম কাজকর্ম করলেও রাত কাটত তাঁর মায়ের পূজা আর ধ্যান করে।

তিনি তখন বেলঘরিয়ায় থাকতেন। সেখান থেকে ভোরে হেঁটে আসতেন দক্ষিণেশ্বরে—গঙ্গায় স্নান করার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন এই মন্দিরেতেই সাধনা করেন। যাওয়া আসার পথে রামকানাই দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। দেবী ভবতারিণীর সঙ্গে প্রণাম করেন তাঁকেও। কথাও হয় দু'জনে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সময় একটা অদ্ভুত গা জ্বালা করা রোগ হয়। আগুনে শরীর পুড়ে গেলে যেমন শরীর জ্বালা করে তেমনি। ডাক্তার কবিরাজ অনেক কিছুই করা হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। হবে কি করে। তাঁর তো কোনো রোগ হয়নি। সাধনার পথে ওরকম কারো কারো হয়। কথায় কথায় একদিন তাঁর ওই গা জ্বালা করার কথাটা বললেন রামকানাইকে। রামকানাই ইষ্টদেবীর নাম লেখা একটি কবচ দেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে। তাতেই সেরে যায় তাঁর রোগ।

রামকানাই খুব সুন্দর গান গাইতে পারতেন। বাবার গলায় শ্যামাসংগীত শুনতে শুনতে একদিন ফুনুর গলাতেও গুনগুনিয়ে ওঠে শ্যামাসংগীতের সুর। বাবার মতোই সেও ছিল সুকণ্ঠের অধিকারী। বাড়িতে যেসব ভিখিরি আসত শ্যামাসংগীত গাইতে গাইতে, তাদের কাছ থেকে সে শিখে নেয় গান।

ছবছর হতে না হতেই ফুনু ভর্তি হলো পাঠশালায়। তারপর একসময় পাঠশালার পাট চুকিয়ে ভর্তি হলো হাইস্কুলে। এখানে সে পেলো আরো বন্ধু, আরো বই। একবার যা পড়ে তাই মুখস্থ হয়ে যায় তার। মাস্টারমশাইরাও তার বুদ্ধি আর মেধা দেখে মুগ্ধ। কিন্তু হলে হবে কি, পড়ার চেয়ে ফুনুর খেলতেই ভাল লাগে বেশি। আবার খেলতে খেলতেও কি যে হয়—সব ছেড়ে কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সে। আসলে সেই ছোটবেলা থেকেই ফুনু একধরনের ধ্যানের আনন্দে যেন সব সময় ডুবে থাকত।

ফুনুর যখন ন'বছর বয়স তখন তার মা মারা যান। তখন তার ছোট বোনটির বয়স মাত্র তিন মাস। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে রামকানাই যেন অথৈ জলে পড়েন। সেই সময় এই ন'বছরের ফুনুই বাবার সব কাজে সাহায্য করতে থাকে। সব কিছু ঠিকঠাক করে তবে সে যেত স্কুলে।

এরই কিছু দিনের মধ্যে প্রায় পরপর ফুনুর দুই জামাইবাবু মারা যায়। এমনই ফুনু প্রথম থেকেই ছিল একটু অন্যরকম, এখন মা'র মৃত্যু, দুই দিদির অকাল বৈধব্য তার মনকে যেন আরও উদাস করে তুলল। ওইটুকু ছেলে—কিন্তু কেমন যেন একটা বৈরাগ্য তাকে পেয়ে বসল।

নিমতায় তার মামার বাড়ি। মামা মামী খুবই ভালবাসেন ফুনুকে—তাই ছুটির পর চলে যায় মামার বাড়ি। কিন্তু সেখানেও বেছে বেছে নির্জন পুকুরপাড়ে বসে সে আপন মনে গাইতে থাকে শ্যামাসংগীত। আর মাঝেমাঝেই গান বন্ধ করে কেমন যেন একটা ভাবে তাকিয়ে থাকে দূর আকাশের দিকে।

ফুনু তখন এনট্রান্স ক্লাসে পড়ে। সেইসময়ই শুরু হয়ে গেছে তার ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা, কিন্তু আনন্দ খুঁজে পায় না ফুনু। একদিন কাউকে কিছু না বলে সে চলে যায় দেশভ্রমণে।

এই বিদেশ ভ্রমণের সময়ই কেমন করে যেন রেলে একটা কাজও জুটিয়ে নেয় সে। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ, মোগলসরাইতে কাজ করে ফুনু। অবসর সময়ে একতারা নিয়ে গান করে সে। গান করতে করতে কেমন যেন তন্ময় হয়ে যায়।

এইসময়ই তার মনে হয়, সমাধি জিনিসটা কি তা একবার দেখতে হবে। কিন্তু সমাধি কি ? কে বলে দেবে কেমন করে হয় সমাধি। এক বন্ধু সেই সময় বলে, দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ঠিক ঠিক সমাধি বলতে যা বোঝায় তা হয় তাঁরই।

সেই থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় তাঁর প্রাণে। তবে আরো বছর আড়াই তাঁকে প্রাণের মধ্যেই চেপে রাখতে হয় সেই আকাঙ্ক্ষা।

তারপর এল ১৮৮০ সাল। ফুনু তখন আর ছোটটি নেই। বছর ছাব্বিশ তাঁর বয়স তখন। সেই সময় কলকাতার সিমলে পাড়ায় রামচন্দ্র দত্তর বাড়িতে তিনি প্রথম দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। দেখার পরই তাঁর প্রাণমন সব যেন কেমন হয়ে গেল। তিনি ঘনঘন আসতে থাকলেন তাঁর কাছে। তারপর ১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গলার রোগে ভুগছেন সেই সময়ই সব ছেড়ে ছুড়ে তিনি চলে এলেন তাঁর সেবা করার জন্য। তারও পরে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দর সঙ্গে তিনিও নিলেন সন্ন্যাস। ফুনু থেকে তারকনাথ। তারকনাথ থেকে তিনি হলেন শিবানন্দ। স্বামী শিবানন্দ—মহাপুরুষ মহারাজ। তাঁর এই মহাপুরুষ নামটি দেন বিবেকানন্দই। মহাপুরুষের মতো জীবন যাপন করার জন্যই তাঁর এই নামটি দেন বিবেকানন্দ। স্বামী ব্রহ্মানন্দর পর তিনি হন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ। তারপর ১৯৩৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রিয় সন্তানটি আবার চলে গেলেন তাঁরই কাছে। অমৃতের সন্তান মিশে গেল আবার অমৃতেই।

রাধারমণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কালমকরের দূত

কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার আসার পথে জাহাজের মধ্যে এমন তিনজনের সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো, যাঁরা গ্রেট নিকোবর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাবেন, আর মানুষ হিসেবে যাঁদের প্রত্যেকেরই মনে রাখার মতন আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে।

এক নম্বর সঙ্গীটির নাম নূরুল আলম। এঁর চেহারা মিষ্টি। বয়স, অনুমান করছি, তিরিশ। গান ভালোবাসেন। নিজেও গাইতে পারেন। আর যে-সব গান ইনি গান, সে-সব গানের কথা আর সুর সংগ্রহ করেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখ থেকে, একেবারে অবিকৃত অবস্থায়। আলম সাহেব সত্যিই গুণী শিল্পী! ইনি এখানে এসেছেন আন্দামান-নিকোবরের আদিবাসীদের মধ্যে যে-সব লোকসংগীত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সে-সব উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। ইনি প্রথমেই যাবেন গ্রেট নিকোবরে। সেখানকার শোম্পেনদের গান ইনি নিজের হাতে টেপ করে নিয়ে আসবেন। ফেরার পথে নামবেন কার-নিকোবরে। নিকোবরীদের মধ্যে প্রচলিত লোকসংগীতগুলোও ইনি টেপ করে আনবেন।

দু নম্বর সঙ্গীটি হচ্ছেন একজন সওদাগর। কলকাতা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর এনে যোগান দেন নিকোবরের বিভিন্ন দ্বীপে। গ্রেট নিকোবরে এঁর গোডাউন আর দোকান আছে। ইনি নিকোবরের নারকেল, সুপুরি, মিষ্টি আলু, সুটকি মাছ, চিংড়িমাছ, কাঁকড়া প্রভৃতি চালান দেন মেনল্যাণ্ডে। ব্যবসাদার হিসাবে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এঁর যথেষ্ট নাম আছে। গোবিন্দ মিশ্র নামটা সেখানকার অনেকেরই জানা। ভদ্রলোকের চেহারা তারিফ করার মতন। বাঙালীর মধ্যে এরকম শরীর-স্বাস্থ্য সত্যিই বিরল। এঁর চোখদুটোও খুব ডাগর ডাগর। এঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ইনি সবজান্তা! সাহিত্য-সিনেমা থেকে আরম্ভ করে কূটনীতি, রাজনীতি কিছুই এঁর অজানা নেই! আর খৈনি খাওয়া মুখে ভয়ানক হেঁড়ে গলায় তর্কও করেন বিশ্রী ভাবে! আমার মতন একটা সিক্সে পড়া ছেলের কানেও এঁর কথাগুলো বড্ড লাগে! এত বাজে আর ভুল তথ্য এঁর যুক্তিতে! একজন প্রৌঢ় বয়স্ক লোকের কাছ থেকে এরকম আমি আশা করিনি।

তিন নম্বর সঙ্গীটির নাম তপন হাজরা চৌধুরী। বয়সে ইনি গোবিন্দ মিশ্রের কাছাকাছি হবেন বলেই আমার অনুমান। ইনি একজন ভ্রমণ-সাহিত্যিক। পাবলিশারের টাকায় ইনি নানা জায়গা ভ্রমণ করে বেড়ান। ভ্রমণকালে ডায়েরি লেখেন। আর ভ্রমণ শেষে সেই ডায়েরিটা তুলে দেন পাবলিশারের হাতে। ইনি অবিশ্যি স্বনামে কিছু লেখেন না। লেখেন ছদ্মনামে। এঁর ছদ্মনাম পর্যটক। আর এঁর রচনাবলীর নাম 'পর্যটকের চোখে'। রচনাবলীর খণ্ডের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। জানি না এবার ইনি কত নম্বর সংখ্যার জন্য আগাম নিয়ে এসেছেন এই আন্দামান-নিকোবরে!

পোর্ট ব্লেয়ারে এসে আমরা উঠেছি সরকারি রেস্ট হাউসে। এখানে আমাদের জাহাজ বদল করার কথা। নিকোবরের জাহাজ আসতে দিন দুয়েক দেরি হবে। এ-দুদিন এখানেই থাকতে হবে।

গোবিন্দ মিশ্র সারাদিন ব্যস্ত রইলেন জাহাজ থেকে ওঁর মালপত্তর নামানোর কাজে। আমরা রেস্ট হাউসে বসে রেস্ট নিতে লাগলাম। ইচ্ছা থাকলেও বুড়ির জন্য আমাদের পক্ষে বেরুনো সম্ভব হলো না। জাহাজের দোলানিতে ওর সী-সিকনেস্ হয়েছিল। তার ধাক্কা এখনো ও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি।

আমাদের রেস্ট হাউসটা সমুদ্রের একেবারে ধারেই। মাত্র দু-তিনশ গজ দূরেই সমুদ্রের জল। সমুদ্রের নীল আর আকাশের নীল এখানে আলাদা করে চেনা যায় না। সেই সঙ্গে মিশেছে মাটির সবুজ, নারকেল-সুপুরি-কলাগাছের পাতার সবুজ। চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়!

সূর্য এখানে তাড়াতাড়ি ওঠে, আর তাড়াতাড়ি অস্ত যায় শুনেছিলাম। এখন দেখছি কথাটা সত্যি, বিশেষ করে এই সূর্যাস্তের ব্যাপারটা। সূর্যোদয়ের ব্যাপারটা রাত না ফুরোলে বোঝা যাবে না অবিশ্যি।

ঘড়িতে সময় এখন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। আর আধঘণ্টার মধ্যেই যে রীতিমতন অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, তা বেশ বুঝতে পারছি।

ভ্রমণ-সাহিত্যিক তপন হাজরা চৌধুরী একটু বেরিয়েছেন। সমুদ্র দেখে দেখে ওঁর চোখ যে একেবারে পচে গেছে, একথা আজ সকালেও ওঁর মুখে শুনেছি। অতএব ধরে নেওয়া যায়, উনি বেড়াতে গেছেন ডাঙার দিকেই।

সংগীত-শিল্পী নুরুল আলমও বেরিয়েছেন, নতুন কোনো সুরের খোঁজে।

গণেশকাকু বুড়িকে বললেন, 'মা-মণি, তোমার শরীর এখন কেমন আছে?'

বুড়ি বললো, 'আগের চেয়ে ভাল লাগছে।'

'আমি একটু ঘুরে আসবো?'

'এস।'

'এক্ষুণি আসছি। কলকাতা থেকে আসার সময় নস্যি কিনে আনার কথা ভুলে গেছি। দেখি এখানকার দোকানে এক-আধটা ফাইল-টাইল পাওয়া যায় কিনা। জিৎ, তুমি কিন্তু বেরিয়ো না।'

আমি বললাম,'না, বেরোবো না। তুমি নস্যি কিনে নিয়ে এস।'

বুড়ি বললো, 'বেশি দেরি করবে না কিন্তু।'

'আচ্ছা।' বলেই গণেশকাকু রেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বুড়ি শুয়ে শুয়ে টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চার পড়ছিল। পড়তে পড়তেই বললো,'টিনটিনকে তোর কার মতন লাগে বল দেখি?'

আমি বললাম, 'ফেলুদার মতন।'

ও হেসে বলল, 'ঠিক বলেছিস তো!'

'কাদের কথা হচ্ছে?' বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন ভ্রমণ-সাহিত্যিক তপন হাজরা চৌধুরী। এঁর গলার স্বর অসম্ভব মিহি, মহিলাদের মতন।

আমি বললাম, 'গল্পের গোয়েন্দা আর তার অ্যাসিসটেন্টদের কথা। আপনার বেড়ানো হলো?'

'কিছুটা। কাল সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সময়টা কাজে লাগাতে হবে। ভাল কথা, জারোয়াদের নাম শুনেছো?'

'শুনেছি। তবে তাদের কথা বিশেষ জানি না।' বললাম আমি।

বুড়ি বললো, 'আপনি বুঝি এখন জারোয়াদের কাছ থেকে আসছেন?'

'জারোয়াদের কাছে গিয়ে কেউ জ্যান্ত ফিরে আসতে পারে?'

'কেন?' বুড়ি জানতে চাইলো।

'বলছি।' বলে উনি আমাদের আন্দামানের আদিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন।

ওঁর একমাত্র নেশা হচ্ছে দুলালের তালমিছরি। এ-জিনিসটা ওঁর সব সময়ের সঙ্গের সাথী। নিজেও খান, অন্যদেরও খাওয়ান। এই যেমন, এখন বুড়িকে আর আমাকেও একটা করে টুকরো দিলেন।

তালমিছরি খেতে আমার আর বুড়িরও বেশ লাগে। তাই তপন হাজরা চৌধুরীকেও আমাদের ভাল লেগে গেছে।

আমাদের কথার মাঝে হঠাৎ বাইরে কে যেন ভীষণ হেসে উঠল।

হাসছেন গোবিন্দ মিশ্র।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, রেস্ট হাউসের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ষণ্ডা মার্কা একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন মিশ্র মশাই। ষণ্ডা মার্কা লোকটা হয়তো আন্দামানের আদিবাসী হবে। লোকটা লম্বাও আছে বেশ। মাথার লম্বা ঝাঁকড়া চুল।

একটু বাদেই গোবিন্দ মিশ্র রেস্ট হাউসে ঢুকে এলেন। ষণ্ডা মার্কা লোকটা ঠিক কোন দিকে গেল বুঝতে পারলাম না।

গোবিন্দ মিশ্রের হাতে একটা খাম, সাদা রঙের। সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে উনি বলে উঠলেন, 'এই নাও চিঠি। তোমার কাকুর নামে এসেছে।'

'কে দিল?' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

'একটা লোক। আমার হাতে দিয়ে গেল। এর বেশি জানি না।' বলেই উনি মুখের মধ্যে খৈনি পুরলেন।

যে-লোকটার সঙ্গে উনি একটু আগে হাসাহাসি করছিলেন, সে-লোকটা যদি দিয়ে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা বেশ অবাক হওয়ার মতনই। পর্যটকও দেখলাম গোবিন্দ মিশ্রের কথায় একটু নড়ে উঠলেন, কিন্তু মুখে কিছু না বলে ডায়েরি লিখতে বসলেন।

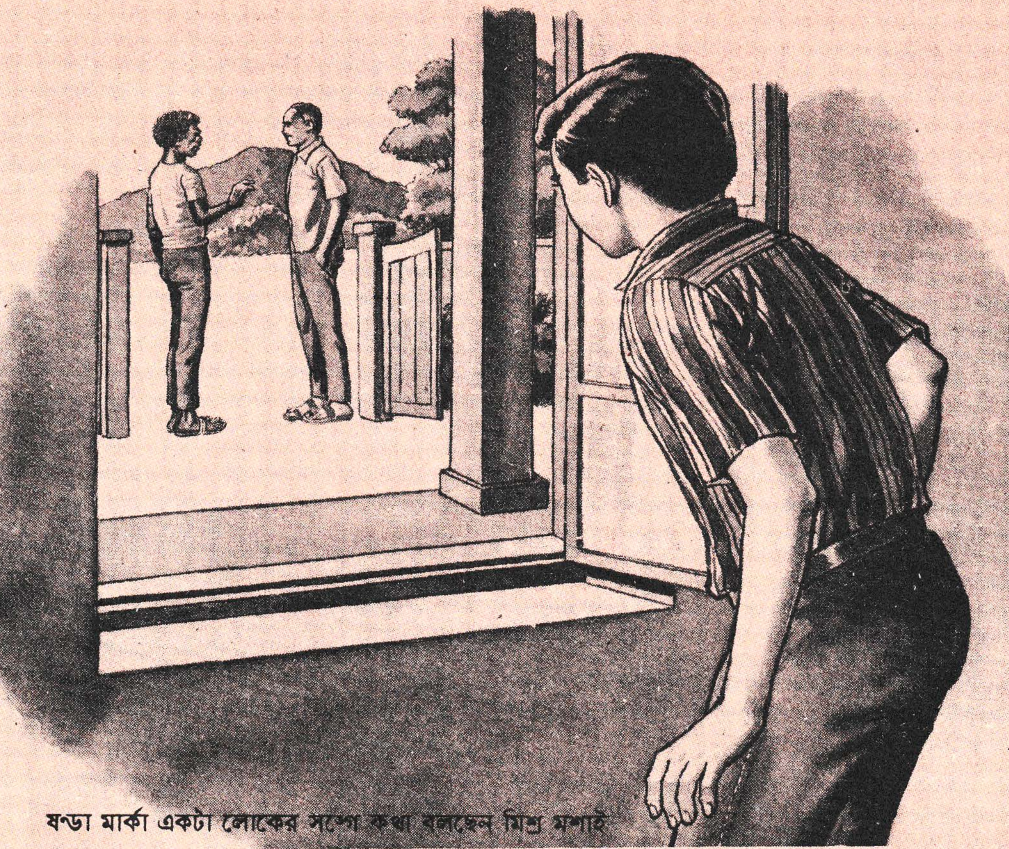

ষণ্ডা মার্কা একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন মিশ্র মশাই

গণেশকাকু রেস্ট হাউসে ফিরে আসার পরে জেনেছিলাম, পত্রলেখক ওঁকে গ্রেট নিকোবরে যেতে নিষেধ করে দিয়েছে। তবে এবারকার পত্রলেখক কালমকর না, তার দূত।

কে এই কালমকরের দূত ? সেই ষণ্ডা মার্কা লোকটা কি ?

অচেনা বন্ধু

আজ সকালেই আমরা গ্রেট নিকোবরে পৌঁছেছি। পথে কোনো বিপদ ঘটেনি। কালমকরের দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎও হয়নি। তবে জাহাজটা যখন 'দশ ডিগ্রী চ্যানেল' পার হচ্ছিল, গণেশকাকু তখন কেবিনে ছিলেন না। সে-সময় একটা দুর্ঘটনা নাকি ঘটতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার জন্য নাকি ঘটতে পারেনি।

বুড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল রাত ন-টা না বাজতেই। আমি তখন পোর্ট ব্লেয়ার থেকে কেনা একটা জার্নালের মধ্যে ডুবে ছিলাম। গণেশকাকু এ-সময় ডেকের ওপর গিয়েছিলেন পায়চারি করতে। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টা খানেক পায়চারি করা ওঁর অনেক দিনের অভ্যাস।

মিষ্টি গন্ধটা হঠাৎই আমার নাকে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার নজর গিয়েছিল কেবিনের দরজার দিকে। একটা লোক দরজার পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে উঁকি মারছিল ভেতরে। আমাকে দেখেই মুখটা সরিয়ে নিয়েছিল সে। আমি ভেবেছিলাম জাহাজের কেবিন-বয় উঁকি মারছে। তাই কোনো গুরুত্ব দিইনি ব্যাপারটায়। আর তার মুখটাও আমি চিনে রাখার চেষ্টা করিনি। যদ্দূর মনে পড়ছে, লোকটার মাথায় ছিল টুপি।

একটু পরে গণেশকাকু কেবিনে ফিরে এসেই বলে উঠেছিলেন, 'ক্লোরোফর্মের গন্ধ না! কেউ ঢুকেছিল ?'

আমি যা দেখেছিলাম, তাই বলেছিলাম। গণেশকাকু তা শুনে মন্তব্য করেছিলেন, 'মিষ্টি গন্ধটা পেয়েই তুমি দরজার দিকে তাকিয়েছিলে বলে লোকটা কিছু করতে পারেনি। যাই হোক, এখন থেকে আরো সতর্ক থাকবে।'

ওই একটা ঘটনা ছাড়া উল্লেখ করার মতন আর কিছু ঘটেনি। তবে হ্যাঁ, সেদিন রেস্ট হাউসের গেটের সামনে দেখা সেই ষণ্ডামার্কা লোকটাকে একবার যেন জাহাজের নাবিকদের মধ্যে দেখেছিলাম। সে-কথা গণেশকাকুকেও বলেছিলাম, কিন্তু উনি তাতে গুরুত্ব দেননি।

অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের (সংক্ষেপে ও.এন.জি.সি.) অফিসটা গ্রেট নিকোবরের পশ্চিম উপকূলে। সেখানেই ও.এন.জি.সি-র লোকেদের অস্থায়ী বাস। গ্রেট নিকোবরের বাসিন্দাদের কাছে জায়গাটা 'গ্যাস-কলোনী' নামে পরিচিত।

আমাদের জাহাজটা ভিড়েছিল গ্যাস-কলোনীর উল্টো দিকে, পূর্ব উপকূলে। এই জায়গাটার নাম ব্যানাম্গা।

জাহাজ থেকে নেমেই আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম পর্বত সিং-এর। সে সরকারী জিপ নিয়ে জাহাজঘাটায় অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। বাবার লেখা একটা চিঠিও ছিল তার সঙ্গে। চিঠিটা সে গণেশকাকুকে দিয়েছিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রিয় গণেশ,

আমি ধরেই নিয়েছি, আমার চিঠি তুমি পেয়ে গেছ, এবং এই জাহাজেই গ্রেট নিকোবরে পৌঁছে গেছ। পত্রবাহকের নাম পর্বত সিং। ও আমাদের ড্রাইভার। কোনো রকম ভয় না করে ওর জিপে চড়েই সোজা চলে আসবে আমার কোয়ার্টারে।

রহস্য বেশ জমে উঠছে। তুমি এলেই সব জানতে পারবে।

অফিসের একটা জরুরি কাজে আটকে আছি বলে তোমাকে আনতে আমি নিজে যেতে পারলাম না। এ-জন্যে মনে কিছু করো না।

শুভেচ্ছাসহ,
প্রভাতদা

চিঠিটা পড়েই বুঝে নিয়েছিলাম, বাবা আমার আর বুড়ির আসার ব্যাপারটা ধারণাই করতে পারেননি। বাবাকে বেশ চমকে দেওয়া যাবে ভেবে মজা লাগছিল।

দুপুরে আমরা রেস্ট-হাউসে খেলাম। গণেশকাকুই সবাইকে খাওয়ালেন।

এত বড়ো বড়ো গলদা চিংড়ি আগে কখনো চোখে দেখিনি। রান্নাটাও হয়েছে চমৎকার! বুড়ি তো একেবারে মুখ জুবড়ে খেল। পর্যটক ভাত মুখে দিলেন না, তার পরিবর্তে দুটো চিংড়ির সদ্গতি করলেন। বললেন, 'ভাবছি, আমার এবারকার বইতে এই চিংড়ি নিয়েই পুরো একটা চ্যাপটার লিখবো।'

খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা, নকুল আলম আর গোবিন্দ মিশ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জিপে উঠলাম। তপন হাজরা চৌধুরী ব্যানাম্গাতেই থেকে গেলেন। কথা দিলেন, দু-এক দিনের মধ্যেই উনি ও.এন.জি.সি. কলোনিতে যাবেন। আমার বাবার নাম-ঠিকানা উনি নোট বইতে টুকে নিলেন।

আলম সাহেবও জানালেন, ভ্রমণ-সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার বাবার ওখানে আসবেন।

নতুন তৈরি পাকা রাস্তা। জিপ ছুটে চললো সেই রাস্তা দিয়ে, রাস্তার দুধারে বসতির চেয়ে বনই বেশি। গাছের ডালে ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে নানা রঙের, নানা জাতের পাখি।

গণেশকাকু বললেন, 'যে-সব পাখি দেখছো, এদের মধ্যে একটা জাত আছে, যারা উড়ে এসেছে মেনল্যান্ড থেকে। নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এদের উড়ে আসার পালা। তারপর ফিরে যাবে যেখান থেকে এসেছে, সেখানে।' তারপর হাত বাড়িয়ে একটা পাখি দেখিয়ে বললেন, 'ওই দেখ, ওই যে পাখিটা ডুমুরগাছের ডালে বসে পাকা ডুমুর খাচ্ছে, ওটা রেয়ার বার্ড। ওর নাম ম্যাগাপোড। শুধু গ্রেট নিকোবরেই আজকাল ও-জাতের পাখি দেখা যায়। আর কোথাও দেখা যায় কিনা, জানা নেই। আর ওই যে সবুজ রঙের পাখিটা দেখছো, ওটা কিন্তু পায়রা।'

পাখি দেখতে দেখতে আমরা এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম যে, কখন যে কী কারণে আমাদের গাড়ির সামনের একটা চাকার টায়ার পাংচার হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি।

সর্বনাশ, এই অচেনা জায়গায়, বনবাদাড়ের মধ্যে এ কী বিপত্তি! এখন আমরা গন্তব্যস্থানে যাব কী করে!

জিপটাকে ব্রেক কষে থামিয়ে দিল পর্বত সিং। তারপর গাড়ি থেকে নেমে ও যেই চাকাটা পরীক্ষা করতে গেছে, অমনি চার-পাঁচজন আদিবাসী ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আদিবাসীরা সবাই সশস্ত্র, অর্ধনগ্ন। পর্বত সিং লড়ার চেষ্টা করলো খুব, কিন্তু বৃথা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওরা ওকে বেঁধে ফেললো।

গণেশকাকুর কাছে রিভলভার ছিল। কিন্তু আদিবাসীদের উনি বাধা দিলেন না। আদিবাসীদের সর্দার হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো আমাদের কাছে। তারপর গণেশকাকুর সামনে একটা কাগজের টুকরো ও মেলে ধরলো। কাগজটায় লেখা শুধু একটা শব্দ : FRIEND, যার মানে 'বন্ধু'।

বন্ধুই হোক, আর শত্রুই হোক, সর্দারের ইশারায় আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। তারপর পাকা রাস্তা ছেড়ে বনের মাঝখান দিয়ে হাঁটাপথ ধরে হাঁটতে লাগলাম, সূর্যকে সামনে রেখে। সর্দার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো।

প্রায় ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর পেছনে তাকিয়ে দেখি, বন্দী পর্বত সিংকে নিয়ে দলের বাকি লোকেরাও হেঁটে আসছে। ওরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

কে ওই আদিবাসী সর্দারটা, যে আমাদের কাছে বন্ধু বলে পরিচয় দিল? ও কি সত্যিই আমাদের বন্ধু? তাই যদি হবে, আমাদের জিপগাড়ির চাকাটা ওরা পাংচার করে দিল কেন? আর পর্বত সিংকেই বা বন্দী করলো কেন?? ওরা আমাদের এখন নিয়েই বা যাচ্ছে কোথায়???

[চলবে]

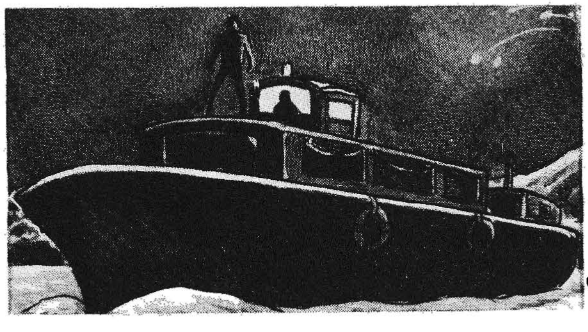

ছবিঃ নারায়ণ দেবনাথ

অংক জগতের জাদু

জাদুকর পি. সি. সরকার
(জুনিয়র)

দর্শকের হাতে কটা তাস ?

এক প্যাকেট তাস টেবিলে রেখে জাদুকর দর্শকদের একজনকে বললেন, তার ওপর দিক থেকে কিছু তাস তুলে নিয়ে গুনে রাখতে। কিন্তু কটা তাস নিয়েছেন তা যেন তিনি গোপন রাখেন। দর্শক কিছু তাস তার হাতে তুলে নেবার পর জাদুকর নিজেও তাসের ওই বাকি অংশটা থেকে কিছু তাস হাতে তুলে নিয়ে গুনে মনে মনে কী যেন একটা হিসেব করলেন। আর তারপর সবাইকে অবাক করে বলে দিলেন দর্শকের হাতে মোট কটা তাস আছে। দর্শকদের খুশি করবার জন্য তিনি বললেন খেলাটাকে আর একবার দেখাবেন। আরও জটিল এবং কঠিন করবার জন্য দর্শককে বললেন, তাঁর হাতের ওই আগের বারে নেওয়া তাসগুলোকে ভালভাবে মেশাতে। নিজের হাতের তাসগুলোকেও তিনি ভালভাবে মেশালেন। ওদিকে টেবিলে রাখা বাকি তাসগুলোকেও আর একজন দর্শককে দিয়ে মিশিয়ে নিলেন। সবকটা তাস তারপর একজায়গায় রাখা হলো। আগের বারের মতই দর্শক তার ইচ্ছে মতো কিছু তাস তুলে নিলেন। জাদুকরও নিলেন কিছু তাস—এবং সেগুলো গুনে হিসেব করে বলে দিলেন, দর্শকের হাতে মোট কটা তাস রয়েছে।

খুব চমকদার ম্যাজিক হলেও এর কৌশল কিন্তু কঠিন নয়। একটা প্যাকেটে জোকার বাদে মোট বাহান্নখানা তাস থাকে। কাউকে তার থেকে কিছু তাস তুলে নিতে বললে দর্শকেরা সাধারণত তার মাঝ বরাবর ভাগ করে অথবা তার চেয়েও কম অংশের তাস তুলে নেন। অর্থাৎ দর্শকেরা সাধারণত ছাব্বিশের কাছাকাছি অথবা তার চেয়ে অনেক কম তাস নিয়ে থাকেন। এই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে জাদুকর ওই প্যাকেটের ওপর থেকে চল্লিশতম তাসটাকে আগের থেকেই দেখে মনে করে রেখেছিলেন। দর্শক তাঁর তাস নেবার পর, জাদুকর এমন পরিমাণের তাস তুলেছিলেন যেন ওই চল্লিশতম তাসটা তাঁর তাসের সঙ্গে চলে আসে। জাদুকর এখন তাঁর হাতের তাসগুলো গুণবার সময় দেখে নেবেন ওই চল্লিশ নম্বর তাসটা তাঁর হাতের তাসের ওপর থেকে কত-তম স্থানে রয়েছে। চল্লিশ থেকে সেই সংখ্যাটাকে বিয়োগ করলেই দর্শকের হাতে মোট কটা তাস রয়েছে তা বুঝতে পারা যাবে। এই হলো ম্যাজিকটার প্রথম অংশের কৌশল। এবার বলছি ম্যাজিকটাকে দ্বিতীয়বার দেখাবার কৌশলটা। একই ম্যাজিক দুবার পর পর দেখানো খুবই বিপজ্জনক। এতে রহস্য ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং দ্বিতীয়বার দেখাবার সময় এর কৌশলটাকে একটু পাল্টে নিতে হবে। এই জন্যই প্রথম দর্শককে বলা হলো তাঁর হাতের তাসগুলো মিশিয়ে নিতে। জাদুকরও তাঁর হাতের তাসগুলো মেশালেন। এবং অন্য আর একজন দর্শককে বলা হলো টেবিলের ওপর রাখা তাসগুলোকে মেশাতে। এই মেশানোর ফলে দর্শকদের ধারণা হলো যে ওই প্যাকেটের মধ্যে আর কোনও হিসেব-টিসেব নেই। এবার জাদুকর ওই দ্বিতীয় ভদ্রলোককে বলবেন তাঁর তাসগুলো টেবিলের ওপর রাখতে। তিনি রাখবার পর তার ওপরে জাদুকর তাঁর হাতের তাসগুলো রাখবেন। আর তার ওপর প্রথম দর্শককে রাখতে দেবেন তাঁর হাতের তাসগুলো। জাদুকর তাঁর হাতের তাসগুলোকে মেশাবার সময় একদম তলার তাসটাকে দেখে রেখেছিলেন। শুধু তা নয়, তাঁর হাতে মোট কটা তাস রয়েছে সেটাও গুনে রেখেছিলেন। প্রথম দর্শকের হাতে কটা তাস আছে সেটাও তাঁর জানা আছে। সুতরাং ওই তলার দেখা তাসটা ওপর থেকে কত-তম তাস হলো সেটা তাঁর জানা রইলো। এবার ঠিক আগের পদ্ধতির মতোই প্রথম দর্শক কিছু তাস তুলে নেবার পর জাদুকর যখন তাস তুলবেন তখন তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে—ওই 'তলায় দেখা' তাসটা যেন নিজের অংশে থাকে। তারপর আগের হিসেবের মতোই হিসেব করলে বুঝতে পারা যাবে দর্শকের হাতে মোট কটা তাস রয়েছে।

[চলবে]

বাঘের ছাল

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চাকরির খাতিরে একসময় প্রায়ই আমাকে দার্জিলিঙ যেতে হতো। অবসর সময়ে ভূটিয়া বাজারে ঘুরতাম বিচিত্র সব জিনিসের খোঁজে। ক্ষুদে ভোজালি, অদ্ভূত ধরনের কাজ-করা ধূপদানি, পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ, গাঢ় নীলরঙ বা ধবধবে সাদা পাথরের মালা ইত্যাদি হরেক রকম জিনিস। কিনতে কিনতে ঐ জাতীয় দোকানদারদের সঙ্গে রীতিমত আলাপ হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে লামার সঙ্গে। দূর থেকে দেখতে পেলেই ডাকতো। 'কবে এলেন ? কেমন আছেন'—এ-সব মামুলি প্রশ্নের পরই নানান ধরনের নতুন নতুন জিনিস বার করে দেখাতো। সেদিনও ঐরকম ওর আহ্বানে ওর কাছে গেছি, দেখি ঢিলে জোব্বা-পরা পাহাড়ী এক ব্যক্তি ওর দোকানের এক কোণে বসে আছে, তার সামনে অদ্ভুত ধরনের একটা বাঘছাল। লম্বায় হাত দুয়েক, চওড়ায় দু-বিঘৎ—সাদা আর গাঢ় হলুদ-মেশানো জমির ওপর কালো কালো ফোঁটার দাগ —সঙ্গে হাঁ-করা একটি ছোট বাঘের মুখ। বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হলুদের সঙ্গে মেশানো সাদা জমিন। ঐ সাদা ব্যাপারটা না থাকলে ওটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো না। আমি এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলাম। লামা কিন্তু একটা অদ্ভূত ধরনের চামর আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল ঐ চামরটা আমাকে বিক্রি করা। কিন্তু আমি তন্ময় হয়ে বাঘের ছালটা লক্ষ্য করছি দেখে থমকে থেমে গেছে। আমি বাঘের ছালটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দাম কতো ?

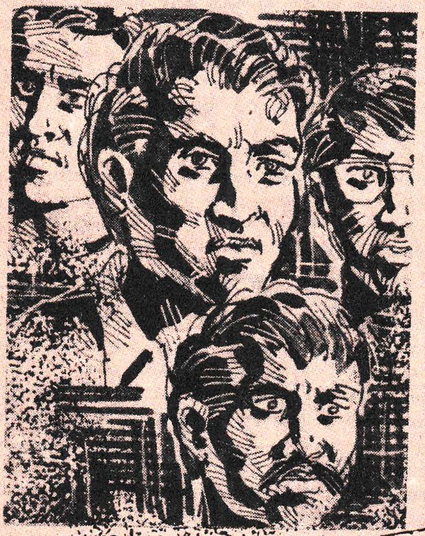

লামা নয়, উত্তর দিলো সেই পাহাড়ী লোকটা, টোয়েন্টি লুপিজ।

আমি আর দেরি করলাম না, সঙ্গে সঙ্গে দুটি দশ টাকার নোট বার করে ওর হাতে দিলাম। এত সহজে সওদা মিটে যাবে লোকটা বোধ হয় ভাবতে পারেনি, সে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। তারপরে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে তার কোমরের গোঁজে পুরতে পুরতে উঠে দাঁড়ালো, আর তার পরেই পিছন ফিরে দ্রুত পায়ে মিশিয়ে যেতে লাগলো অন্য সব পথিকদের ভিড়ে। লামা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, লোকটা চলে যেতেই বললে, ওটা এক কথায় কিনে ফেললেন বাবু ?

—কেন, ভাল নয় জিনিসটা ?

লামা বললে, একেবারেই না। এ-রকম একটা মাত্র আছে, এখানকার মিউজিয়ামে। এগুলোকে ঠিক চিতা বলা যায় না, একধরনের ছোট বাঘ। আবার কেউ কেউ বুনো বেড়ালও বলে।

—ছালটার মজা দেখেছো ? হাত-পা-লেজের ছালও আছে, সঙ্গে মাথাটা রেখেছে আস্ত। যেন রেগে কাউকে কামড়াতে যাচ্ছে ! দেখেছো দাঁত ? এ-তো বেড়াল নয়, বাঘই হবে।

লামা বললে—যান, ওপাশের দোকান থেকে একটা থলি কিনে আনুন, তাতে ওটা পুরে ফেলুন। তারপরে বলছি।

ওর কথামতো তাই করলাম। বাঘের ছাল থলির মধ্যে অদৃশ্য হবার পর লামা মুখ খুললো। বললো—ওই বাঘের ছালি নিয়ে পাহাড়ীদের একটা সংস্কার আছে। সে সংস্কারের কথা এদিককার লোক সবাই জানে। সেজন্য স্থানীয় কোনো লোক ওটা কিনতে এগিয়ে আসতে চাইবে না। আপনি কলকাতার লোক বলেই পারলেন। এ-বিষয়ে কিছু জানেন না বলেই পারলেন!

ওর দোকানের প্রান্তে এবার জাঁকিয়ে বসে প্রশ্ন করলাম, বলো তো শুনি, সংস্কারটা কী? বললে—এই বাঘের ছাল সচরাচর কারুর সয় না। পাহাড়ীরা বিশ্বাস করে, এ-শুধু সইবে তাদের ভাগ্যে, যারা সাচ্চা আদমী। আপনি যদি সাচ্চা আদমী হন, তাহলে এটা তো আপনাকে সইবেই, তার ওপর এনে দেবে সৌভাগ্য।

—বলো কী!

—হ্যাঁ বাবু।

বললাম—কিন্তু এ-যুগে সাচ্চা আদমী কোথায়? আমরা তো সবাই মিথ্যের জাসু।

লামা বললে—এক ধরনের মিথ্যে কথা আছে, যা সত্যেরই সামিল। আমাদের শাস্ত্রও সে-কথা বলেছে। যদি কাউকে বাঁচাবার বা উপকারের জন্য আপনাকে মিথ্যে বলতে হয় তাহলে সেটা আর 'মিথ্যে' থাকে না, হয়ে দাঁড়ায় সত্য। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা কী দেখছি? লোকের ক্ষতি করবার জন্যই আমরা 'মিথ্যে' বলছি। ওই মিথ্যেটাই পাপ। পাপ হিংসে করাটা, পাপ মানুষের অনিষ্ট-চিন্তা করাটা। আর, ওই পাহাড়ীরা বলে, সব থেকে বড়ো পাপ, মানুষের নামে মিথ্যে রটনা করা। অনেক সময় হিংসের মাথায় এটা আমরা করে থাকি। কারুর নামে মিথ্যে রটনা করা, নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া বা নির্দোষ ব্যক্তির নামে অপবাদ দেওয়া, যে চোর নয়, তাকে 'চোর' বলা, যে 'সৎ' তাকে লোকচক্ষে 'অসৎ' বলে দাঁড় করানো, এগুলোই হচ্ছে জঘন্য পাপ। এই জঘন্য পাপ যারা করে, তাদের এই বাঘের ছালটা সইবে না, ক্ষতি করবে।

সত্যি বলতে কি, ওর কথা শুনতে শুনতে নিজের অন্তরের দিকে নিজের অগোচরেই বুঝি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলাম। আমি কি ও-ধরনের 'মিথ্যে' কাউকে বলেছি, করেছি কি কারুর অনিষ্ট চিন্তা? হিংসের বশবর্তী হয়ে কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে কি শাস্তি দিয়েছি, কোনো নির্দোষ ব্যক্তির নামে কি অপবাদ দিয়েছি? যে চোর নয়, তাকে কি কখনো চোর আখ্যা দিয়েছি? যে সৎ তাকে কি কখনো অসৎ বলেছি? হিংসের জ্বালায় কারুর নামে নিন্দা রটনা করে তাকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজেকে কি বড়ো বলে জাহির করার চেষ্টা করেছি? ঠিক এই মুহূর্তে এ-সব পাপের কথা আদৌ মনে পড়লো না, তাই আত্মপ্রসাদে ভরপুর হয়ে বাঘের ছালকে থলিতে পুরে আমার আস্তানায় ফিরে এলাম বা উঠে এলাম বলা চলে। ভুটিয়া বাজার নিচে, আর আমি উঠেছি 'মেডো ব্যাঙ্ক'-এর একটি স্যুটে, যেটা ভুটিয়া বাজার থেকে অনেক উঁচুতে। আমার একার জন্যই ঐ স্যুট, সংগে শুধু বেয়ারা। কিন্তু এখানে আসার প্রথম দিনেই 'ম্যাল'-এ আমার এক বন্ধুর সংগে দেখা। সে আমার সংগলাভের জন্য হোটেল ছেড়ে আমার আস্তানায় এসে হাজির। পাশাপাশি দুখানা খাট। অসুবিধে হবার কথা নয়। বেয়ারা শুয়েছে পাশের খালি মতন একটা ঘরে।

বন্ধুর নাম প্রদীপ। প্রদীপ সব শুনে বললে—বোগাস! এসব আবার হয় নাকি! যত সব কুসংস্কার! দেখি, ছালটা কেমন?

কিন্তু ছালটা বার করে ওর হাতে দিতে ও সেটা উলটে-পালটে দেখে নিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে গেল, বললে—কী জানি বাবা! দেখলে কেমন গা ছমছম করে!

বলে, ছালটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে ও ওর কাজে চলে গেল। আমি ওটাকে তুলে আলমারির মাথায় রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু যেদিন কলকাতা রওনা হবো, সেদিন জিনিসপত্র গুছোতে গিয়ে ছালটা আর পেলাম না। আলমারির মাথা, আলমারির ভেতর—সব তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, ছালটা নেই! ওদিকে, কিছুক্ষণ পরেই জিপ আসবে, তাতে করে কলকাতার ট্রেন ধরবার জন্য ছুটতে হবে শিলিগুড়ি! আমার বন্ধু আর আমি তন্ন তন্ন করে তখনো খুঁজছি, এমন সময় বেয়ারাটা এলো কাঁদতে কাঁদতে! কী করতে যেন বাইরে গিয়েছিল, হঠাৎ আছাড় খেয়ে প'ড়ে হাত-পা কেটে অস্থির। একজন লোক ধরে ধরে আমাদের কাছে দিয়ে গেল! হয়ে দাঁড়ালো আর এক সমস্যা, কোথায় ডেটল, কোথায় ব্যান্ডেজ, কোথায় তুলো! এই মুহূর্তে ডাক্তারই বা কোথায়! এই সব ভেবে কাতর হচ্ছি, এমন সময় আমাদের জিপ এসে হাজির। জিপটাকে অদূরে রেখে ড্রাইভার এসেছিল আমাদের ডাকতে। আমাদের অবস্থা দেখে ড্রাইভার এগিয়ে এসে বেয়ারাকে জিপে উঠিয়ে নিচে কোনো হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখান থেকে ড্রেস-ট্রেস করিয়ে ওকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলো। ততক্ষণে আমরাও তৈরি হচ্ছিলাম। প্রদীপ কী মনে করে বেয়ারাকে গিয়ে এক ধমক, হঠাৎ বেরিয়েছিলে কেন? আর বেরিয়েছিলে যদি, জল নেই কাদা নেই, আছাড় খেলে কী করে? দেখো দেখি, কী দেরিই না হয়ে গেলো! এখন শিলিগুড়িতে গিয়ে সময়মতো ট্রেন ধরতে পারলে হয়!

ড্রাইভার শুনে বললে, কোনো চিন্তা নেই, আমি পাংখাবাড়ি রোড দিয়ে শর্টকাট করে আপনাদের নিয়ে যাবো!

পাংখাবাড়ি রোড যে কী জিনিস তা আমার জানা ছিল, বেয়ারাও পুরোনো লোক, তারও অজানা নয়। কার্শিয়াং থেকে যে রাস্তা ধরতে হয়, সে রাস্তায় বাঁক বেশি, ঘন ঘন বাঁক আর রাস্তাও সরু। পাকা ড্রাইভারেরও ও-পথে যেতে গেলে হাত কাঁপে!

কথাটা শুনে বেয়ারার মুখ শুকিয়ে গেল, সে খানিকক্ষণ

ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপরে যেন আঁৎকে উঠলো, বললে—পাংখাবাড়ি দিয়ে যাবো না বাবু, নির্ঘাৎ অ্যাকসিডেন্ট হবে!

বলতে-বলতে সে এগিয়ে গিয়ে তার শতরঞ্চি বাঁধা পুঁটলিটা খুললো, বেরিয়ে পড়লো সেই বাঘের ছাল। সেটা নিয়ে আমার পায়ের কাছে রাখলো, বললো, মাপ করুন বাবু, আমি লোভ সামলাতে না পেরে এই বাঘের ছালটা নিয়েছিলুম। আর সেজন্যই আমার এই পাপের শাস্তি।

কথা আর বিশেষ না বাড়িয়ে বাঘের ছালটা আমার জিম্মায় নিয়ে সবাই মিলে জিপে উঠলাম। বেয়ারার আতঙ্ক কিন্তু যায়নি, তাকে জোর করে জিপে ওঠাতে হলো। বললাম—ওটা যখন আমার কাছে দিয়ে দিয়েছো, তখন আর ভয় কী!

কিন্তু কলকাতাতে এসে ঘটলো বিপর্যয়। আমার বড়ো ছেলেটার হঠাৎ হলো বিষম জ্বর, তার অসুখ ছাড়লো তো, ছোট ছেলেটা পড়লো প্রবল জ্বরে। সে উঠলো তো, তার মা পড়লো। আমি অবশ্য বাসায় এসে বাঘছালের রহস্য উদ্ঘাটন করিনি, কিন্তু বাড়িতে ক্রমাগত অসুখ হতে থাকায় আমার স্ত্রীই বললে—বাঘছালটাকে ফেলে দাও, ওটার জন্যই জ্বর হচ্ছে, ওটাই অপয়া!

যখন সে এ-কথা বলে, তখন তারও প্রবল জ্বর। সে বলতে লাগলো—ওটা দেখলেই ভয় করে! কী রকম হাঁ করে আছে দ্যাখো না! আমাদের সবাইকে গিলে খাবে! কাউকে আস্ত রাখবে না!

এদিকে ডাক্তার আসছে-যাচ্ছে, কিন্তু আমার স্ত্রীর আর জ্বর ছাড়ছে না! ছেলে দুটি সেরে উঠেছে বটে, কিন্তু দারুণ রোগা হয়ে গেছে, ভালো করে খায়-দায় না, কেমন যেন অস্বাভাবিক নির্জীব! এসব দেখে শুনে আমারও ভয় হলো। প্রদীপ একদিন দেখা করতে আসতেই ওকে দিয়ে দিলাম বাঘের ছালটা। প্রদীপ কুসংস্কারের কথাটা জানতো, বললো—কেন হে? তোমার সইছে না কেন? মিথ্যে বলে কাউকে শাস্তি দিয়েছিলে নাকি? না কোনো সৎ লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যে কুৎসা প্রচার করেছিলে?

এদিকে বাঘছালটা চলে যাবার পর ঘণ্টাখানেক বাদেই আমার স্ত্রীর জ্বর ছেড়ে গেল। দেখতে দেখতে আমার ছেলেরাও তাদের স্বাস্থ্য ফিরে পেলো, গৃহিণীও আগের মতো সুস্থ হয়ে কাজকর্ম করতে লাগলো। আমরা যেন কেমন নিবিড় দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি!

মনে মনে স্বস্তি লাভ করেছি, এমন সময় ঘটলো আর এক অঘটন! উস্কো-খুস্কো চেহারা, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, একদিন প্রদীপ এসে হাজির। বললে—সর্বনাশা তোমার ঐ বাঘের ছাল! যেদিন থেকে ঘরে ওটা নিয়েছি, সেদিন থেকে একটা-না-একটা উৎপাত লেগে আছে! মা বঁটিতে হাত কাটলেন, ভাইপোটা সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা ভাঙলো, আমার বউদির হলো একশো চার জ্বর, সে জ্বরের আর কমবার লক্ষণ নেই!

—তারপর!

মাপ করুন বাবু, আমি লোভ সামলাতে না পেরে এই বাঘের ছালটা নিয়েছিলুম

প্রদীপ বললে—আমিও রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গেছি! সেজন্য বাঘের ছাল আমার পাশের বাড়ির প্রতিবেশী সুবোধবাবুকে দিয়ে দিয়েছি! দেখি, তিনি আবার সাচ্চা লোক কিনা!

—তোমার সইলো না কেন!

প্রদীপ বললে—মনের অগোচরে পাপ নেই। আমার আগের চাকরিটাতে আমি এক নির্দোষ ব্যক্তির নামে 'চোর' অপবাদ দিয়ে তাকে ল্যাং মেরেছিলুম নিজে ওপরে ওঠবার জন্য! না হে, এখন দেখছি, পাহাড়ীদের সংস্কারটা অসত্য নয়! বাঘছালটা সত্যিই সাংঘাতিক! একে একে লোকের মুখোশ খুলে দিচ্ছে!

প্রদীপ চলে গেল, কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা কথা ঘুরপাক খেতে লাগলো। ও বললে, ওর আগের চাকরিতে ও একটা লোককে মিথ্যে 'চোর' অপবাদ দিয়ে তার ক্ষতি করেছিল। এই কথায় আমার নিজেরও মনে পড়ে গেল আমার আগের চাকরির কথা। এখন যে পায়াভারি বড়ো চাকরি আমি করছি, তার আগে আমি একটা কলেজে শিক্ষকতা করছিলাম। বেশ মনে আছে, কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের টেস্ট পরীক্ষার একটি দিনে, সেদিন ছিল সংস্কৃত পরীক্ষা, আমি একটি ছেলেকে ধরে তাকে নিয়ে গিয়ে প্রিন্সিপালের কাছে সঁপে দিয়েছিলাম, সে-দিনের সে-পরীক্ষা সে আর দিতে পারেনি। দূর থেকে ছেলেটির চোখের চাউনি দেখে আমার কীরকম সন্দেহ হলো, সে মাথা নিচু করে তখন লিখে চললেও আমি খপ করে তার খাতা আঁকড়ে ধরে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। ছেলেটা অবাক হয়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়েছিল, তারপরে যখন বললাম, 'চলো প্রিন্সিপালের কাছে'—তখন সে অপ্রস্তুতের মতো দু-একটা কথা কী যেন বলেছিল, কিন্তু আমি তাতে কান দিইনি, সোজা তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম প্রিন্সিপালের কাছে। মনে আছে, তাকে ঐভাবে নিয়ে যেতে দেখে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা ভয়ানক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমার কীরকম রোখ চেপে গিয়েছিল, তার কাছে অবশ্য কোনো বই বা অন্য কোনো কাগজের টুকরো ছিল না, শুধু ছিল একটা ব্লটিং পেপার, যেটা ছাত্রদের খাতার সঙ্গে তখনকার দিনে দেওয়া হতো। সেই ব্লটিং পেপারে কী একটা শব্দ ইংরেজীতে লেখা ছিল, তা-ও কালি দিয়ে কাটা, পড়তে পারা যায় না। এ-সব দিক দিয়ে তাকে ধরবার মতো কিছু প্রমাণপত্র ছিল না, কিন্তু তার চোখ? ঐ চোখের কেমন অপরাধী-অপরাধী চাউনিই আমাকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। তখন কলেজে আমিও নতুন, তার ওপরে দ্বিতীয় বর্ষের ঐ সব ছেলেদের আমি চিনতুমই না! আমাকে তখন কলেজে যে-রকম করেই হোক 'নাম' করতে হবে, সুতরাং ঐ মওকা আমি ছাড়বো কেন? পরে প্রিন্সিপাল আমাকে বলেছিলেন—আপনি সিওর তো যে, ও টুকছিল? কেন না, একটি ব্লটিং পেপারে একটা ইংরেজী শব্দ লেখা, মিলিয়ে দেখেছি ওর নিজেরই হাতের লেখা—তা-ও কেটে দিয়েছে। বোধ হয় ইংরেজীতে কোনো ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে ঐ শব্দটার বানান ঠিক হচ্ছে কিনা, তা বোঝবার জন্য খাতায় লেখবার আগে ব্লটিং-এ লিখেছিল। এ-রকম ভাবে ছেলেরা লিখেই থাকে।

—কিন্তু স্যার, ওর চোখের ঐ চাউনি?

প্রিন্সিপাল বললেন—তা বলতে পারি না। ক্লাশে খোঁজ নিয়ে জানলুম ছেলেটা ভালো ছাত্র। ওর নিষ্কলঙ্ক জীবনে আপনি সর্বসমক্ষে কালি ঢেলে দেবেন না তো?

কিন্তু আমার সেই এক উত্তর—ওর চোখের ভীতু ভীতু সেই চাউনি—?

—শুনুন, প্রিন্সিপাল বললেন, ওর খাতাটা পড়ে দেখেননি তো?

—আজ্ঞে না।

প্রিন্সিপাল বললেন—পড়লে বুঝতে পারতেন। প্রশ্ন ছিল মৃচ্ছকটিক থেকে যেটা ও লিখেছিল, সেটা ঐ মৃচ্ছকটিকের কাহিনী-ঘটিত একটা ব্যাখ্যা। তাতে একটা চোরের কথাই ছিল। অনেকে আছে, যে ভাবে যখন ভাবিত হয় তখন তার মধ্যে সেই ভাবটাই ফুটে উঠে। এইসব ছেলেরাই বড়ো হয়ে সাহিত্যিক হয়, কবি হয়, কিংবা, উঁচুদরের শিল্পী বা অভিনেতা হয়।

আমি কথা বলিনি, চুপ করে ছিলাম।

প্রিন্সিপাল বলেছিলেন—সে যাই হোক, সত্যিকার প্রমাণ-পত্র যখন নেই, তখন আমি ওকে টেস্টে অ্যালাউ করবো, যদি অন্যান্য সব পেপারে ভালো রেজাল্ট করে থাকে। কিন্তু এ-সব করলেও কলঙ্ক থেকে ওকে বাঁচাতে পারবো না! সারা কলেজের ছাত্রসমাজে ওকে নিয়ে টি-টি পড়ে গেছে! কারণ, ও যে নকল করে পরীক্ষা দেবে, এ তাদের কাছে ছিল অবিশ্বাস্য! সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তিকে আপনি এই শাস্তি দিলেন না তো?

সেদিন কোনো উত্তর দিইনি, নিজের জেদকেই আঁকড়ে ধরে ছিলাম, কারণ, ভেবেছিলাম 'কড়া শিক্ষক' বলে আমার নাম অচিরেই ছড়িয়ে পড়বে। সত্যি কথা বলতে কী, ছড়িয়েও পড়েছিল তাই, ছাত্ররা আমাকে ভয়ও করতে আরম্ভ করেছিল অসম্ভব! কিন্তু ঘটনাচক্রে বেশিদিন শিক্ষকতায় যুক্ত থাকতে পারলাম কই? চলে এলাম আরও ভালো মাইনের ভালো চাকরিতে—কিন্তু আজ প্রদীপের কথা শুনে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে—সেদিনকার সেই সুধীর দত্তকে তুমি বিনাদোষে শাস্তি দাওনি তো?

সেদিন কথাগুলো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ প্রদীপের সঙ্গে কথা বলার পর কেমন যেন একটা অপরাধ-বোধ মনের মধ্যে চেপে চেপে বসতে লাগলো। আমি কি সেদিন সত্যই নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েছিলাম, তাই কি বাঘের ছালটা আমার সহ্য হচ্ছিল না?

ওদিকে সেই বাঘের ছালটা নিয়ে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছিল। প্রদীপ যাঁকে ছালটা দিয়েছিল, সেই ওর প্রতিবেশী সুবোধবাবু খোদ তাঁর মোটর সাইকেলে অ্যাকসিডেন্ট করে হাসপাতালে,

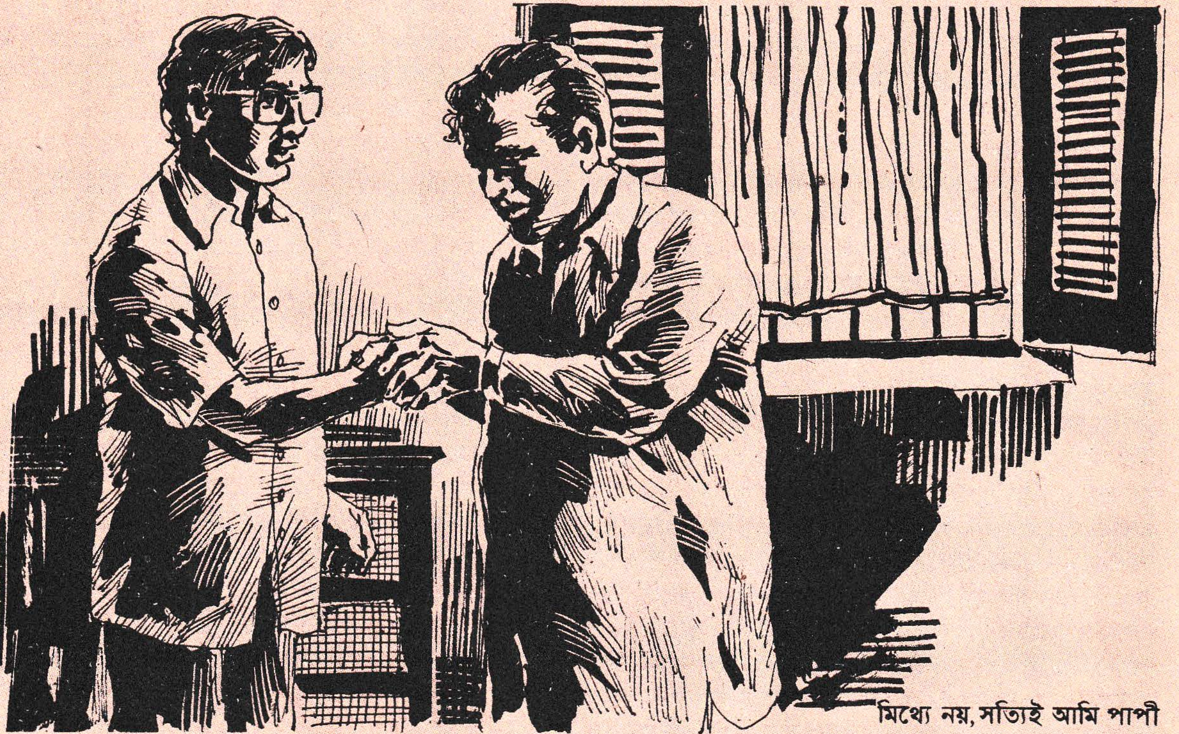

মিথ্যে নয়, সত্যিই আমি পাপী

তাঁর বউও রান্না করতে গিয়ে হঠাৎ হাত পুড়িয়ে ফেলেছে! প্রদীপ গিয়েছিল তাঁকে দেখতে। ভদ্রলোকের ভালো হয়ে বাড়ি আসতে আসতে লেগে গেল তিন সপ্তাহ। এসেই তিনি ওটা পাচার করলেন তাঁর এক সহকর্মীকে, সত্যেন কর্মকার তার নাম, টালিগঞ্জের ওদিকে থাকে। সুবোধবাবু 'বাঘের ছাল'-ঘটিত কুসংস্কারের কথা কিছু জানতেন না, কারণ প্রদীপ তাঁকে বলেনি। সেজন্য সুবোধবাবু ওকে বলেছিলেন, কী জিনিসই না দিলে ভাই! কপালে সহ্য হলো না।

এই কথার পর প্রদীপ আর থাকতে পারেনি, সব কথা ওঁকে খুলে বলেছিল। শুনে গুম হয়ে গিয়েছিলেন সুবোধবাবু। তারপরে প্রদীপের হাতটা আঁকড়ে ধরে সজল চোখে বলেছিলেন—মিথ্যে নয়, সত্যিই আমি পাপী। আমার নিজের বড়দা, যিনি দেশ থেকেই আমাদের ভাইবোনদের লালন-পালন করেছিলেন, নিছক হিংসের বশবর্তী হয়ে তাঁর নামে কুৎসা গেয়ে আমার মেজদাকে আমি চিঠির পর চিঠি লিখে তাঁর মন ভাঙাবার চেষ্টা করেছি! আমার কথা শুনে, মনে আছে, বড়দার নিজের ভাড়া-করা বাড়িতে, মেজদা (মেজদা বাইরে চাকরি করতো তখন, ছুটিতে কলকাতা এসেছিল) তুচ্ছ একটা অছিলা বার করে বড়দাকে লোহার রড দিয়ে মারতে গিয়েছিল! আজও বড়দাকে আমি অনর্থক হিংসে করে চলেছি! তিনি কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না, নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আমার বাপ ছিলেন খেয়ালী লোক, সারাজীবন কোনো কাজটাই তিনি আঁকড়ে থাকেননি, সংসারও দেখতেন না, সংকটের দিন এলে পালিয়ে থাকতেন, ঘরে আসতেন না। সেজন্য খুব ছোট বয়স থেকেই বড়দার ঘাড়ে পড়েছিল সংসার। বাবা কিছু রেখে যাননি, না বাড়ি না ঘর, সে বড়দা আমাদের কোনো সম্পত্তি কেড়ে নেবে, তবু কেন যে অহেতুক তাঁকে হিংসে করতুম তা জানি না! সেই পাপেই আজ আমার এই শাস্তি!

এর পরের ঘটনা সত্যেন কর্মকারকে নিয়ে। ইনি কলতলায় পিছলে পড়ে হাত ভাঙলেন। এঁরও পাপ ছিল। ইনি মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে জেলে পাঠাতে সাহায্য করেছিলেন।

সত্যেনের পর বাঘছাল গেল ঐ টালিগঞ্জেরই এক বাসিন্দার কাছে, বাসুদেব ঘোষাল। ইনি অবস্থাপন্ন ঘরের লোক। বসবার ঘরে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলেন বাঘের ছালটা। আমার আর প্রদীপের কীরকম যেন নেশা ধরে গিয়েছিল, বাঘছালটা কোথায়-কোথায় যায়, কার-কার কাছে যায়, কী ঘটনা ঘটায়, সব খোঁজ রাখতুম। এমন কী ঘটনার কথা শুনে পায়ে-পায়ে চলে যেতাম দুজনে, সেই ঘটনাস্থলে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, বাঘছালটা যাঁদের কাছে যাচ্ছে, তাঁদের সবারই কোনো-না-কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে, আর তারপরে আমাদের কাছে আসল কথা শুনে তাঁরা তাঁদের অপরাধের কথা কবুল করছেন। আমরা সদ্য-পরিচিত, তবু আমাদের কাছে দোষ-

স্বীকার করতে তাঁরা দ্বিধা করছেন না, আমাদের শুধু একটিই প্রশ্ন, সাচ্চা লোকের কি দেখা পাবো না ? এমন একটা লোকের হাতে গিয়ে বাঘছালটা কি পড়বে না, যিনি কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ক্ষতি করেননি বা সৎ-লোকের নামে নিন্দা করেননি ?

বাসুদেব ঘোষালের দুর্ঘটনাই হয়েছিল সব থেকে মারাত্মক। তাঁর নিজের গাড়ি ছিল। সেই গাড়িতে হলো অ্যাকসিডেন্ট। ওঁর জ্ঞানহারা রক্তাক্ত শরীরটাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন অনেকেরই সন্দেহ ছিল, উনি এ-যাত্রা ফিরবেন কিনা ! কিন্তু ফিরেছিলেন। দেখা গেল, বাঘের ছাল কাউকে শেষ পর্যন্ত প্রাণে মারছে না, অনুতাপ করার সুযোগ দিচ্ছে।

বাসুদেব ঘোষাল ব্যবসায়ী মানুষ। কলকাতা তাঁর ব্যবসার কেন্দ্র, কিন্তু তাঁর তিন-চারটে শাখা অফিস ছিল নানান জায়গায় ছড়িয়ে। তাঁর এমনি এক শাখার ম্যানেজারকে তিনি মাত্র লোকের কথা শুনে চুরির অপবাদ দিয়ে বরখাস্ত করেছিলেন, এমন কি, তাঁর দু-মাসের মাইনে পর্যন্ত তিনি দেননি। ভদ্রলোক ছিলেন সত্যি ভালোমানুষ, তিনি দুর্বিষহ অপমান সহ্য করেও কোনো পালটা আঘাত করেননি, স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে সেই টাকা থেকে ধার-দেনা শোধ করে ট্রেনের ভাড়া সম্বল করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবার পর বাসুদেবের অন্তর অনুতাপের আগুনে পুড়ে মরছিল।

এঁর কাছ থেকে বাঘের ছালটা যায় ঐ টালিগঞ্জেরই এক অতি সাধারণ রিক্সাচালকের কাছে। কিন্তু বাঘের ছালটা নিয়ে যাবার পাঁচ দিন কেটে যাবার পরও যখন কোনো দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন আমি আর প্রদীপ সটান চলে গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু দেখেই চমকে উঠলাম। এ যে সেই সুধীর দত্ত ! যাকে পরীক্ষার হল থেকে আমি জোর করে উঠিয়ে দিয়েছিলাম ! প্রথমে ভেবেছিলাম আমাকে বোধ হয় চিনতে পারবে না। কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছে ! চিনতে পেরে রিক্সায় উঠিয়ে আমাদের দুজনকে নিয়ে গেল ওর বাড়ি।

বাড়ি মানে ঝুপড়ি–দরমা-ঘেরা দুটি পাশাপাশি ঘর আর ছোট বারান্দা, একটু উঠোন। চারপাশে নতুন নতুন বাড়ি উঠে যাচ্ছে, তার মধ্যে এইরকম 'কয়েক ঘর ঝুপড়ি' যে এখনো কী করে টিকে আছে, সেটাই আশ্চর্য !

বললাম–সুধীর, কলেজে তুমি ছিলে ভালো ছাত্র ! তোমার এ কী পরিণতি ! শেষকালে রিক্সা টানছো ?

সুধীর উত্তর দিলে –ভালো আর কী করে বলবেন স্যার ! আমি সংস্কৃতে লেটার পাওয়া ছেলে হয়েও কলেজে সংস্কৃতে টেস্ট পরীক্ষায় বসে নকল করছিলুম ! তাই না আমাকে আপনি উঠিয়ে দিয়েছিলেন !

উত্তেজনায় ওর হাতটা আঁকড়ে ধরলাম, বললাম–আজ বলো তো সুধীর, সত্যিই কি সেদিন তুমি নকল করেছিলে ?

CHELTENHAM BOLD
CONDENSED

No. 241　3·5 kg
36 Point
TYPES OF
quality 123

No. 242　3 kg.
30 Point
NEW MODEL
designs 12345

No. 243　2·7 kg.
24 Point
FORGIVENESS IS
a high quality 1234

No. 244　2 kg.
14 Point
TELL ME YOUR COMPANION
and I will tell you what you 12

No. 245　1·8 kg.
12 Point
JUDICIOUS MAXIMS OUGHT TO
be kept in view and frequently
analysed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

No. 246　1·5 kg.
10 Point
THIS IS A GOOD CHARACTER OF
type which is absolutely useful in every
printing office 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

No. 247　1·4 kg.
8 Point
THIS BEAUTIFUL DESIGN IS EFFECTIVE
and bold and will pay the printer for keeping
it in his mind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

No. 248　1 kg.
6 Point
IF YOU WISH TO ATTRACT NEW CUSTOMERS
turn out all old type faces and re-place them with
our up-to-date ypes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

PLEASE CONTACT :–
BARODA TYPE FOUNDRY
22/5B, Jhamapooker Lane Cal - 9

হাতটা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে সুধীর বললে—না স্যার— আপনারই ভুল হয়েছিল!

বলে উঠলাম—কিন্তু কী জানো? তোমার চোখের দৃষ্টিতে—

বাধা দিয়ে সুধীর বললে, সেই যে একটা কথা আছে না? গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়! আমারও তাই। আমি যখন যেটা ভাবি, তখন সেটা আমার মুখে-চোখে সহজেই ফুটে ওঠে! আমি লিখছিলাম মৃচ্ছকটিকের চোরের কাহিনী তাই বোধ হয় ঐ ধরনের কোনো দৃষ্টি ফুটে থাকবে আমার চোখে! আপনি তখনো কলেজে ঢোকেননি, তখন নবাগত ছাত্রদের স্বাগত জানাবার জন্য যে থিয়েটার হয়েছিল, তাতে আমি একটা পার্ট করে খুব সুখ্যাতি পেয়েছিলাম! হয়ত লেগে থাকলে—

আমি আবার ওর হাতটা আঁকড়ে ধরলাম—তুমি এই রিক্সাচালক হলে কী করে?

সুধীর আবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—প্রিন্সিপাল আমাকে টেস্টে অ্যালাউ করেছিলেন, কিন্তু নিদারুণ ঘৃণায় আমি আর পরীক্ষা দিইনি। কলেজী শিক্ষার ধারে-কাছেও আর যাইনি আমি। কিন্তু সংসারে বাপ নেই, পেট তো চালাতে হবে? তাই শেষ পর্যন্ত এই সাইকেল রিক্সাই আমার গতি করলো। এখন সংসারে মা-ও নেই, আছে আমার দিদি। পয়সার অভাবে তার বিয়ে দিতে পারছি না! সেটা দিতে পারলেই—

প্রদীপ নির্বাক হয়ে এতক্ষণ সব শুনছিল, এবার বললে—তুমি একটা বাঘের ছাল পেয়েছো না?

—হ্যাঁ।

—রেখে দিয়েছো তো ওটা?

—হ্যাঁ।

প্রদীপ তখন বাঘের ছাল সম্বন্ধে যা ওকে জানাবার তা জানালো। বললে, তোমার এই ভূতপূর্ব শিক্ষকমশায় থেকে আমরা সবাই ভুক্তভোগী। সাচ্চা মানুষ না হলে ওটা কারুর সয় না, উলটে ক্ষতি করে। তুমি একটু সাবধানে থাকবে।

সুধীর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে, থাকব।

আমরা চলে এসেছিলাম। কিন্তু দিনকয়েক পরেই আমার অফিসে বসে হঠাৎ ফোন পেলাম সুধীরের। বললে—একটা ঘটনা ঘটেছে স্যার। সন্ধ্যার পর আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। গিয়ে সব বলবো।

বলেই সে রেখে দিয়েছিল ফোনটা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম প্রদীপকে। বললাম—সন্ধ্যার পর আমার বাড়িতে এসো। বাঘের ছাল আবার বুঝি কোনো ঘটনা ঘটিয়েছে! হয়ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে! ফোন করেছিল সুধীর দত্ত। হয়ত ওর দিদির কোনো—

প্রদীপ উত্তরে জানালো—ভয় নেই, প্রাণে তো আর মারবে না বাঘের ছাল। অনুতাপের সুযোগ দেবে!

অফিসের পর যথারীতি বাড়ি ফিরে উদ্বিগ্ন হয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ পরে এলো প্রদীপ, তারপরে এলো সুধীর দত্ত।

না, সে রিক্সা চালিয়ে আসেনি। এসেছে বাসে। তার নিজের যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি এ তো তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তাহলে ঘটনা নিশ্চয়ই ওর দিদির? আমরা ওর কথা শোনবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রইলাম।

সুধীর বললে—বাঘের ছাল কোনো দুর্ঘটনা ঘটায়নি। একটা লটারীর টিকিট কিনেছিলাম। এরকম আগেও কিনেছি। এবার প্রাইজ উঠেছে। দেড় লক্ষ টাকা। সেটা জানাবার জন্যই এলাম। এবার আমার দিদির বিয়ে দিতে পারবো।

—আর তুমি?

সে হেসে বললে, আমি! আমার রইলো রিক্সা! ভাবনার কী আছে?

বলে সে চলে গেল। কতো বললাম, একটু জলযোগ করে যাও। কিন্তু সে তা শুনলো না।

প্রদীপ বললো—যাক, বাঘের ছালটা ওর সহ্য হয়ে গেছে!

আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে! ঐ যে বলে গেল, 'আমার রইলো রিক্সা'। ওটা যেন চাবুক হয়ে আমার গায়ে এসে সপাং করে লাগলো!

ছবি: দিলীপ দাস

নিবেদন

চিঠি-পত্রের গোলমালের জন্যে নবকল্লোল, শুকতারা এবং দেব সাহিত্য কুটীরের শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, এখন থেকে তাঁরা যেন চিঠি লেখার সময় বিভাগ ও পত্রিকার নাম সঠিকভাবে উল্লেখ করেন। যেমন নবকল্লোলের শারীরিক প্রশ্নোত্তর, বা জ্যোতিষীর দরবার, C/O সম্পাদক, নবকল্লোল, ১১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯, আবার শুকতারার ক্ষেত্রে দাদুমণির চিঠি, মজার পাতা বা তোমাদের জিজ্ঞাসা C/O সম্পাদক, শুকতারা, ১১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯। দেব সাহিত্য কুটীরে বইয়ের জন্য বা অন্য কোনো কারণে চিঠি লিখতে হলে লিখবেন—কর্মাধ্যক্ষ, দেব সাহিত্য কুটীর, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

তিন পুরুষ ধরে যে নাম
সমাদৃত ঘরে ঘরে
দুলালের ®
তালমিছরি
ভারত সরকার
কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
® চিহ্ন দেখে নিন
কেনার সময় লেবেলে
চিরপরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
লেখা আছে কিনা দেখুন
দোকানদারের কথায় বা অন্য
লেবেল দেখে ঠকবেন না!
দুলালের
তালমিছরি
দুলালের
তালমিছরি
মেসার্স ডি.সি. ভড়
৪, দত্তপাড়া লেন, কলিকাতা-৬ ফোন : ৩৯-৫৬৭৩
সর্দ্দি কাশিতে অদ্বিতীয়!
PRASA/DCB

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

সততার পরিচয়

কৌশিক রায়

লেখা বন্ধ কর–খাতাটা দিয়ে দে।

পরীক্ষা হলে একমনে উত্তর লিখতে লিখতে সহসা হলের গার্ড সুধীরবাবুর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে মনোজ চমকে উঠল। খাতা ততক্ষণ সুধীরবাবুর হাতে চলে গেছে।

–স্যার–এখনো তো ঘণ্টাখানেক সময় বাকি রয়েছে। খাতাটা এখন নিয়ে নিলেন কেন?

অবাক হয়ে মনোজ প্রশ্ন করে।–ফের কথা! লজ্জা করে না?

সপাটে একটা চড় এসে পড়ল মনোজের গালে।

–স্যার আপনি আমায় মারলেন!

–মারব না তো কি ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করব? সত্যি তোকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল। এই সংসারে যে কত ধরনের মানুষ আছে আজ তার প্রমাণ পেলাম।

মনোজ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে চেয়ে থাকে সুধীরবাবুর দিকে।

–কি রে? এখনো নিজের দোষ স্বীকার করবি না!

–স্যার আমি তো কোনো দোষ করিনি।

–ফের মিথ্যে কথা। আবার একটা চড় এসে পড়ল মনোজের গালে।–চল হেড্‌স্যারের ঘরে।

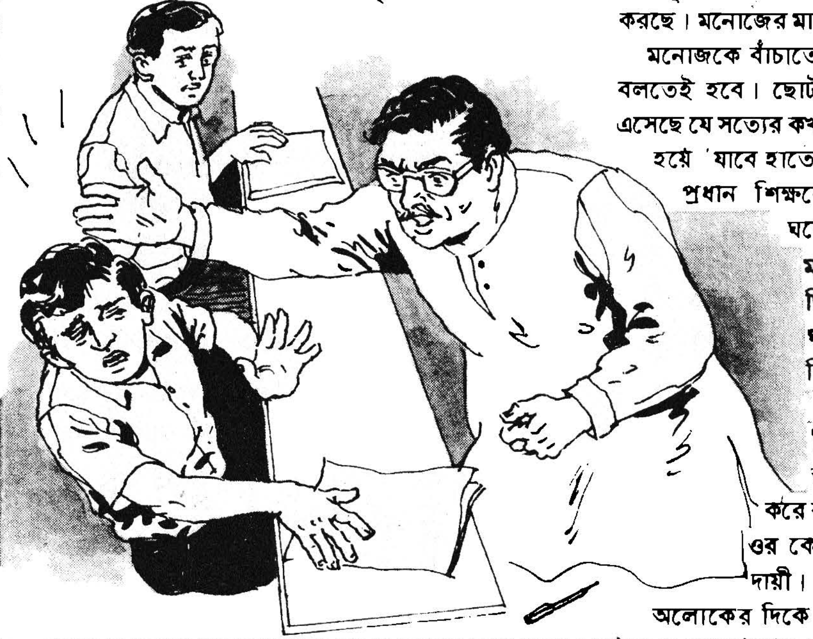

সুধীরবাবু মনোজকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শ্যামসুন্দর বসুর কাছে।

হঠাৎ কোথা থেকে যে কি ঘটে গেল হলের অন্যান্য ছাত্ররা তার কিছুই আন্দাজ করতে পারল না। মনোজ কেবল ক্লাসের ফার্স্ট বয় নয়, সে সৎ চরিত্রের এবং স্বভাবের ছেলে। এই পরীক্ষার ওপর তার ভাগ্য নির্ভর করছে। কারণ এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই সে একটা চাকরি পাবে–পারবে গুটিকতক জীবনকে রক্ষা করতে। তার গরীব বাবা-মা যে তার মুখ চেয়ে বসে রয়েছে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা জানে কেবল অলোক। সেই ঐ ঘটনার জন্যে দায়ী। বাড়ি থেকে ইতিহাস বই-এর একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে এনে পরীক্ষার হলে বসে সে নকল করছিল। এমন সময় সুধীরবাবুকে তার দিকে আসতে দেখে সে তড়িঘড়ি করে পৃষ্ঠাটা ছুঁড়ে ফেলতে গেছিল এবং পৃষ্ঠাটা মনোজের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে। অলোক ছাড়া ব্যাপারটা আর কেউ বুঝতে পারেনি। সুধীরবাবু মনোজের পায়ের কাছ থেকে সেই পৃষ্ঠা কুড়িয়ে পান এবং মনোজকে দোষী বলে মনে করে শ্যামসুন্দরবাবুর কাছে নিয়ে যান।

কিছুক্ষণ পরে নোটিস এল–পরীক্ষা হলে নকল করবার অভিযোগে অভিযুক্ত মনোজ মণ্ডলকে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কৃত করা হলো।

ঘটনাটা শেষপর্যন্ত যে এত দূর গড়াবে অলোক তা বুঝতে পারেনি। সে ভেবেছিল দু'-তিনটে চড় চাপড়ের পর মনোজকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এ যে অন্যরকম ঘটে গেল। অলোক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে পরীক্ষা দিয়ে মনোজ বাড়ি ফিরছে। ওর বাবা-মা ছুটে এসে পরীক্ষার খবর নিচ্ছে। ছোট ছোট ভাই-বোনগুলো দাদার পরীক্ষা ভালো হবার জন্যে আনন্দে নাচানাচি করছে। মনোজের মা ভক্তিভরে প্রণাম করছেন ইষ্টদেবতাকে।

মনোজকে বাঁচাতেই হবে যে করে হোক। সত্যকথা তাকে বলতেই হবে। ছোটবেলা থেকেই সে তার মা'র মুখে শুনে এসেছে যে সত্যের কখনও পরাজয় হয় না। আজই তার পরীক্ষা হয়ে যাবে হাতে হাতে। অলোক দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় প্রধান শিক্ষকের ঘরের দিকে।

ঘরে কেবল প্রধান শিক্ষকই ছিলেন না, মনোজ আর সুধীরবাবুও তখন সেই ঘরে ছিলেন। অলোককে অমন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে সকলে অবাক চোখে তার দিকে চাইলেন।

অলোক একবার মনোজের দিকে দেখল। বিভ্রান্ত মনোজের চোখে জল। অলোক আর কোনোদিকে না তাকিয়ে সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলল–স্যার, মনোজকে ছেড়ে দিন। ওর কোনো দোষ নেই। এ ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অলোকের দিকে।

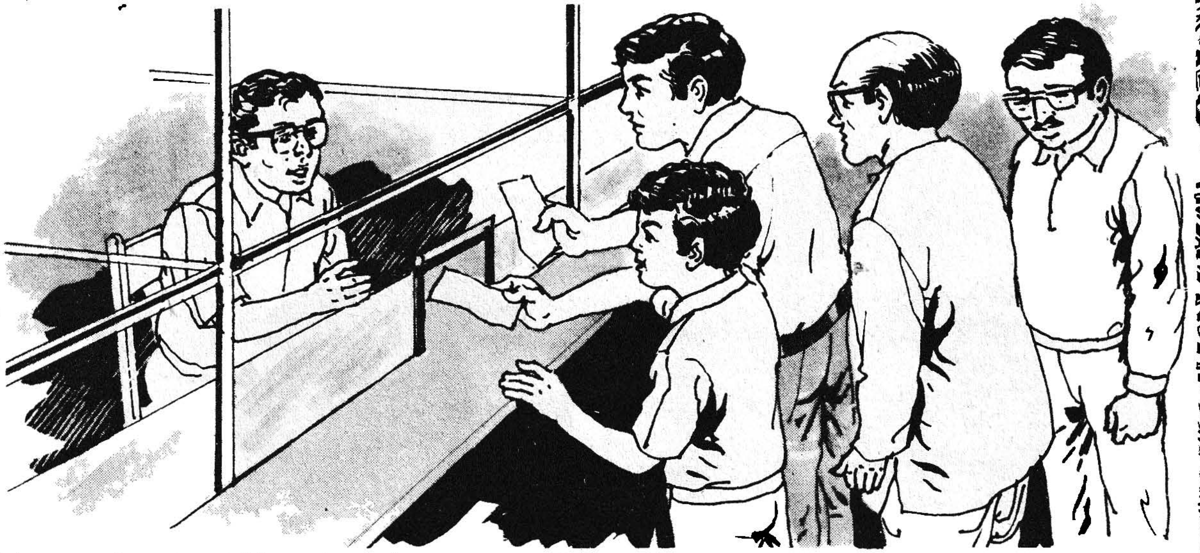

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

কিশোরের সততা

দেবাঞ্জন বিশ্বাস

সুমন ! এদিকে শোন তো বাবা।

সুবিনয়বাবুর বড় ছেলে সুমন তখন স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সে নবম শ্রেণীর ছাত্র। বাবার ডাক শুনে এসে বলল—আমাকে ডাকছেন বাবা ?

সুবিনয়বাবু বললেন, আমাকে অফিসের কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু আজ যে ব্যাংক থেকে পাঁচশ' টাকা তুলতে হবে। তুই কি পারবি এ-কাজটা করতে ?

স্বীকৃতি জানিয়ে সুমন বাবার হাত থেকে চেকখানা নিয়ে চলে গেল।

আজ শুক্রবার। স্কুলে টিফিনের ছুটি এক ঘণ্টা। বারটার সময় টিফিনের ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং ঢং। সুমন চেকখানা নিয়ে সাইকেলে চেপে ছুটল ইণ্ডিয়ান ব্যাংকের দিকে। কাউণ্টারে বসে আছেন সুন্দর, সুঠাম চেহারায় কেশিয়ার। চট্‌পট্ কাজ করছেন তিনি। তবুও বেশ ভিড় জমে আছে কাউণ্টারের সামনে। সুমন দেখল লাইনে দাঁড়ালে তার দেরি হয়ে যাবে। তাই সে একটু এগিয়ে গিয়ে কেশিয়ারকে বলল, দেখুন, আমি স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে এসেছি। দয়া করে আমাকে একটু আগে দিয়ে দেবেন? দেরি হয়ে গেলে হেড স্যার ভীষণ বকবেন। কেশিয়ার সুপ্রিয়বাবু তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, মিষ্টি চেহারার কিশোর ছেলেটির চোখে মুখে উদ্বেগ। তিনি একটু হেসে তার হাতের চেকখানা নিয়ে টাকা দিলেন।

সুমন টাকাগুলো নিয়ে এবার ছুটল বাড়িতে। টাকা রেখে আবার স্কুলে ফিরে এল। স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরে সুমন প্রথমেই টাকাগুলো গুনে ঠিক আছে কিনা দেখতে গেল। কিন্তু একি ? সে ভুল দেখছে না তো ? কেশিয়ারের মলিন চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল সুমনের। পাশবুক খুলে দেখল সেখানে পাঁচশ' টাকাই লেখা আছে। তাহলে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়িতে ভুল করে তিনি সুমনকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ফেলেছেন। এখনও হয়তো তিনি টাকাগুলো মেলাতে পারছেন না। ওঁকে তো নিজের পকেট থেকেই টাকা দিয়ে ব্যাংকের জমার টাকা মিলিয়ে দিতে হবে। তার তাড়াতেই ভদ্রলোকের এত বড় ভুল হলো। জানি এখন কত কষ্টই তাঁর হচ্ছে হিসাব মেলাতে না পেরে। নিজের ওপর রাগ হতে লাগল সুমনের। ক্ষোভে দুঃখে চোখে জল এসে গেল।

এখন বাজে প্রায় পাঁচটা। পাঁচশ টাকা রেখে বাকি ৪৫০০ টাকা নিয়ে সাইকেলে চেপে সে আবার রওনা দিল ব্যাংকের দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যে পৌঁছেও গেল। ভেতরটা এখন ফাঁকা। লোকজন বড় বিশেষ নেই। অল্প কয়েকজন ভদ্রলোক আর সুপ্রিয়বাবুকে ব্যস্ত হয়ে কি সব বই-পত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে দেখা যাচ্ছে। সুমন অপরাধীর মতো সুপ্রিয়বাবুকে বলল—আমার জন্যই আজ আপনাকে এত কষ্ট করতে হলো। সুপ্রিয়বাবু সংগে সংগে ছেলেটিকে চিনতে পেরে বলে উঠলেন, তবে কি তোমাকেই আমি ৪৫০০ টাকা বেশি দিয়েছি ?

সুমন সবিনয়ে বলল, হ্যাঁ, সেই জন্যই তো এখন আমার আসা।

কিশোর ছেলেটির সততা দেখে শুধু সুপ্রিয়বাবু কেন উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সুপ্রিয়বাবু ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, এই তো চাই ভাই। সারাজীবন বজায় থাকুক তোমার এই দৃঢ়তা।

ছবি : দিলীপ দাশ

ঠিকানার খোঁজে

কমল লাহিড়ী

আর কতটা হাঁটতে হবে
যেতে হলে হবিবপুর
বলতে পারো–সেই কথাটি–
শুধায় এসে চন্দ্রচূড়।
তিন্নি-মিন্নি-শাকচুন্নি
গদাই আলুর দম,
ওদের মাথায় গোবর পোড়া
মুখেই বকবকম।
বাড়ির ঠাকুর পদ্মলোচন
চারদিকে তার নজর;
তারই কাছে জানতে হবে
হবিবপুরের খবর।
প্রশ্ন শুনে, পদ্মঠাকুর
বাড়ায় মুখের হাঁ,
জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলে–
চালিয়ে যা পা।
সূয্যি মামা বসবে যখন
আসন পিঁড়ি করে;
পাখপাখালি গাছের ডালে
আসবে যখন ঘুরে।
দুই রশি আর চল্লিশ হাত
রাস্তা হাঁটার পরে,
হবিবপুরের সীমানাটা–
তবেই উঁকি মারে।
একদিন তো এই রাস্তা
খুবই সহজ ছিলো,
ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে–
পথটা পিছল হলো।

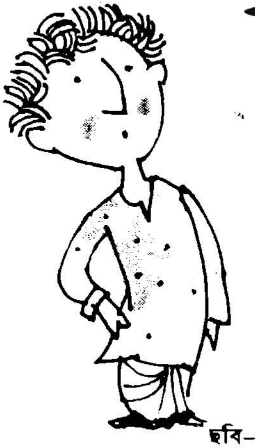

ছবি–সরোজ সরকার

---

২৪ পরগণার আগরপাড়ার কল্যাণপুর থেকে দ্বি. ন্দ্রনাথ বসু তাঁর স্বর্গত পুত্র মানস বসুর নামে একটি স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করছেন।
তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা মানস বসু স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য পাঠক পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

বিষয়বস্তু

বাহাদুর বিজ্ঞান

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০শে আষাঢ়। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা আগামী কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার–পনের টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার–দশ টাকা

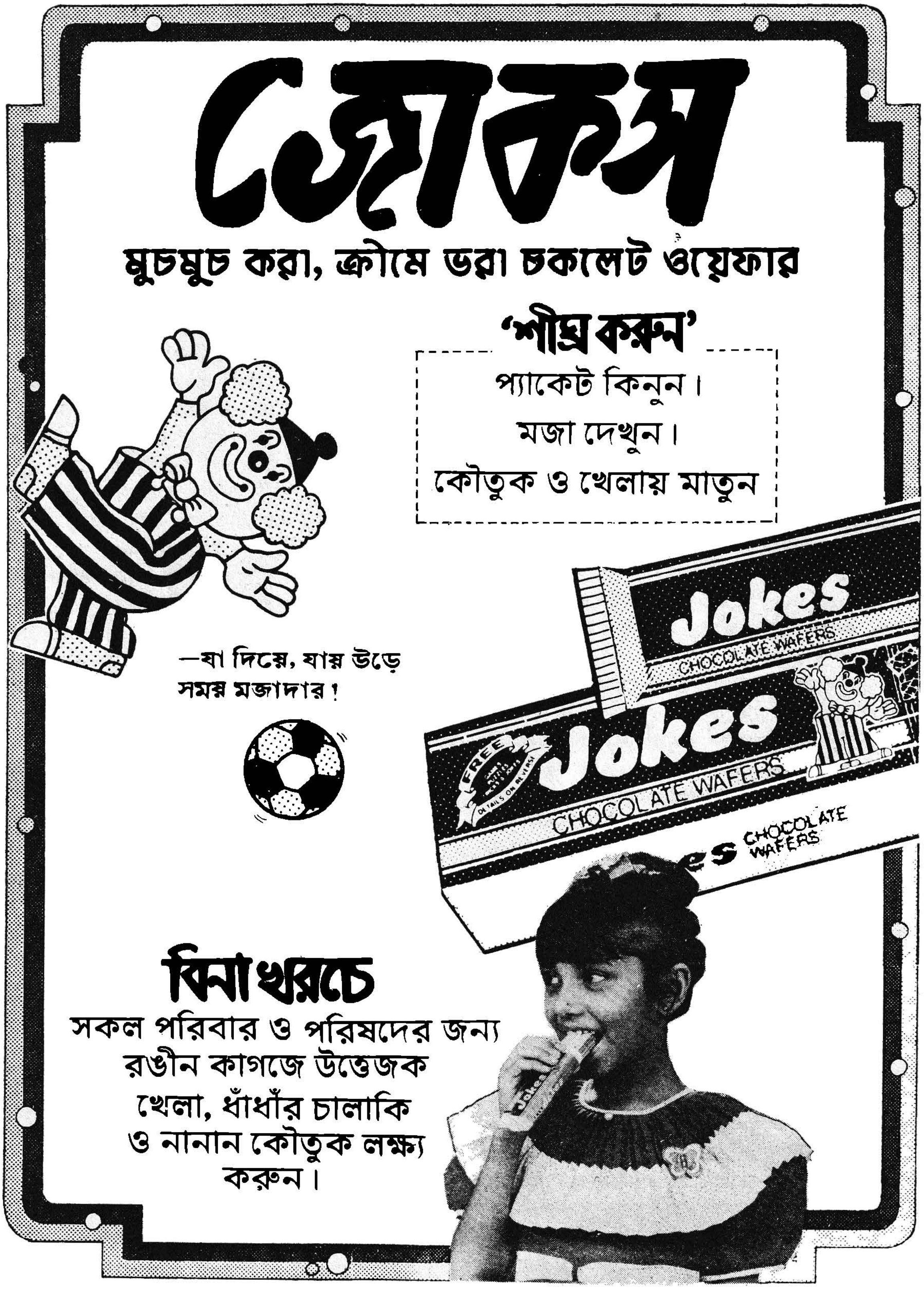

জোকস
মুচমুচ করা, ক্রীমে ভরা চকলেট ওয়েফার
'শীঘ্র করুন'
প্যাকেট কিনুন।
মজা দেখুন।
কৌতুক ও খেলায় মাতুন
—যা দিয়ে, যায় উড়ে
সময় মজাদার!
Jokes
CHOCOLATE WAFERS
FREE
Jokes
CHOCOLATE WAFERS
CHOCOLATE WAFERS
বিনা খরচে
সকল পরিবার ও পরিষদের জন্য
রঙীন কাগজে উত্তেজক
খেলা, ধাঁধাঁর চালাকি
ও নানান কৌতুক লক্ষ্য
করুন।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

কি ভালো আছো তো সকলে?

শুকতারার বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা হাতে পেয়ে তোমরা নিশ্চয়ই খুব খুশি। সেরা অলরাউন্ডারদের নিয়ে ক্যালেন্ডার কেমন লাগলো? দারুণ না! জানিও কিন্তু। আমাদের এক বন্ধু চিঠি লিখে দুঃখ করেছিলো, শুকতারা নিয়ে বলে বেড়াবার মতো, বড়াই করার মতো নাকি কিছু পাও না তোমরা। এবার পেলে তো!

এদিকে নতুন বছর পড়ে গেছে। বৈশাখ মাসটা ভারী সুন্দর না! অবশ্য সব মাসই তো তাই। এক এক মাসের এক এক রকম সৌন্দর্য। এখন দেখো না বেলা কতো বেড়ে গেছে। সূর্যদেব ঘুম ভেঙে উঠে পড়েন সাড়ে পাঁচটার আগেই, আর অস্ত যেতে যেতে প্রায় ছটা। সারাটা দিন গরমের হাঁসফাঁস। দুপুরের দিকটায় তো আগুনে রোদ, বাতাসে ভাসে গরম–পশ্চিমের লুয়ের মতোই অনেকটা।

গ্রামে নির্জন দুপুরে আম গাছের তলায় ছায়া ছায়া ঠান্ডা। সেখানে ছোটদের আনাগোনা। কখন টুপ করে খসে পড়বে একটি আম কে জানে! ওদিকে আকাশে হঠাৎই হয়তো ভেসে আসে একটুকরো কালো মেঘ। সেই মেঘ বড় হয়ে আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়ে দস্যুর মতো। সব কিছু লন্ডভন্ড করে দেয়। এই তো কালবৈশাখী। তার সঙ্গে এক আধদিন একটু আধটু বৃষ্টি। তখন আবার ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। আকাশও ঝকমকে পরিষ্কার। ধ্রুবতারাকে উত্তর দিকে জ্বলজ্বল করতে দেখবে, দেখতে পাবে সপ্তর্ষিমন্ডলকে। পশ্চিম আকাশে ছায়াপথ আর কালপুরুষ, তার নিচের দিকে লুব্ধক আর অগস্ত্য নক্ষত্র। মাঝ আকাশে সিংহ রাশির পূর্ব ও উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র। পূবদিকে ঘেঁষে আছে 'স্বাতী', কন্যা আর তুলা রাশি।

তখনই হয়তো তোমাদের নাকে আসবে বেলফুলের মিষ্টি গন্ধ। এখন বেলফুলের দিন। সাদা ফুলগুলো সন্ধে থেকেই গন্ধ ছড়ায়। এখনও গাছে গাছে যেন দোলের আবির ছড়াচ্ছে কৃষ্ণচূড়া। রাধাচূড়ার হলুদ রং দারুণ লাগে। চাঁপা ফুলের গন্ধে ম-ম করে চারদিক। বাঁদরলাঠি গাছে ঝুলছে ফুল। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। কী যে ভালো লাগে। এক কাজ করো না–এক দিন খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে পড়ো। সূর্য ওঠার আগে থেকে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করো, পাখিদের দিকে খেয়াল রাখো–কতো কী দেখতে পাবে, কতো অজানাকে জানতে পারবে আর দেখবে ভীষণ ভালো লাগবে। তোমাদের যাদের বাড়িতে বাগান আছে তারা বাগানে,যাদের নেই তারা যদি টবে গাছ লাগিয়ে ফুল ফোটাতে পারো তাহ'লে ভীষণ ভালো লাগবে, ভীষণ আনন্দ হবে। মনে হবে একটা কিছু করলাম–তেমনি সব সময় চেষ্টা করবে প্রকৃতিতে চেনার। ওর মধ্যে অদ্ভুত একটা আনন্দ আছে।

এই রে–এক্ষুণি কেউ বলবে–দাদুমণি গল্প না বলে এ সব কি বলছে! তাই তো! কিন্তু একটা কথা আবার বলার দরকার। তোমাদের অনেকেই আবার চিঠি দিয়ে লেখা ছবি পাঠাবার নিয়ম-টিয়ম জানতে চাইছো। আরে ভাই–ওটা তো তোমাদেরই পাতা, ছবি এঁকে, গল্প, কবিতা, ছড়া লিখে সোজা দাদুমণি c/o শুকতারা কার্যালয়, ১১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা–৯ এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। তোমাদের আঁকা-লেখা ভালো হলেই ছাপা হবে। আর তো কোনো নিয়ম নেই।

এবার তোমাদের কয়েকটা চিঠির উত্তর দিই। তোমাদের বন্ধু–দেবব্রত চক্রবর্তী (দুর্গাপুর, হর্ষবর্ধন রোড) খুব রাগ করে চিঠি লিখেছে। ওর অভিযোগ, অনেকগুলো চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও দাদুমণি একটারও উত্তর দেয়নি।

কি মুশকিল। দাদুমণির চিঠিটাই তো তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর। সবার নাম দিয়ে আলাদা করে উত্তর দিতে গেলে একটা কেন এক বছরের সব সংখ্যার শুকতারাতেও কুলোবে না।

সৌরভ বসু (কল্যাণী, নদীয়া), হৃদয় কুমার সাঁই (দুর্গাপুর তারকনাথ হাইস্কুল, দুর্গাপুর), শুভাশিস রায় (শালিমার, জিয়ালগোরা, ধানবাদ, বিহার), ঋতুপর্ণা মন্ডল (বাঁকুড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বাঁকুড়া), সমীরণ মন্ডল (বি, কে পাল লেন, কলকাতা–৩০), শম্পা পাল (শক্তিগড়, শিলিগুড়ি), সজল ও উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় (বহড়ু মাঝেরপাড়া, ২৪ পরগনা), পিন্টু চৌধুরী (নিউ জলপাইগুড়ি), আশুতোষ দেবনাথ (আলিপুর দুয়ার, চৌপথী, জলপাইগুড়ি), পিন্টু (রানাঘাট রেল কোয়ার্টার, নদীয়া), ভদ্রেশ্বর মাইতি (তুলসীবেড়িয়া), স্বপন সাহা (লেকটাউন, কলকাতা–৮৯)।

অনেকের মতো তোমাদেরও অভিযোগ দাদুমণি কেন চিঠির উত্তর দেয় না। তার উত্তর তো আগেই দিয়ে দিয়েছি। আর তোমরা সকলে চাইছো–শুকতারা পাক্ষিক হোক। তোমাদের ইচ্ছের কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি।

আজ তো আর গল্প বলা হলো না। তা না হোক–এ মাসে তো তোমরা দুটো সম্পূর্ণ উপন্যাস, অনেক গল্প, খেলার রঙিন ছবি আরও কতো কী পেয়েছো–কেমন লাগলো জানিও কেমন!

আজ তাহলে এই পর্যন্তই।

ভালো থেকো সকলে!

আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ!

তোমাদের

দাদুমণি

দু-মুখো, এখনও থাম। থাম বলছি। নয়তো গুলি করব। এক দুই তিন...!
মিঃ দুর্বার, না!
বুম-বুম!
তুমি কি পাগল ?
শয়তানটাকে গুলি করতে দিলেনা ?! ওকে আর ধরতে পারব মনে কর ?!
না মিঃ দুর্বার, প্রত্যেক অপরাধীই মানসিক ভাবে অসুস্থ থাকে। একজন মানসিক রোগীকে খুন না করে, সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিত!
থাম! তোমার ওসব বড় বড় বুলি–
–তোমারই থাক্। আমার ব্যাপারটা আমাকেই ভাবতে দাও!
পরে
রাত হয়ে গেছে। এই পার্কটাই আমার বাড়ির রাস্তা সটকাট করে দেবে।
ক্রিঁ-য়্যা-য়্যা-য়্যা-য়্যা-য়্যা !! ক্ল্যাং-ক্ল্যাং !!
ও কিসের শব্দ ?!
একটু এগিয়েই বৃশ্চিক দেখে অন্ধকারে বিশাল ভয়াবহ একটা মূর্তি!
ওটা কি ? রোবট ?! বুঝতে পেরেছি এটাই দু-মুখোর খুনী রোবট।
ক্রিঁ-য়্যা-য়্যা-য়্যা-য়্যা-য়্যা !!! ক্ল্যাং-ক্ল্যাং !

পালাতে হবে।
রোবটটা ধরে ফেলে বৃশ্চিককে।
তারপর পিষতে থাকে ধাতব দুই হাতে।
আঃ! আজ বোধহয় রক্ষা নেই! আমার শরীরের একত্রিত সমস্ত শক্তিই বোধহয় ওর কাছে তুচ্ছ! আ-আঃ!
ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে বৃশ্চিকের সামনে
রোবটের স্বচ্ছ মুখটা চোখে পড়ে তার! শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সেখানে আঘাত করে সে!
ঝন-ন-ন
মুখের আবরণ ভেঙে যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বৃশ্চিক নিজেকে ছাড়াতে পারেনা।
ওঃ!
সাক্ষাৎ মৃত্যুর অন্ধকার নেমে আসে তার চোখে।
উঃ ওঃ!

[চলবে]

নামুন গিরিবর্ত্মের পথে

তপনকুমার দাস

আজ ২৪ অক্টোবর ১৯৮২। মহাসপ্তমী।

সারা শহর মেতে আছে মাতৃপূজায়। নতুন জামা-প্যান্ট পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে ছোটরা। পথে পথে নেমেছে ভিড়ের ঢল। সবার মনে আনন্দ, মুখে হাসি-গান।

আমার কিন্তু সকাল থেকে একদম সময় নেই। সকাল থেকে গোছাচ্ছি তো গোছাচ্ছিই। এটা নিই তো ওটা ভুলে যাই, ওটা নিই তো এটা ভুলে যাই। মনের মধ্যে চাপা একটা উত্তেজনা। এবার আমরা এমন একটা পথে যাবো, শুধু দারুণ উঁচুই নয় ভয়ংকর অথচ সুন্দর সেই গিরিপথ। নেপালের অন্নপূর্ণা হিমালের কাছেই লামজুং হিমালের অন্তর্গত এই নামুনপাশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৯,৫০০ ফুট উঁচু। চট করে কেউ এই অভিযানে যায় না। এখানে পায়ে পায়ে বিপদ। সুন্দরের পাশাপাশি ভয়ংকরের রাজত্ব। সেই রাজ্যে যাবো। তাই তো এতো উত্তেজনা, এতো আনন্দ।

কিন্তু বাড়ির সকলের মুখ ভার। কেউই পছন্দ করেন না আমার এই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো। মা তো বলেই দিয়েছেন, তাঁর মোটেই এসব ভালো লাগে না। বচ্ছরকার দিন কেউ বেরোয় নাকি! কিন্তু কী করে যে সকলকে বোঝাই–হিমালয় আমায় টানে। ঐ বরফের রাজ্যে, ঐ ভয়ংকর বিপদের পথে আমি যে আনন্দ পাই, যে উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের স্বাদ পাই–তা তো আর কোথাও, কোনোদিন পেলাম না। সেখানে অনন্ত সেই বরফের রাজ্যে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুলি চলে। হঠাৎ ওঠে ঝড়। বাতাসের সঙ্গে ওড়ে বরফের কুচি। তার দাপটে বাইরে বেরোবে কে! তাঁবুর মধ্যে নিশ্চল হয়ে বসে থাকাও যায় না। দেখতে দেখতে হয়তো বরফেই ডুবে যাবে তাঁবু। কখনো হয়তো ওপর থেকে তুষারের স্রোত নেমে আসে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব কিছু, কিংবা চলার পথে কোথায় যে অলক্ষ্যে আছে অতল গহ্বরের আহ্বান তা কেউ জানে না। সেখানে একবার পড়লে বাঁচার উপায় নেই। কেউ কিছু বোঝার আগেই অতলে তলিয়ে যাবে অভিযাত্রীর দেহ। কোনোদিন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই হিমালয়ে ট্রেকিংয়ে গেলে বাড়ির সকলের ভাবনা-চিন্তা তো হবেই।

এবার তো আবার আরও ভয়ংকর পথ। পোখরা থেকে উত্তর-পূর্ব দিক ধরে এগিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে পৌঁছে যাবো নামুন গিরিবর্ত্মে। এই গিরিপথ অতিক্রম করে মারশিয়াংদি নদী-উপত্যকায় থনগিয়া অথবা বাগেরচাপ পৌঁছান যাবে। মারশিয়াংদি উপত্যকায় যাবার আরও একটা পথ আছে। পোখরা থেকে মোটরপথে ডুমরে নেমে সেখান থেকে হাঁটা পথে খুদি, জগত, থনগিয়া, চামে এবং মানং জনপদ পার হয়ে দুর্গম তারাংপাশ অতিক্রম করতে পারলেই মুক্তিনাথ তীর্থ। কিন্তু সে পথ বড় দীর্ঘ। সময়ও লাগে অনেক বেশি। তাই আমরা নামুন গিরিপথ অতিক্রম করে মারশিয়াংদি নদী-

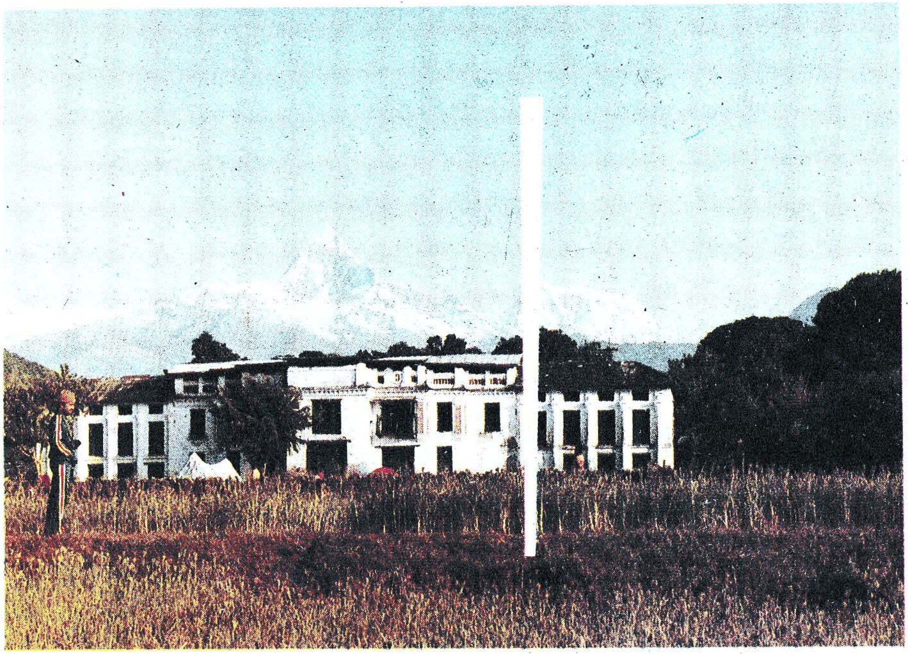

পোখরা রাজদরবারী—পেছনে মাচ্ছাপুছা শিখর বা ফিস টেল ডান পাশে ছাব্বিশ হাজার ফুট উঁচু অন্নপূর্ণা এক।
নিচেঃ নেপালের একটি গ্রাম।

উপত্যকায় যাবো।

পথের সঠিক হদিস জানার জন্যে আমরা নেপাল সহ নানা জায়গায় চিঠি-পত্তর লিখেছিলাম। কিন্তু কেউই গা করেননি। শেষ পর্যন্ত আমাদের লিডার দীপক দে দশ বছরের পুরনো একটা কনটুর ম্যাপ যোগাড় করে পথের নিশানা তৈরি করেছেন। সেই পথ দিয়েই আমরা হাঁটবো।

দীপকদা আমাদের এই অভিযানের লিডার। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করলেও অভিজ্ঞ পর্বতারোহী তিনি। পনেরো বছর ধরে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করছেন। কেশব কর আমাদের আর এক সংগী। কাজ করেন দীপকদার সংগেই। পাহাড়ে চড়ার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের ডাক্তারসংগী সমর পাল। পেশায় ডাক্তার। কিন্তু নেশা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো। তাপস ভট্টাচার্যর হাতের ক্যামেরায় আমরা হিমালয়ের পথে পথে ধরা পড়েছি অনেকবার। দারুন ছবি তোলেন। পাহাড়ে ঘোরা আর ছবি তোলাই তাপসের নেশা। দিলীপ দাশ আমাদের পুরানো সংগী। একসংগে আমরা খুম্বু হিমবাহ ঘুরে এসেছি। আমাদের আর এক সংগী কার্তিক পালেরই শুধু পাহাড়ে চড়ার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। তবে উৎসাহ যথেষ্ট। এঁদের সংগেই চলেছি নেপাল হিমালয়ের নামুন গিরিবর্তের পথে।

দেখতে দেখতে কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। আমরা যাবো গোরক্ষপুর এক্সপ্রেসে। রাত দশটায় গাড়ি ছাড়বে। কিন্তু সপ্তমীর রাত। রাস্তা-ঘাট তো জ্যাম-ট্যাম হয়ে একাকার হয়ে যাবে। তাই শেষ বিকেলেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কেশব সেন স্ট্রীট থেকে হাওড়া স্টেশন—কতোই বা পথ। কিন্তু তাহলে কি হবে! জিনিসপত্তর নিয়ে

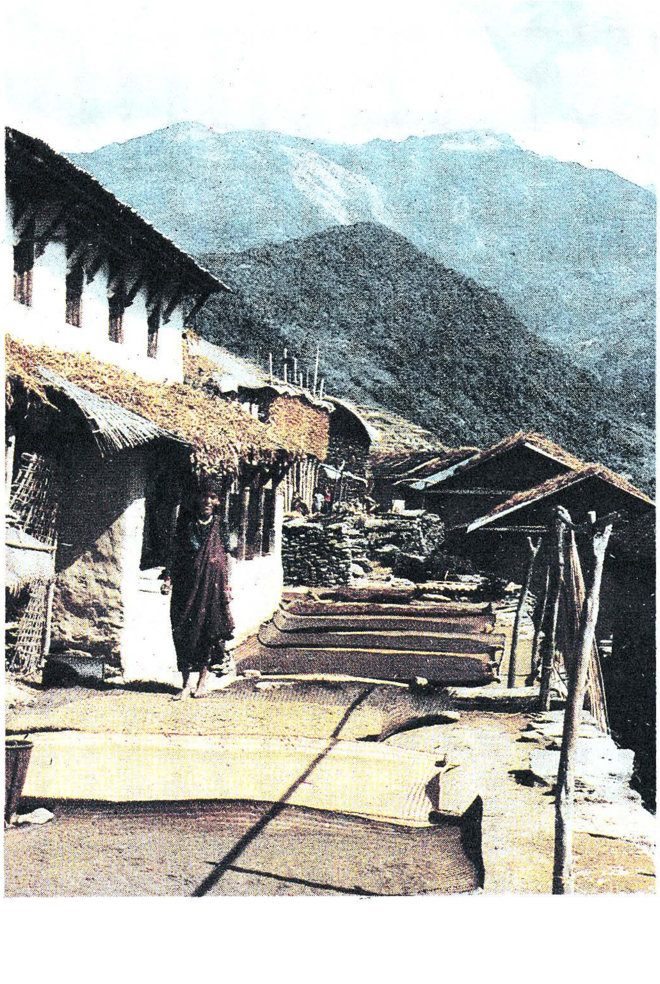

নামুনের পথে যাত্রার আগে অভিযাত্রী দল। বাঁদিকে সামনে লেখক।

পৌঁছুতে হবে তো!

ট্রেন চলছে হু হু করে। মাঝে মাঝে কানে আসছে ঢাকের শব্দ। দূরে দূরে চোখে পড়ে প্যাণ্ডেলের আলো। মহাসপ্তমীর রাত। এইদিনে চলে এলাম বাড়ি থেকে। মনটা খারাপ লাগে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের মুখ। চোখ দুটো ছলছল করছে। শোভন তো কাঁদতেই শুরু করেছিলো। বাবা কিছু বলেননি। চুপ করে ছিলেন। এমনিতে শরীরটা খারাপ। তার ওপর...ছেলের পাহাড়ে চড়ার নেশা তো ভালো করেই জানেন। তাই আপত্তি করেননি। বলেছিলেন, ঘুরে আসুক, কদিনের ব্যাপার তো!

চলন্ত ট্রেনে জানলার ধারে বসে বসে ঐ সব কথাই ভাবছিলাম। ভালো লাগছিলো না। কতোদিন পরে ফিরে আসবো কে জানে! হঠাৎ মনে পড়লো খুম্বু হিমবাহ অভিযানের কথা। আমরা তিনজনে গিয়েছিলাম সেই পথে। সেখানেই শুনেছিলাম নেপালের নামুন গিরিবর্ত্মের কথা। শুনেছিলাম কলকাতার হিমালয়ান সামিটার্স নাকি নামুন অভিযানের পরিকল্পনা করছে। কলকাতায় ফিরেই হাজির হয়েছিলাম হিমালয়ান সামিটার্সের দপ্তরে। সেখানেই দীপকদার সঙ্গে আলাপ। তারপর...!

তারপরই তো এই অভিযান। ১৯,৫০০ ফুট ওপরে হিমালয়ের হিমের রাজ্যে হাঁটবো, শুধু হাঁটবো।

[চলবে]

নিশীথ রাতের কুহেলী

আকাশে শুক্লপক্ষের ভরন্ত চাঁদটা মেঘের কোলে লুকোচুরি খেলছে।

এখন অনেক রাত।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। নিথর প্রকৃতি। কিন্তু নিঃশব্দ নয়। এই অরণ্য-পাহাড়ের মধ্যে যে সব ছোটখাট জলাশয় আছে সেগুলো থেকে শুরু হয়েছে ব্যাঙেদের ডাক—গ্যাঙর গ্যাঙ...গ্যাঙর গ্যাঙ...

অরণ্য পাহাড়ের চূড়ায় আলো-অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে মুখ লুকিয়ে আছে এক কাঠের বাংলো। এ বাংলোর হদিস কেউ রাখে না। রাখার মতো মানুষই বা আশপাশে কোথায়।

হঠাৎ ও কি শব্দ!

আসুরিক শক্তি প্রয়োগে একটার পর একটা কাঠের দেয়াল, পার্টিশন সবকিছু চুরমার করতে করতে বাংলোর ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল কি এক অতিকায় প্রাণী। নেমে আসতে লাগলো অরণ্য ভেদ করে।

সেই মুহূর্তে আকাশের চাঁদটা ঢাকা পড়েছে এক বিশাল মেঘের আড়ালে। তার ছায়ায় হারিয়ে গেছে জ্যোৎস্নার আলো। সেই গভীর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অতিকায় জীবটা থপ্ থপ্ শব্দ তুলে এগিয়ে চলেছে সামনের নদীটার দিকে।

একসময় সেই বিশাল দেহটা ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীর জলে।

আর ঠিক তখনই পাহাড়-চূড়ার বাংলো থেকে ভেসে এল বৃদ্ধকণ্ঠের এক কাতর আহ্বান—ওরে বাচ্চা, ফিরে আয়, ফিরে আয় বাচ্চা...!

সে ডাক শুনে সেই অতিকায় প্রাণীটা বোধহয় একবার শুধু মুখ তুললো, আর ঠিক সেই মুহূর্তে চাঁদটা বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে। চকিত দেখা গেল বিশাল হেডলাইটের মতো জ্বলন্ত দুটি চোখ আর বিকট জলহস্তীর মতো মাথাটা।

এর পরই তুমুল আলোড়ন তুলে নদীতে ডুব দিল জীবটা।

নদীর নাম পেরিয়া।

ওদিকে ভাঙা বাংলোর ভেতর থেকে তখনও শোনা যাচ্ছে করুণ কণ্ঠস্বর —ওরে ফিরে আয়...ফিরে আয় বাচ্চা...।

কিন্তু প্রকৃতিতে তখন স্তব্ধতা নেমে এসেছে। এমনকি ব্যাঙেদের ডাক পর্যন্ত থেমে গেছে অকস্মাৎ এই বিভীষিকার তাড়নায়।

পাহাড়-চূড়ার বাংলো থেকে বেরিয়ে এল—কে ওই ভয়ংকর?

কে ডাকে ওই অতিকায় দানবকে 'বাচ্চা' সম্বোধনে?

নিশীথ রাতে এ কি কোনো কুহেলী মায়া!

ক্যাপটেন সিংএর আমন্ত্রণ

মেঘনাদ বললো—ক্যাপটেন সিংকে তোর মনে আছে অর্ণব?

ছুটির দিন সকালে রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজের দুর্গাচরণ মিত্র লেনের বাড়িতে এসেছিলাম সকালটা একটু জমিয়ে আড্ডা দেব বলে, মেঘনাদ আমায় দেখে আজ প্রথমেই এই কথাটা ছুঁড়ে দিল।

সোফায় বসতে বসতে বললাম—কোন ক্যাপটেন সিংএর কথা বলছিস, যিনি গত কয়েক বছর আগে হিমালয়ের শিনকি গিরি উপত্যকায় 'ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য' উদ্ধারে আমাদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন?

মেঘনাদ বললো—হ্যাঁ বন্ধু, এবারও উনি ডাক দিয়েছেন আর এক ভয়াবহ রহস্য উদ্ঘাটনে আমাদের সাহায্য চেয়ে। তবে উনি এখন আর সেনাবাহিনীতে নেই। অবসর নিয়ে দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু রাজ্য সীমানায় নতুন গড়ে ওঠা এক পর্যটক

আবাসের উনি অধিকর্তা।

–রহস্যটা কি সেখানেই ?

–হ্যাঁ। গত পনের দিন যাবৎ ওখানে বেশ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গোটাকয়েক খুনও হয়েছে অথচ অপরাধীর আসল পরিচয় জানা যাচ্ছে না।

শুনে কেমন আগ্রহ অনুভব করলাম। বললাম–ব্যাপারটা একটু খুলে বলবি ?

মেঘনাদ বললো–ক্যাপটেন সিং চিঠিতে যতটুকু জানিয়েছেন ততটুকুই বলতে পারি। তার বেশি আমার অজানা।

বললাম–বেশ, তাই বল।

মেঘনাদ বলতে শুরু করলো :

জায়গাটা হলো কেরল আর তামিলনাড়ু সীমানার মাঝামাঝি। জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা।

ওখানে একটা নদী আছে। নদীর নাম পেরিয়া। নদী বেশ চওড়া। মাঝে মাঝে কয়েকটা দ্বীপের মতো সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি দ্বীপ তো মাইল কয়েক পরিধি বিশিষ্ট। অনেক দ্বীপেই বন্য জন্তুজানোয়ারের বাস। হিংস্র জন্তু খুব বেশি না থাকলেও হাতি, হরিণ, বুনো শুয়োর, বুনো মোষ তো আছেই।

–পেরিয়ার দ্বীপের নাম আমি আগেই শুনেছি। মেঘনাদের কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বললাম–ভারতের অন্যতম রিজার্ভ ফরেস্ট আছে ওখানে, তাই তো ?

–ঠিক বলেছিস। মেঘনাদ বললো, তবে এ এলাকায় নদীটা আরও চওড়া। আগেই বলেছি, নদীটা এক একটা দুর্গম অরণ্য এলাকার চারপাশে বেড় দিয়ে বয়ে গেছে। এমন একটা দ্বীপের বুকেই আতঙ্কের সূত্রপাত। স্থানীয় লোকে বলে পেরিয়ার দ্বীপ।

আমি বললাম–ক্যাপটেন সিং কি সেই দ্বীপেরই কোনো পর্যটক আবাসের অধিকর্তা ?

–ঠিক তাই। ওই দ্বীপেই গড়ে তোলা হয়েছে একটা ট্যুরিস্ট লজ। অবশ্য ট্যুরিস্ট বলতে এখানে বেশির ভাগ বিদেশীরাই এসে ওঠে। এই অরণ্য পাহাড় প্রকৃতির মধ্যে দিনকয়েক কাটিয়ে যায়। মাইল কয়েক দূরে আছে 'ক্যু-ভ্যালি' নামে একটা জায়গা। কিছু কিছু ট্যুরিস্ট সেখান থেকেও এই পেরিয়ার দ্বীপে এসে এক চক্কর ঘুরে যায়। ক্যু-ভ্যালির পর্যটন পরিবহনের সে ব্যবস্থা আছে।

এবার না বলে পারলাম না–যা শুনছি তাতে জায়গাটায় যাবার খুব লোভ হচ্ছে বটে কিন্তু আতঙ্কের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না।

মেঘনাদ বললো–পটভূমিকা জানিয়ে এবার সে প্রসঙ্গেই আসছি।

মেঘনাদ খেই ধরলো :

ব্যাপারটা যখন শুরু হয়েছিল প্রথমটা কেউ অস্বাভাবিক মনে করেনি।

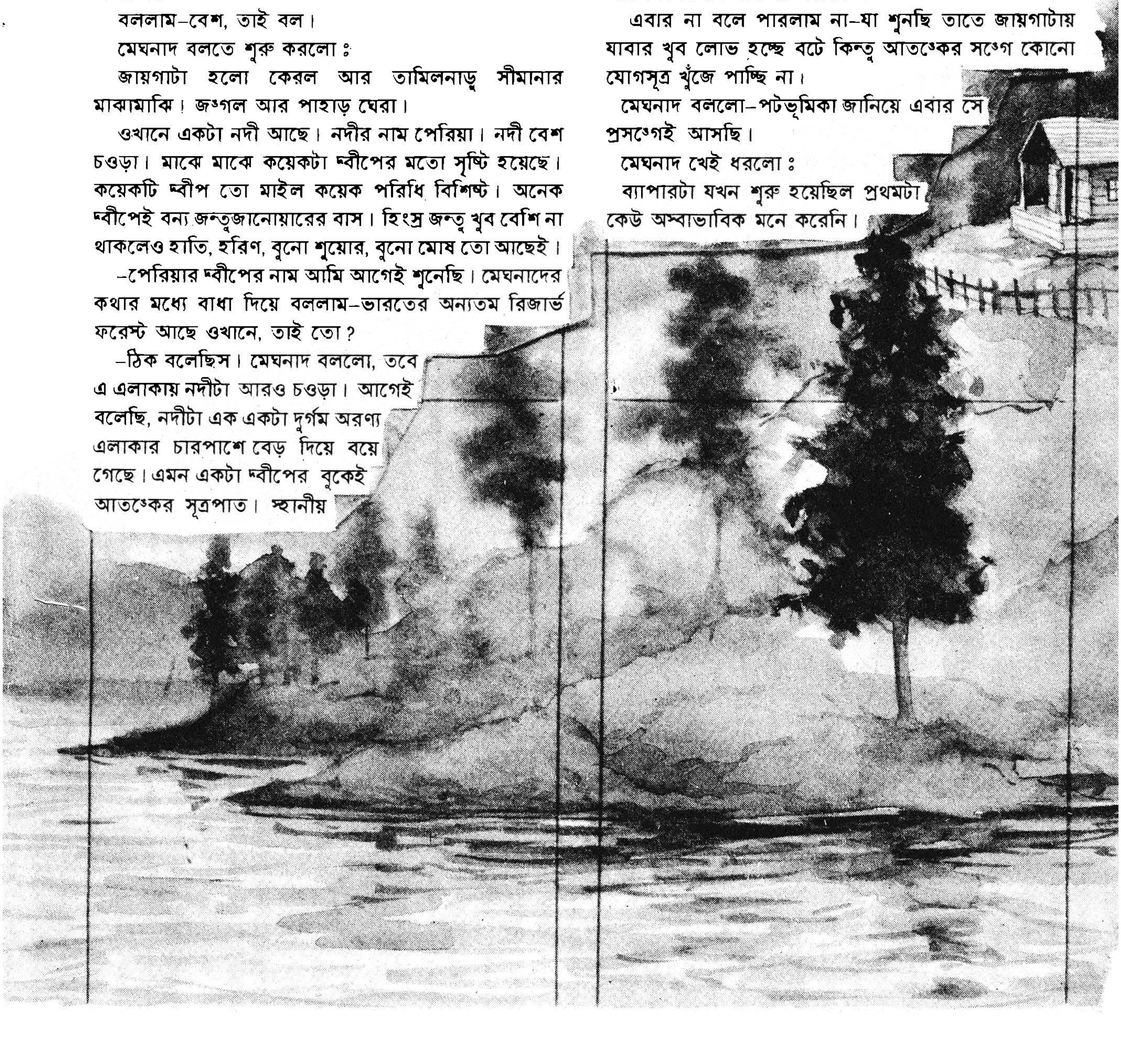

আগেই বলেছি, সে এলাকায় দ্বীপটার মধ্যে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার বলতে তেমন কিছু নেই। তবু একদিন গভীর রাতে লজের কাছাকাছি নদীর ধার থেকে এক বুনো শুয়োরের ভীষণ মরণ-আর্তনাদ শোনা গেল।

পরদিন সকালে সেটার দেহটাও খুঁজে পাওয়া গেল। যেন এক ভারী 'রোলার'এর নিচে চাপা পড়ে তার শরীরটা থেঁতলে গেছে! সেই সংগে মৃত পশুটার আশপাশে পাওয়া গেল এক অদ্ভুত পদচিহ্ন!

—অদ্ভুত কেন?

—কারণ তেমন কোনো জন্তুর পায়ের ছাপ কেউ কখনও দেখেনি! এমনকি স্থানীয় লোকজনেরাও নয়। হাতির চেয়ে বড় অথচ হাতির মতো নয়। পায়ের ছাপ উঠে এসেছে নদী থেকে, ফিরেও গেছে নদীতে।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য তো বটেই। এমন কি জানোয়ার ভূ-ভারতে আছে যা গভীর রাতে নদীর ভেতর থেকে উঠে এসে বুনো শুয়োরের মতো জন্তুকেও এভাবে হত্যা করে নদীতেই ফিরে যায়?

রহস্যটা অমীমাংসিতই থেকে গেল।

কিন্তু ঘটনা থেমে রইলো না।

এর পর এক রাতে একটা হরিণ আর এক রাতে একটা মোষ মারা পড়লো। যথারীতি রাতের বেলা একই ভাবে জন্তুদের মৃত্যুকাতর আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল।

সব শেষ ঘটনাটা ঘটেছে দিনকয়েক আগে। সেই ঘটনাই মারাত্মক।

ট্যুরিস্ট লজের এক কর্মচারীর সেদিন বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল। তার বাড়ি ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে ক্যু-ভ্যালিতে। কিন্তু সেদিন সারা বিকেল বৃষ্টি হওয়ায় সে লজ ছেড়ে বেরুতে পারেনি। তারপর রাত আটটা নাগাদ বৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে পড়লো লজ ছেড়ে। নদীর ধারে সব সময় বাঁধা থাকে একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকো। লোকটা বোধহয় ভেবেছিল ওইটুকু নৌকো সে একাই বেয়ে নদী পার হয়ে যাবে। এসব এলাকার স্থানীয় লোক নৌকো চালনায় পটুই হয়—তাই ব্যাপারটা অসম্ভব মোটেই নয়।

কিন্তু সেদিন নদীর ঘাট পর্যন্ত আর তার পৌঁছনো হয়নি।

সে রাতে লজ থেকেই শোনা গিয়েছিল তার দুঃসহ মরণ-আর্তনাদ। শুনে লজসুদ্ধ লোক ঠকঠক করে কেঁপেছে। কারুর সাহস হয়নি সেই মুহূর্তে লজ ছেড়ে বেরুবার।

কিন্তু ক্যাপটেন সিং খুব বেশি দেরি করেননি। মিলিটারি মানুষ। সাহসের অভাব নেই। জনাকয়েক সংগী নিয়ে পৌঁছলেন ঘটনাস্থলে। কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে। লজের কর্মচারীটির বীভৎস থেঁতলানো দেহ পড়ে রয়েছে নদীর ধারে। তার পাশে যথারীতি সেই হাতির মতো অদ্ভুত পায়ের ছাপ। চলে গেছে নদীর দিকে।

বলতে বলতে মেঘনাদ একটু থেমে বললো—স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ অবশ্য তদন্ত শুরু করেছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই অজ্ঞাত আততায়ী প্রাণীটির কোনো সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় ক্যাপটেন সিং আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। গতকালই ওঁর চিঠি এসে পৌঁছেছে আমার ঠিকানায়।

পেরিয়ার দ্বীপে যাত্রা

পেরিয়ার দ্বীপের ট্যুরিস্ট লজটা সত্যিই খুব সুন্দর। জংগল আর পাহাড়-ঘেরা দুর্গম দ্বীপের এক অংশে অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে এই বিলাসবহুল পর্যটননিবাস। চারদিকটায় নানা গাছ-গাছালি ফলফুলের বাগান।

ট্যুরিস্ট বেশির ভাগই বিদেশী, এদেশে বেড়াতে এসে কেউ কেউ এই দ্বীপাবাসে দিনকয়েক কাটিয়ে একই সংগে পাহাড় অরণ্য আর নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করে যান।

ক্যু-ভ্যালি থেকে একটা জীপ নিয়ে পেরিয়া নদীর কাছে পৌঁছতেই একটা মোটর বোট আমাদের পৌঁছে দিল পেরিয়ার দ্বীপের উপকূল ভাগে।

আমরা যখন লজের ভেতর গিয়ে ঢুকলাম তখন দুপুর।

একটা জিনিস কিন্তু এই দ্বীপে পা দেয়ার পর থেকেই অনুভব করতে শুরু করেছি, তা হলো, সারা দ্বীপটা বড় বেশি চুপচাপ। ফুটফুটে রোদ্দুরেও কেমন যেন ভয় ভয় ভাব।

লজের ভেতর সেটা আরও বেশি করে অনুভব করলাম। জনাকয়েক পুলিশ চোখে পড়লো—তাদের চোখে মুখেও চাঞ্চল্য।

একটা কি যেন হয়েছে। সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই।

ইতিমধ্যে ক্যাপটেন সিং আমাদের আসার খবর পেয়েছেন। শশব্যস্তে এসে হাজির হলেন।

—মেঘনাদ ভাইয়া, অর্ণববাবু, আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। গতকালই আপনাদের টেলিগ্রাম পেয়েছি। আপনাদের দেখে কী ভরসাই যে পেলুম।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম ক্যাপটেন সিংয়ের দিকে। অন্ততঃপক্ষে বছর সাতেক বাদে দেখা তো বটেই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ক্যাপটেন সিংএর চেহারায় বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি—শুধু মাথা আর পাকান গোঁফের চুল আরও কিছু পেকেছে।

মেঘনাদ বললো—আবার নতুন কিছু ঘটেছে নাকি ক্যাপটেন সিং?

—এবার যা ঘটেছে, মনে হচ্ছে, আর এ দ্বীপে আমাদের পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না। পর্যটক আবাস তুলে খুব শীগগির এই আতংকের দ্বীপ থেকে আমাদের সকলকেই পালাতে হবে।

—আতংকের দ্বীপ! কথাটা আমার মুখ ফসকেই বেরিয়ে এল।

–হ্যাঁ, অর্ণববাবু, আশপাশ এলাকার লোকজন এখন এই পেরিয়ার দ্বীপকে 'আতঙ্কের দ্বীপ' নামেই ডাকতে শুরু করেছে।

–নতুন করে কি ঘটলো? মেঘনাদ দাঁড়িয়ে পড়ে আসল কথাটা জানতে চাইলো।

–সে কথা এখুনি নয়। সবেমাত্র এলেন। ভেতরে চলুন। চা-টা খান, তারপর সব বলবো।

ক্যাপটেন সিং লজে আমাদের থাকার জন্যে আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন।

বিভীষিকার কবলে

ক্যাপটেন সিং যা শোনালেন তা সত্যিই বড় ভয়ংকর।

গতকাল সন্ধ্যেবেলা এই ট্যুরিস্ট লজের প্রায় কাছাকাছি এলাকার মধ্যেই দুজন ট্যুরিস্টের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে সেই অজানা দানবটা।

একজন নিহত, অন্যজন মারাত্মকভাবে আহত। তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে।

আর সে কারণেই আজ দ্বীপে পা দিয়েই অমন থমথমে ভাব লক্ষ্য করেছিলাম আমি আর মেঘনাদ।

ক্যাপটেন সিং বললেন, গতকাল সকালেই ওই দুজন বিদেশী তরুণ তরুণী পেরিয়ার দ্বীপের লজে এসে ওঠে। অন্যান্য ট্যুরিস্টদের চেয়ে ওরা সব ব্যাপারেই একটু আলাদা। অনেক বেশি বেপরোয়া আর প্রাণচঞ্চল।

লজের কর্তৃপক্ষের বারণ সত্ত্বেও সন্ধ্যেবেলা কখন যে এক ফাঁকে ওরা লজ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কেউ লক্ষ্য করেনি। ওরা নদীর কাছাকাছি একটা বড় গাছের নিচে বসে টেপরেকর্ডার চালিয়ে নিজেরা গান গাইতে শুরু করেছিল।

একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ কেটে গেছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদটা টাঙান রয়েছে এক গোলাকার থালার মতো। আনন্দের উল্লাসে ওরা বোধহয় আত্মহারা হয়ে পড়েছিল তাই শুনতে পায়নি কিছু। বুঝতেও পারেনি নদীর দিক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছিল এক দানব।

ওরা যখন সচেতন হলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। হঠাৎ এক প্রচন্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়লো তরুণীটি। অসহ্য যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে ফিরে তাকিয়েই আঁতকে উঠলো। তার সংগী তরুণটি আটকে পড়েছে লকলকে এক বিশাল পিচ্ছিল জিভের প্যাঁচে।

শুধু এক পলকই সেই আক্রমণকারীর দিকে তাকাবার অবকাশ পেয়েছিল তরুণীটি। এমন ভয়াবহ কোনো জীব জীবনে সে কোনোদিন দেখেনি। বিরাট হেডলাইটের মতো দুটো চোখ, জলহস্তীর মতো বিকট মুখ।

এর বেশি আর দেখার সময় ছিল না। শরীরের যন্ত্রণা ভুলে সংগীকে ওই অবস্থায় ফেলেই প্রাণরক্ষার তাগিদে দুদ্দাড়িয়ে ছুটে লজের সামনে এসে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে তরুণীটি।

লজের মধ্যেও ততক্ষণে হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে, কারণ ইতিমধ্যেই খবর পাওয়া গেছে সদ্য আগন্তুক তরুণ তরুণী দুজন সন্ধ্যের অন্ধকারে লজ ছেড়ে বেরিয়েছে, আর একটু আগেই শোনা গেছে মানুষের আর্তনাদ।

ক্যাপটেন সিং তাঁর কাহিনী শেষ করলে আমি বললাম–এ সব কথা নিশ্চয়ই আপনারা সেই আহত তরুণীটির মুখ থেকে শুনেছেন?

–হ্যাঁ। যতক্ষণ তার জ্ঞান ছিল, তার কাছ থেকে অতি কষ্টে এই বিবরণ আদায় করতে পেরেছিলেন ইন্সপেকটর নায়ার।

–ইন্সপেকটর নায়ার বুঝি এ ব্যাপারে সরকারী তদন্ত করছেন?–প্রশ্ন করি।

–হ্যাঁ। স্বভাবতই এই নির্জন শান্তিময় পেরিয়ার দ্বীপে কিছুদিন যাবৎ এই সব কান্ডকারখানায় সরকারের টনক নড়েছে। এর ওপর বিদেশী ট্যুরিস্ট নিহত হবার ঘটনায় সরকার তো রীতিমতো উদ্বিগ্ন। ইন্সপেকটর নায়ার তাঁর পুলিশ ফোর্স নিয়ে এসে আজ সারাদিন দ্বীপে তল্লাসী চালিয়েছেন, এমনকি নদীতে ডুবুরি নামাতেও বাকি রাখেননি। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। দানবটা যেন হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে হঠাৎই জলের মধ্যে হারিয়ে যায়। তার এতটুকু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

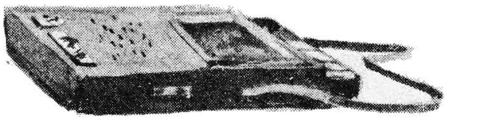

কিছুক্ষণ সময় আমরা কেউই কথা বললাম না। এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। তারপর মেঘনাদ হঠাৎ বললো–আচ্ছা ক্যাপটেন সিং, আপনি বলছেন মেয়েটি আর ছেলেটি যখন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল, সংগে ছিল একটা টেপরেকর্ডার এবং সেটার রেকর্ডিং চালু করে ওরা গান গাইছিল। তার মানে ঘটনাটা যখন ঘটেছিল সে সময়ের সমস্ত শব্দ সেই টেপরেকর্ডারে রেকর্ডিং হবার কথা। সেটার কি কোনো সন্ধান পাওয়া গেছে?

ক্যাপটেন সিং যেন লাফিয়ে উঠলেন, উত্তেজিত স্বরে বললেন–ঠিক বলেছেন মেঘনাদ ভাইয়া। টেপরেকর্ডারটার কথা আমাদের কারুর মাথাতেই আসেনি, এমনকি ইন্সপেকটর নায়ার-এর মাথাতেও না। গতকাল নদীর ধার থেকে আমরা সেই তরুণ-তরুণীর দুটি সাইড ব্যাগ এবং টেপরেকর্ডারটাও তুলে এনেছিলাম মনে আছে। এখন সেটা কোথায় আছে জানতে হবে। যাই হোক, আশা করছি আজ রাতের মধ্যেই ওটা আপনার কাছে পৌঁছে দেব–দেখুন যদি আপনার কোনো কাজে লাগে।

–সেই সংগে আর একটা জিনিস যদি সম্ভব হয়, মেঘনাদ

সোফায় হেলান দিয়ে বললো—সেই অজানা জীবটার পায়ের থাবার একটা ফটোগ্রাফ। ইন্সপেকটর নায়ারের কাছে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

একটু যেন চিন্তা করলেন ক্যাপটেন সিং, তারপর বললেন—বেশ আমি এখুনি লোক পাঠাচ্ছি। ইন্সপেকটর নায়ারকে আমার আগে থেকেই আপনার কথা বলা আছে। উনি সহযোগিতা করবেন বলেছেন।

ইতিমধ্যে রাজু ঘরে ঢুকে পড়েছে, আমাদের জন্যে আর এক প্রস্থ গরম কফি আর কাজুর প্লেট নিয়ে।

সেই রাতেই ক্যাপটেন সিং দুটি জিনিস মেঘনাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলেন—নিহত বিদেশী তরুণটির টেপ-রেকর্ডার আর সেই রহস্যময় ভয়াবহ জন্তুটার পায়ের ছাপের একটা ফটোগ্রাফ।

সৌভাগ্যের বিষয় টেপ-রেকর্ডারটা এত কান্ডের মধ্যেও মোটামুটি অক্ষত ছিল এবং তাতে সচল ক্যাসেটটি সেই ভয়ংকর সময়ের আশপাশের সমস্ত শব্দই তুলে রেখেছে।

অনেক রাত পর্যন্ত মেঘনাদকে দেখলাম সেই ক্যাসেটটা চালিয়ে কান পেতে থাকতে আর ওর সেই লাল ডায়েরিটায় কি সব নোট নিতে।

ওর পাশে বেশ কিছুক্ষণ বসে রেকর্ডিং করা ক্যাসেটের শব্দগুলো আমিও শুনেছি।

আর শোনার মতো অনেক কিছু আছেও তাতে—নিশাচর পাখির ডাক, তরুণ-তরুণীর নাচগানের উচ্ছ্বাস, তারই মধ্যে ভাল করে কান পাতলে শোনা যায় একটা ভারী কিছু লাফিয়ে আসার শব্দ—থপ্...থপ্...থপ্...

এই জান্তব পদশব্দটা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুনছিল মেঘনাদ আর মাঝে মাঝেই সেই জন্তুটার থাবার ফটোগ্রাফ আলোর ওপর রেখে কি যেন দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

মেঘনাদের এইসব কান্ড দেখতে দেখতে কখন যে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে!

জঙ্গল পাহাড়ের পাগলা সাহেব

পরদিন সকালে এক আশ্চর্য বৃদ্ধের সঙ্গে মোলাকাত হলো।

মেঘনাদ আর আমি বেরিয়েছিলাম লজের আশপাশটা একটু ঘুরে দেখার জন্যে। আমাদের সঙ্গে ছিল লজের ছোকরা বেয়ারা রাজু।

ক্যাপটেন সিং সকালবেলাতেই বেরিয়েছেন। বলে গেছেন হাসপাতালে সেই আহত বিদেশী তরুণীটিকে দেখে থানায় যাবেন ইন্সপেকটর নায়ার এর সঙ্গে কথা বলতে। যাবার আগে রাজুকে আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন। লজের সেই ছোকরা বেয়ারাটা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলে। হিন্দী জানলেও বলতে চায় না।

রাজুই আমাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব কিছু দেখাচ্ছিল।

পেরিয়ার দ্বীপের ভূ-প্রকৃতি যে সুন্দর তা তো আমরা গতকালই এখানে আসার পথে টের পেয়েছি। যদিও সময়টা বর্ষাকাল, তবু গতকাল থেকে বৃষ্টি না হওয়ায় মাটি প্রায় শুকনোই বলা চলে। তাছাড়া পাহাড়ী বর্ষায় পাথুরে মাটিতে জল দাঁড়ায় না। রাজু আমাদের সেই গাছটার কাছে নিয়ে গেল—যেখানে দুদিন আগে ভয়ংকর দানবের হাতে নিহত হয়েছে এক তরুণ আর মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে তার সঙ্গিনী।

একটা ঝাঁকড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রাজু বললো—এই সেই জায়গা স্যার।

মেঘনাদ যা খুঁজছিল তা পেল।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি না হওয়ায় মাটির ওপর যে সব ছাপ পড়েছিল তা এখনও প্রায় অবিকৃতই আছে।

সেই অজানা ভয়ংকর জীবের থাবার যে ছাপ গতরাতে ফটোগ্রাফে দেখেছিলাম এখন দেখলাম সরাসরি মাটিতে।

সত্যিই বড় অদ্ভূত সে থাবার আকার।

দৈর্ঘ্য অন্ততঃ বার ইঞ্চি তো বটেই। মনে হয় সামনে এবং পেছনের মোট চার পায়ে দুরকম থাবা আছে। তাই কোনো কোনো থাবায় চার আঙুল, কোনো থাবায় পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়েছে। পাঁচ আঙুলে থাবাগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত মনে হয় এবং মাটির ওপর দাগ পড়েছে বেশ গভীর ভাবেই। অর্থাৎ ছাপের গভীরতা ও প্রকৃতি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না জন্তুটা বিশাল এবং রীতিমতো ভারী ওজনের।

দেখতে দেখতে আমি ভাবছিলাম এমন কোনো ভয়ংকর জীব থাকতে পারে কি যা এভাবে আঁধার রাতে নদীর ভেতর থেকে বিশাল চেহারা নিয়ে উঠে আসে, তারপর নির্মম হত্যাকান্ড চালিয়ে একেবারে হারিয়ে যায় নদীর জলে!

মেঘনাদ ইতিমধ্যে গভীর অভিনিবেশ সহকারে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে সেই অজানা রহস্যময় থাবাগুলো দেখতে দেখতে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিল নদীর দিকে।

ঠিক তখনই এক অদ্ভূত হাসি শুনে ঘাড় ফেরালাম।

এক থুত্থুরে বুড়ো। পরনে একটা নোংরা প্যান্ট শার্ট, এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, চোখে পুরনো ফ্রেমের নোংরা চশমা, তার একদিকের ডাঁটিটা ভেঙে গেছে, সে জায়গায় একটা দড়ি দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। পায়ে বিবর্ণ ক্যাম্বিসের জুতো।

বুড়োটা একটু দূরে একটা পাথুরে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েই হাসছে—হিঃ...হিঃ...হিঃ...।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পরিষ্কার ইংরাজিতে বললো—বলি তোমরা বুঝি পুলিশের লোক, আমার দুষ্টু

বাচ্চাটার পায়ের ছাপ ধরে তার তল্লাশী করছো? কিন্তু তাকে খুঁজে পাবে তোমাদের সে সাধ্য কি- হিঃ... হিঃ...হিঃ...হিঃ...

রাজুর দিকে তাকাতে রাজু বললো—ও পাগলা সাহেব। জঙ্গলের ভেতরে পাহাড়ের ওপর একটা ভাঙা বাংলোয় একা একা থাকে। কারুর সঙ্গে মেশে না। কেউ ওর বাংলোর সামনে গেলেই একটা বাঘের মতো কুকুর আছে লেলিয়ে দেয়। তাই বাংলোর কাছেও কেউ ঘেঁষে না।

—হিঃ...হিঃ...হিঃ...হিঃ...

বুড়ো আবার হেসে উঠলো, তারপর মাথা দুলিয়ে বললো—পারবি না রে, আমার বাচ্চাকে তোরা কেউ খুঁজে পাবি না। বাচ্চা আমার বড্ড অভিমানী। কিন্তু কেন আমার বাচ্চা দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছে তা একমাত্র আমি বুঝি।

এসব কি বলছে ওই বৃদ্ধ! ও কি সত্যিই এক উন্মাদ?

এর মধ্যে মেঘনাদ কখন একসময় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি। চমক ভাঙলো ওর কণ্ঠস্বর শুনে।

—আপনার বাচ্চার অভিমানের কারণটা কি প্রফেসর?

মেঘনাদের কথাবার্তাও কম হেঁয়ালিপূর্ণ নয়।

দেখলাম মেঘনাদের কথায় চমকে একবার ওর দিকে তাকালো বৃদ্ধ। ঝাপসা কাঁচের ভেতর ফুটে উঠলো দুটি অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি, তারপর আবার সে কি হাসির ঘটা!

মেঘনাদ কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলো না, বললো—জানেন কি প্রফেসর, আপনার 'বাচ্চাটি' এখন মানুষের এক ভয়ংকর শত্রু। ওকে আমরা খুঁজে বার করে শেষ করে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত চিৎকার শোনা গেল বৃদ্ধের কণ্ঠে—থামো হে নির্বোধ। এ কথা বলতে লজ্জা করে না তোমাদের। আমার ওই বাচ্চার তোমাদের কতটুকু ক্ষতি করার সাধ্য—তার চেয়ে মানুষের অনেক বড় শত্রু তোমরাই, মানুষেরাই। হিরোসিমায় এ্যাটম বোম ছুঁড়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে কে? আজও প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন সীমান্তগুলিতে যুদ্ধে মরছে শত শত মানুষ। কে মারছে তাদের? আর ঘরের পাশে ভূপালে এই তো সেদিন গ্যাস লিক করে মরলো, পঙ্গু হলো কত হাজার মানুষ—কাদের অপদার্থতা আর অমানুষিক লোভের পরিণামে? মহাকাশে যুদ্ধের মহড়া দিয়ে কারা অস্ত্র শানাচ্ছে মানুষ জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে...তোরা...তোরা মানুষেরাই আজ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।

আর এক নতুন রহস্য

বিকেলের দিকে ইন্সপেকটর নায়ারকে সঙ্গে নিয়ে লজে ফিরলেন ক্যাপটেন সিং।

ইন্সপেকটর এসেছেন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে।

ইন্সপেকটর নায়ার মানুষটি ভাল। মেঘনাদের দু'হাত ঝাঁকিয়ে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বললেন—আপনার কথা ক্যাপটেন সিং-এর কাছে আগেই শুনেছি মিঃ ভরদ্বাজ। আপনি যদি এ দ্বীপের আতংক মোচনে আমাদের সাহায্য করেন আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

কিছুক্ষণ এটা-ওটা কথার পর আমরা আসল প্রসংগে এলাম।

ইন্সপেকটর নায়ারের মুখে শুনলাম, লজের সেই বিদেশী তরুণীটি, যে সে রাতে অজানা দানবের থাবায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। সারা শরীরে নাকি ঘা ছড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন তার শরীরে রেডিও এ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয় দূষণ পাওয়া যাচ্ছে। তাকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে।

—রেডিও এ্যাকটিভিটি! মেঘনাদ আপন মনেই বিড়বিড় করলো।

এর পর আমি আজ সকালে দেখা জঙ্গল পাহাড়ি বাংলোর সেই আশ্চর্য পাগলা সাহেবের প্রসংগ তুললাম।

ক্যাপটেন সিং সাহেব সম্পর্কে যা বললেন তার মধ্যে নতুন কিছু শোনা গেল না। রাজুর মুখে আগেই শুনেছি। আসলে ওই সাহেবকে নিয়ে কখনও কারুর মাথা ঘামাবার দরকার হয়নি।

ইন্সপেকটর নায়ার কিন্তু সব শুনে একটা নতুন তথ্য জানালেন, সেটাও কম বিস্ময়কর নয়।

তিনি বললেন—অর্ণববাবু, আপনি বলছেন সেই পাগলা সাহেবের পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো ছিল। মনে হচ্ছে আজ একটা নতুন রহস্যের উদ্ঘাটন হলো।

—নতুন রহস্য!

—হ্যাঁ। রহস্যটা হলো, প্রায় যে কবারই সেই অজানা দানব হত্যাকান্ড চালিয়ে ফিরে গেছে তার বিশাল থাবার ছাপের কাছাকাছি ক্যাম্বিসের জুতো পরা মানুষের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। এটার অর্থ এতদিন বুঝতে পারছিলাম না।

ক্যাপটেন সিং বললেন—এর মানে আপনি বলতে চান ওই পাগলা সাহেবই সেই অজানা ভয়ংকর জীবটাকে মানুষ বা জীবজন্তুর ওপর লেলিয়ে দিচ্ছে।

কী ভয়ানক কথা!

আমি বললাম—অন্ততঃপক্ষে সেই দানবটার সঙ্গে সেই সাহেবের কোনো এক প্রকার সম্পর্ক যে আছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে, অমন একটা জানোয়ারকে 'বাচ্চা' সম্বোধন থেকে।

ইন্সপেকটর নায়ার চোখ কপালে তুলে বললেন—কি জানি মশাই, এতকাল পুলিশ লাইনে চাকরি করছি এমন আজগুবি ব্যাপার-স্যাপার চোখে দেখা তো দূরের কথা, কানেই কখনও শুনিনি।

মেঘনাদ এতক্ষণ চুপচাপ বসে কি যেন ভাবছিল, এইবার নীরবতা ভেঙে বললো—এভাবে বসে বৃথা জল্পনা-কল্পনা করে লাভ আছে কি? তার চেয়ে আমরা আগামীকালই এই পেরিয়ার দ্বীপের জঙ্গল পাহাড়ের মাথায় পাগলা সাহেবের

সেই রহস্যময় বাংলোয় হানা দেব। আমার ধারণা, সেখানে কিছু সূত্র মিলতে পারে।

মৃত্যু কী ভয়ংকর

বেরুবার ব্যবস্থা আমাদের তখন সম্পূর্ণ। আমরা চারজন চারটে রিভলবার নিয়েছি। এ ছাড়া মেঘনাদের সেই বিখ্যাত কুকুরিটা তো আছেই। সুতরাং বাংলোতে ঢুকতে গেলে পাগলা সাহেব যদি ব্লাড হাউন্ড লেলিয়েও দেয় তবে মেঘনাদ শুধুমাত্র ওই কুকুরির সাহায্যেই মোকাবিলা করতে পারবে।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম রাজুর জন্যে। ভোরবেলা ও কি একটা কাজে বেরিয়েছে। এক্ষুণি ফিরে আসার কথা।

সকাল নটা নাগাদ হাঁপাতে হাঁপাতে রাজু এল। উত্তেজনায় ওর চোখ দুটো যেন ফেটে বেরুচ্ছে।

–কি ব্যাপার রাজু? কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে।

–হাঁ সাব। খবর সাংঘাতিক। গতকাল রাতে পাগলা সাহেব খুন হয়েছে। বাংলো পুড়ে ছাই। সেই বাঘের মতো কুকুরটা আর সাহেব দুজনেই মরে পড়ে রয়েছে বাংলোর পেছনে।

–সে কি! কে বললো তোমায় এ কথা?

–এক স্থানীয় কাঠুরে সাব। দিনের বেলা জংগলে তো কোনো ভয় নেই তাই ঢুকেছিল কাঠ কাটতে। দূর থেকে জংগল পাহাড়ের মাথায় ধোঁয়া উড়তে দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায়–

মেঘনাদ ব্যস্তভাবে বললো–ব্যস, আর কোনো কথা নয়। আমরা এক্ষুণি একবার স্পটে যাবো। রাজু, তুমিও চল।

তক্ষুণি আমরা পাঁচজন বেরিয়ে পড়লাম জংগল পাহাড়ের সেই বাংলোর উদ্দেশে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পেরিয়ার জংগলে পাহাড়ের ওপর সেই বাংলোর সামনে গিয়ে হাজির হলাম।

বাংলোটাকে এখন অবশ্য আর চেনার উপায় নেই। প্রায় গোটাটাই পুড়ে গেছে।

চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে পোড়া কাঠ, টেবিল-চেয়ারের টুকরো, কিছু তৈজসপত্তর, সেই সংগে কাঁচের টেস্টটিউব, ভাঙা জার, গবেষণার সরঞ্জাম আর সম্ভবতঃ গবেষণার প্রয়োজনেই রাখা খরগোশ, ব্যাঙ, গিনিপিগ, টিকটিকি ইত্যাদি প্রাণীর দেহাবশেষ ছড়িয়ে আছে পোড়া বাংলোর মধ্যে।

এসবের মধ্যে একটা জিনিস পরিষ্কার হলো–যাকে এ এলাকার সবাই পাগলা সাহেব বলে জানে। আসলে তিনি ছিলেন এক বিজ্ঞানী। কিন্তু লোকচক্ষুর আড়ালে কি গবেষণা চালাচ্ছিলেন তা বুঝি আর জানা গেল না।

তেমনই বোঝা যাচ্ছে না বাংলোটা হঠাৎ পুড়লো কি করে?

এর পর বাংলোর পেছনে পাহাড়টা যেখানে নদীর দিকে নেমে গেছে সেদিকে কিছুটা এগুতেই প্রথমে চোখে পড়লো সেই নিশীথ দানবের বিশাল পায়ের ছাপ।

ইন্সপেকটর নায়ার বললেন–এই দেখুন মিঃ ভরদ্বাজ, অজানা জন্তুটার পায়ের ছাপের কাছেই আর একটা ক্যাম্বিসের জুতো পরা পায়ের ছাপ রয়েছে।

ক্যাপটেন সিং বললেন–নিঃসন্দেহে ওই সাহেবের।

মেঘনাদ মাথা না তুলে বললো–এখানে আরও একটা ছাপ রয়েছে লক্ষ্য করুন। কুকুরের পায়ের ছাপ। সাহেবের কুকুর।

কথা বলতে বলতে আরও কিছুটা পথ আমরা এগিয়ে এসেছি নদীর দিকে।

আর তখনই চোখে পড়লো বীভৎস দৃশ্যটা।

পাশাপাশি দুটো মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

এমন ভয়ংকর মৃত্যু জীবনে কোনোদিন দেখিনি।

ব্লাড হাউন্ডের মতো হিংস্র কুকুরকেও হত্যা করে শরীর থেকে মাংস খুবলে খেয়ে যেতে পারে যে জীব সে যে কী ভয়ংকর দানব তা সহজেই অনুমেয়। কুকুরের কাছাকাছি সাহেবের দেহটাও পড়ে রয়েছে। তাকেও রেহাই দেয়নি তার বাচ্চা–সেই দানব।

দেখতে দেখতে মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করে উঠলো।

হঠাৎ মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শুনলাম। মৃতদেহের পাশে হত্যাকারী দানবের পায়ের থাবার দাগ পরীক্ষা করতে করতে রাজুর উদ্দেশে বললো, গতকাল রাতেও বৃষ্টি হয়েছে, তাই না?

–হাঁ সাব। রাত দশটার পর থেকে টানা একঘণ্টা মতো বৃষ্টি হয়েছিল।

–হুঁ! মেঘনাদ উঠে দাঁড়িয়ে ইন্সপেকটর নায়ারকে বললো–চলুন, ফেরার পথে পোড়া বাংলোটা আর একবার ঘুরে যাই।

পোড়া বাংলোর কাছে আমরা আর একবার ফিরে এলাম।

আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ও ঢুকলো বাংলোর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। ফিরে এল বেশ কিছুক্ষণ পর। ওর হাতে প্রায় দগ্ধ একটা ডায়েরি মতো রয়েছে।

জিগ্যেস করতে বললো পাগলা সাহেবের পোড়া ল্যাবরেটরির দগ্ধ জিনিসপত্তরের মধ্যে সেটা ও খুঁজে পেয়েছে। যদি কোনো কাজে লাগে সেই ভেবে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কি কাজে লাগবে কে জানে। পাগলা সাহেব সত্যিই যদি একজন বিজ্ঞানী হন তবে তাঁর ডায়েরি খুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই–কিন্তু জিনিসটা প্রায় দগ্ধই মনে হচ্ছে–যে কটা পাতা আস্ত আছে তাও কালচে হয়ে গেছে।

তখনকার মতো এ সব নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। জানতাম লাভ হবে না।

ফেরার পথে মেঘনাদ ইন্সপেকটর নায়ারকে বললো–আগেকার লাশগুলো কি করেছেন জানি না, কিন্তু এগুলো বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন। আমার মনে হচ্ছে সেই আহত ট্যুরিস্ট মেয়েটির মতো এই দুটি মৃত শরীরেও তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাবে।

—বলেন কি!

—এর বেশি আপাততঃ কিছু জানতে চাইবেন না।

সূত্র

ইতিমধ্যেই আশপাশ এলাকায় গুজব এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। রাতারাতি ট্যুরিস্ট লজও প্রায় খালি হয়ে গেল। কে আর ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে এসে বিদেশ-বিভূঁইতে বেঘোরে প্রাণটা দিতে চায়। রিপোর্টাররাও আসছে দলে দলে। ঘটনার চেয়েও তাদের বিবরণ আরও ভয়ঙ্কর।

পেরিয়ার দ্বীপে পর্যটন ব্যবসা বুঝি লাটে উঠলো।

আর সে কারণেই পর্যটক আবাসের অধিকর্তা ক্যাপটেন সিং এবং সেই সঙ্গে সরকারী শান্তি-শৃঙ্খলার রক্ষক ইন্সপেকটর নায়ার রীতিমতো উদ্বিগ্ন।

ইতিমধ্যে একদিন আমরা ঘুরে এসেছি এরনাকুলাম হাসপাতালে। নিশীথ দানবের আক্রমণে আহত সেই ট্যুরিস্ট মেয়েটি সেখানে এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে চলেছে। ইন্সপেকটরের অনুরোধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মেঘনাদকে অনুমতি দিল মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। মেঘনাদ বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ জিজ্ঞাসাবাদ করলো এবং সমস্ত প্রশ্নোত্তর তুলে রাখলো সঙ্গের টেপরেকর্ডারে।

সেখানেই মেঘনাদের পরিচয় হলো প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে। এরনাকুলাম সায়েন্স ইন্সটিট্যুশানের জীবতত্ত্বের গবেষক। তিনি নিজেও বর্তমানের এই অদ্ভূত বিষয়টিতে আগ্রহী মনে হলো, সেই কারণেই হাসপাতালে এসেছিলেন ট্যুরিস্ট মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা বিশেষভাবে জানতে।

মেঘনাদের সঙ্গে প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তির বেশ খানিকটা সময় আলোচনা হলো। মেঘনাদের কাছে তখন সেই অদ্ভুত দানবের পায়ের ফটোগ্রাফ আর পোড়া বাংলোয় পাওয়া আধপোড়া ডায়েরিটাও ছিল।

ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু তখন আমার পক্ষেও জানা সম্ভব হলো না—কারণ সবটাই ছিল 'টপ্ সিক্রেট'।

এর পর থেকে দুদিন যাবৎ মেঘনাদকে দেখছি গম্ভীরভাবে সর্বক্ষণই কি যেন ভেবে চলেছে আর কখনও টেপরেকর্ডার চালিয়ে সেই অজানা দানবের পায়ের আওয়াজ শুনছে অথবা সেই ট্যুরিস্ট মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তার অংশগুলো নূতন করে বাজাচ্ছে। পোড়া ডায়েরিটা অবশ্য ওর কাছে দেখলাম না, একবার শুধু জিজ্ঞেস করতে জানিয়েছে, ওটা প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তির জিম্মায় আছে।

তৃতীয় দিনে আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। ওর পাশে বসে জিগ্যেস করলাম—হ্যাঁরে, রহস্যভেদীর এ্যাসিসটেন্ট হিসেবেও কি তোর ভাবনার কোনো ভাগই এখন আমি পেতে পারি না?

মেঘনাদ আমার কথায় মুখ তুলে তাকিয়েছে। ওর দু'চোখের দৃষ্টিতে অপার রহস্যময়তা। বলেছে—বেশ, তাহলে বল তো বন্ধু, কোন জন্তু থপ্ থপ্ শব্দে লাফিয়ে চলে আর সন্ধ্যের পর বেরিয়ে লম্বা জিভ বার করে শিকার ধরে? কোন জন্তুর পাহাড়ের মতো দেহ, গরুর গাড়ির চাকার মতো চোখ আর জলহস্তীর মতো মাথা?

আমি একটু ভাবনার ভান করে বললাম—রামগড়ুরের ঠাকুর্দা?

মেঘনাদ বিরক্ত হয়ে বলেছে—তুই একটা রাম বুদ্ধু!

মেঘনাদের হেঁয়ালি

পরদিন সকালেই মেঘনাদ বেরিয়ে গেল। সঙ্গে এ্যাটাচির মধ্যে ভরে নিয়ে গেল টেপরেকর্ডারটা।

সেদিন আর ফিরলো না মেঘনাদ। ফিরে এল সন্ধ্যের পর। তারপর ক্যাপটেন সিংকে ডেকে বললো—আপনি আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই ইন্সপেকটর নায়ারকে ডেকে পাঠান। জরুরী আলোচনা আছে।

ক্যাপটেন সিং বললেন—মেঘনাদ ভাইয়া, আপনার মতলবটা কি তা তো কিছু বুঝতে পারছি না। পুরো একটা দিন কোথায় ঘুরে এলেন?

—প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে একবার দেখা করার দরকার ছিল। একটা বিশেষ জিনিসের অর্ডারও দিয়ে আসতে হলো। সেটা খুঁজে বার করতেই দেরি হলো। আশা করছি আগামীকাল সকালের মধ্যেই সেটা এসে পড়বে। তারপরই আমরা কাজ শুরু করতে পারবো।

—বিশেষ জিনিস! কাজ! এসবের অর্থ কি? এবার আমি কৌতূহল প্রকাশ করি।

মেঘনাদ শুধু একটু হাসলো, তারপর ওর সেই হেঁয়ালি ভরা ছড়ায় জবাব দিল:

গোকুল থেকে আসছে বাণ
মরবে দানব বাঁচবে প্রাণ
এর বেশি যে শুনতে চান
মগজটাকে শানিয়ে যান।

শুনতে শুনতে আমি মাথা চুলকোতে শুরু করলেও ক্যাপটেন সিং হেসে উঠে বললেন—সাবাস ভাইয়া। জব্বর বলেছেন।

বাণ নয়—বেলুন

পরদিন সকালেই একটা লোক এসে হাজির হলো পেরিয়ার দ্বীপের লজে। হাতে এক বড়সড় প্যাকেট। লোকটা মেঘনাদের

হাতে প্যাকেট দিয়ে দাম আর বকশিস নিয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে চলে গেল।

প্রশ্ন করলাম—এর মধ্যেই কি গোকুল থেকে আমদানি করা 'বাণ' আছ নাকি, কিন্তু প্যাকেটের আকার দেখে তো মনে হচ্ছে আছে বোমা।

মেঘনাদ বললো—বোমাও নয়—বেলুন।

—বেলুন! এবার আমি আকাশ থেকে পড়লাম। হঠাৎ এ সময় বেলুনের দরকার হলো কেন মেঘনাদের?

কিন্তু জানতাম এখন আর এসব কথা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। এক্ষুণি হয়তো নতুন হেঁয়ালির ছড়া শুনিয়ে দেবে। অতএব চুপ মেরেই রইলাম।

বিকেলের দিকে ইন্সপেকটর নায়ার এলেন।

তারপর লজের অফিস ঘরে মন্ত্রণা বসলো।

আতঙ্ক-দ্বীপের আতঙ্ক মোচনে মেঘনাদের মতলব সম্পর্কে মন্ত্রণা!

কিন্তু মেঘনাদের পরিকল্পনার কথা শুনে আমরা সবাই তাজ্জব হলাম। এ কি সম্ভব! এমনকি ক্যাপটেন সিংও সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন—মেঘনাদ ভাইয়া, এভাবে কি সত্যিই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, আপনার ধারণা?

মেঘনাদ শুধু বললো—এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

বুঝলাম মেঘনাদ যখন গোঁ ধরেছে—সম্ভব বা অসম্ভব হোক সে কাজ ও করবেই!

মেঘনাদের পরিকল্পনা

কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে রয়েছে পেরিয়ার দ্বীপের প্রকৃতিতে।

দূরে পর্যটন আবাসটা যেন স্বল্প আলোর অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা। আরও কিছুদূরে পাহাড় আর জঙ্গল অন্ধকার-মাখা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাহাড়ী বৃষ্টি। পায়ের নিচে এখন আর জল দাঁড়িয়ে নেই। সব জল নেমে গেছে পেরিয়া নদীতে।

আশপাশের জলা আর নদীর ধার থেকে একনাগাড়ে শোনা যাচ্ছে অসংখ্য ব্যাঙের ডাক—গ্যাঙর গ্যাঙ... গ্যাঙর গ্যাঙ...

হঠাৎ সব কিছু ছাপিয়ে জেগে উঠলো নতুন এক গর্জন—গ্যা...ও...র...গ্যা...ঙ...গ্যা...ও...র...গ্যা...ও...ঙ...!

ও কার গর্জন?

নিশীথ দানবের আবির্ভাব ঘটলো নাকি! এ কি তারই চিৎকার!

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তাছাড়া সে দানব নিঃশব্দে এসে হত্যা করে যায়। তার হুংকার কেউ কখনও শোনেনি।

আসলে এই নিশীথ প্রকৃতিতে পেরিয়ার দ্বীপের বুকে আজ অভিনীত হতে চলেছে এক নতুন নাটক।

এ নাটকের প্রধান নির্দেশক মেঘনাদ ভরদ্বাজ আর প্রধান ভূমিকায় একটা ব্যাঙ।

হ্যাঁ ব্যাঙ। তবে সত্যিকার ব্যাঙ নয়। বিশাল বিচিত্র অন্ততঃপক্ষে বিশ ফুট উঁচু একটা রবারের ব্যাঙ। ব্যাঙ-বেলুনও বলা যায়।

বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।

নিশীথ রাতে অজানা দানব নিধনের পরিকল্পনাটা আজই সকালে মেঘনাদ খুলে বলেছে।

সে পরিকল্পনা যেমন আশ্চর্য তেমনি অদ্ভুত!

ইন্সপেকটর নায়ার এমনকি ক্যাপটেন সিং পর্যন্ত প্রথমে এ পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্পর্কে রীতিমতো সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মেঘনাদ আত্মবিশ্বাসে অটল।

শেষ পর্যন্ত রাজী না হয়ে পারা যায়নি। এর মধ্যে বিশেষ করে ইন্সপেকটর নায়ার-এর অবস্থাটা হলো সেই জলে ডোবা ব্যক্তির খড়কুটো ধরার মতো। পেরিয়ার দ্বীপের আতঙ্ক বুঝি তাঁর সারা জীবনের পুলিশি সুনামটাকেই ভরাডুবি করতে বসেছে।

এরপর পরিকল্পনামাফিক কাজ করার পালা।

প্রথমে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা।

রাত ঘনিয়ে এলো এবং আটটা নাগাদ কয়েক পশলা বৃষ্টি পড়লো।

তারপরই কাজ শুরু করলো মেঘনাদ।

প্রথমে আজ সকালে বিশেষ অর্ডারে আনা সেই প্যাকেট খুলে সেই বিচিত্র বেলুনটা বার করা হলো এবং পাম্প করে হাওয়া ভরতেই তার আয়তন বাড়তে বাড়তে আকার দাঁড়ালো বিশালাকৃতি এক ব্যাঙের মতো।

এইবার সেটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো নদীর ধারে সেই গাছটার নিচে—যেখানে দিনকয়েক আগে বিদেশী ট্যুরিস্ট দুজন অজানা দানবের কবলে পড়েছিল।

এর পরের ঘটনা আরও বিস্ময়কর।

সেই গাছটার নিচে বিরাট বেলুন-ব্যাঙটা বসিয়ে রেখে তার পেছন থেকে চালু করা হলো টেপরেকর্ডারে একটা বিশেষ ক্যাসেট। সেই ক্যাসেট থেকে এ্যামপ্লিফায়ার মারফৎ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এক ভয়ংকর আওয়াজঃ

গ্যা...ও...ও...র...গ্যা...এ...ঙ...গ্যাঁ...ও...ও...র... গ্যা... এ...এ...ঙ...!

আওয়াজটা ব্যাঙের 'গ্যাঙর-গ্যাঙ' ডাকের সঙ্গে মিললেও বহুগুণ বর্ধিত হয়ে তা এখন ভীষণ গর্জনের মতোই বোধ হচ্ছে।

এই মুহূর্তে এমন ভয়ংকর গর্জন সৃষ্টির কারণ কি মেঘনাদ খুলে বলেনি।

কিন্তু কারণ যাই হোক ইতিমধ্যেই সেই হুংকার ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে দিগ্‌দিগন্তে।

এক ভীতিময় পরিবেশ। ভীত-স্তব্ধ হয়ে আশপাশের

ব্যাঙগুলির ডাক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে মেঘনাদের নির্দেশে আমরা তো বটেই ইন্সপেকটর নায়ারের পুলিশ ফোর্সের সিপাইরাও সশস্ত্র। আমরা সবাই অপেক্ষা করতে শুরু করেছি নাটকের পরবর্তী দৃশ্যের জন্য।

মেঘনাদের ধারণা তার বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা যদি সঠিক হয় তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতীক্ষার অবসান হবে।

এক সময় সত্যিই প্রতীক্ষার অবসান হলো।

পেরিয়া নদীর বুকে আলোড়ন উঠলো। জল থেকে উঠে আসছে মূর্তিমান শয়তানের মতো বিশালাকৃতি এক জন্তু-দানব।

রাতের প্রকৃতি শিহরিত!

তুমুল লড়াই

নদীর ভেতর থেকে উঠে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে জন্তু-দানবটা।

ভরা জ্যোৎস্নার আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মতো উঁচু তার দেহটা। চ্যাপটা ধরনের দেহ,মাথা আর ধড় দুই অংশে বিভক্ত। মাঝে মাঝে বিকট হাঁ করছে। মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে লকলকে লম্বা জিভ। মাথার ওপর গরুর গাড়ির চাকার মতোই বিশাল দুটি চোখে যেন নরকের আগুন।

কি ধরনের জন্তু ওটা! পৃথিবীতে এমন জন্তুর খোঁজ আগে কেউ কখনও পেয়েছে?

থপ্... থপ্... থপ্... লাফিয়ে লাফিয়ে জন্তু-দানব ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

ওর লক্ষ্য গাছের নিচে ওই বেলুন-ব্যাঙটা—যেখান থেকে টেপরেকর্ডার মারফৎ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এক বিচিত্র গর্জন।

আতংকে বায়ুপ্রবাহ পর্যন্ত যেন থেমে গেছে। গাছের পাতা নড়ছে না, দৈত্যের মতো পাহাড়, জংগল আর জড়সড় ট্যুরিস্ট লজটাও রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে—কি হয়! কি হয়!

মেঘনাদের চিৎকার শোনা গেল—ইন্সপেকটর নায়ার, সবাইকে পোজিশান নিতে বলুন, সম্ভব হলে জন্তুটাকে বন্দী করতে হবে।

ইন্সপেকটর নায়ারের নির্দেশ শোনা গেল—সিপাহীলোক, টেক পজিশান।

সংগে সংগে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল ইন্সপেকটর নায়ারের সিপাহী ফোর্স।

আর তারপরই শুরু হলো কান্ডটা।

সেই ভয়ংকর জন্তু-দানবটা খুব শীগগির বুঝতে পারলো তাকে ঠকিয়ে ফাঁদে ফেলা হয়েছে, আর তারপরই সে ভীষণ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়লো সিপাহীদের ওপর।

রাক্ষুসে লকলকে আঠাল জিভে জড়িয়ে নিয়ে মুখে তুলে আছড়ে ফেললো সামনের সিপাহীটিকে। তার ভারী দেহের ঝটকায় আর একজন ছিটকে পড়লো শক্ত পাথরের ওপর। ভেঙে গেল বুঝি হাড়গোড়।

সে এক মরণপণ লড়াই।

সিপাহীরা এবার একযোগে গুলি চালাতে শুরু করেছে। রক্ত ঝরছে দানবটার শরীর থেকে, কিন্তু তবু তাকে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না। নতুন উদ্যমে তাড়া করছে আক্রমণকারীদের। এই সংগে একধরনের বিষাক্ত তরল ছুঁড়ছে শরীরের গ্রন্থি থেকে। উঃ, কী উৎকট গন্ধ!

ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জন সিপাহী আহত। মারাও পড়েছে দুজন।

সিপাহীদের মনোবল আর বোধ হয় বজায় রাখা যাবে না। এবার বোধহয় ওরা পালাতে শুরু করবে এই বিভীষিকার কবল থেকে। কারণ শুধু মাত্র বন্দুকের গুলিতে ওকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়।

ঠিক এমনই মুহূর্তে এক বিস্ফোরণ ঘটলো। পাহাড়ের মতো দেহ নিয়ে সেই দানব হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটির ওপর। বার কয়েক কেঁপে শরীরটা তার স্থির হয়ে গেল। কিছু কিছু অংগপ্রত্যংগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার শরীর থেকে। রক্ত ঝরছে গলগল করে।

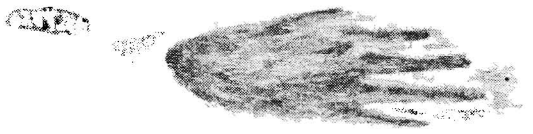

প্রাক্তন মিলিটারী অধিনায়ক ক্যাপটেন সিং আর কোনো উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়েছেন। বন্দুকের গুলি হজম করলেও গ্রেনেডের মতো বিস্ফোরকের সামনে টিকে থাকতে পারেনি দানব-জন্তুটা।

সত্যিই এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। মেঘনাদও নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছে।

ইতিমধ্যে সারা নদীর তীর আলোকিত করে জ্বলে উঠেছে তীব্র আলো। এ ব্যবস্থাও আগে থেকেই ছিল।

এর পর সবাই মিলে দানবটার কাছে এগিয়ে যাবার উপক্রম করতেই মেঘনাদ হেঁকে উঠলো—হুঁশিয়ার। ওর একেবারে কাছে যাবেন না কেউ। ছোঁবেন না ওর শরীর। ও দেহ মারাত্মক তেজস্ক্রিয়!

আমরা সবাই থমকে দাঁড়ালাম।

একটু দূরেই পড়ে রয়েছে সেই প্রায় তিরিশ ফুট আকারের ছোটখাট একটা পাহাড়ের মতো সেই ভয়ংকর কুৎসিত চেহারার দানবটা, সারা শরীর ওর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গ্রেনেডের বিস্ফোরণে উড়ে গেছে একটা থাবা এবং কাঁধের কিছুটা অংশ।

এখন ওটা মৃত। থেমে গেছে সমস্ত হিংস্রতা, শয়তানি!

মেঘনাদ বললো—ব্যবস্থা আমার আগে থেকেই করা

আছে। আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই এরনাকুলাম সায়েন্স ইন্সটিট্যুশান থেকে প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি লোকজন নিয়ে আসবেন। ওঁরাই ওটাকে তুলে নিয়ে যাবেন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য।

গ্যাঙর গ্যাঙ

মেঘনাদ হেঁয়ালি করলো:

বন্ধ ঘরের ব্যাঙ
ডাকলো গ্যাঙর গ্যাঙ,
বিজ্ঞানীর 'বাচ্চা শিশু'
গবেষণায় দানব পশু।
পেরিয়ারের আতঙ্ক—
মিললো কিনা অঙ্ক?

আমি অধৈর্য ভাবে বললাম—ওসব ছড়ার মিল-টিল এখন ভাল লাগছে না। আসল রহস্যটা বল, ওটা যে আসলে ব্যাঙ তুই বুঝলি কখন?

কথা হচ্ছিল পেরিয়ার দ্বীপে ক্যাপটেন সিংএর পর্যটন আবাসের অফিস ঘরে বসে। মেঘনাদই মূল বক্তা। আমরা শ্রোতা।

ইতিমধ্যে একটা দিন কেটে গেছে।

কথামতো আজ দুপুর নাগাদ জীবতত্ত্ব প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি নিজে এরনাকুলাম সায়েন্স ইন্সটিট্যুশানের কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে এসেছিলেন। নদীর ধারে তখনও পড়েছিল গতরাতে যুদ্ধে নিহত সেই ভয়ঙ্কর জন্তু-দানব। মেঘনাদের পরামর্শ মতোই সেই তেজস্ক্রিয় পাহাড়প্রমাণ দেহটি অত্যন্ত সতর্ক প্রহরায় রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই সে দেহে দ্রুত পচন ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে সামনে এগোয় কার সাধ্য! প্রহরী দুজনের মধ্যে একজন তো গন্ধের ঠ্যালায় অসুস্থই হয়ে পড়েছে। অন্যজনের অবস্থাও ভাল নয়।

প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি বিশেষ কৌশলে সেটি তুলে নিয়ে গেলেন। উনি এটির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চান।

সন্ধ্যের পর আমরা সবাই লজের বাংলোর মুখোমুখি বসেছি এই আশ্চর্য রহস্যের মূল উৎসটা জানার অভিপ্রায়ে।

মেঘনাদ বললো—সব ব্যাপারটা তাহলে গোড়া থেকেই খুলে বলি।

মেঘনাদ শুরু করলো:

—আমার প্রথম সন্দেহ হয় যখন অজানা দানবের পায়ের ছাপ দেখি। হাতির চেয়েও বড় কিন্তু হাতির মতো পা নয়। উঠে আসে নদীর ভেতর থেকে, প্রতিবার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ফিরেও যায় নদীতে। এ কোন জাতের উভচর প্রাণী হতে পারে। পায়ের ছাপ নিয়ে অনেক দিক থেকে পর্যবেক্ষণ চালালাম—অবশেষে মিল পেলাম ব্যাঙের পায়ের পাতার সঙ্গে।

এই সূত্র ধরে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু করলাম। দেখলাম, বৃষ্টি হওয়া এবং ব্যাঙেদের ডাকের সঙ্গেও কোথায় একটা যোগ আছে। জঙ্গল পাহাড়ের সেই রহস্যময় বিজ্ঞানীর হেঁয়ালি ভরা কথাবার্তার মধ্যেও পেলাম সূত্রের সন্ধান। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই সেই দানবের হাতে তিনি প্রাণ হারালেন। কিন্তু তাঁর পোড়া বাংলোর ভাঙা জিনিসপত্রের মধ্যে পেলাম তাঁর ডায়েরির গোটাকয়েক পোড়া পৃষ্ঠা।

—কি ছিল সেই পৃষ্ঠায়? ক্যাপটেন সিং কথার মধ্যেই প্রশ্ন করলেন।

—আমার পক্ষে তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। জীববিজ্ঞানী প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তির হাতে সেগুলো আমি তুলে দিয়েছি। সম্ভবতঃ তাতে গবেষণা সংক্রান্ত কিছু নোটস ছিল, যদিও আগুনে পুড়ে তা এখন আর বোঝার অবস্থায় নেই।

কিন্তু আর কিছু না বুঝি, ওই ডায়েরির পাতায় চোখে পড়েছিল কুনো ব্যাঙের কয়েকটা নানা ধরনের ডায়াগ্রাম। আঁকার গুরুত্ব দেখে মনে হয়েছে ওই উভচর জীবটির ওপর বিশেষ কোনো পরীক্ষা চালান হচ্ছিল। ডায়েরিটা প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তির হাতে তুলে দেবার সময় আমার অনুমানের কথাটাও ওঁকে জানালাম। আর তারপরই আমি আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হই।

মেঘনাদের কথার মধ্যে আবার বাধা দিয়ে বললাম—কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না, একটা ছ'ইঞ্চি আকারের কুনো ব্যাঙ কোন আশ্চর্য জাদুতে তিরিশ ফুট দৈর্ঘ্যের দানবে পরিণত হলো? তুই কি মনে করিস মেঘনাদ যে ওকে দানব বানিয়ে সেই পাগলা বিজ্ঞানী কোন বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিল?

মেঘনাদ বললো—তোর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমার সঠিক জানা নেই। তবে বিজ্ঞানী তো জাদুকর নয়। সেই বিজ্ঞানী ব্যাঙটার ওপর নিশ্চয়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। হয়তো তার দানব আকৃতি আর প্রকৃতির মূলে প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া।

—তেজস্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া!

—আমার তাই বিশ্বাস। মেঘনাদ সোফায় হেলান দিয়ে বললো—যে কোনো বিজ্ঞান-গবেষণাতেই ব্যাঙের ওপর পরীক্ষা চালাতে পছন্দ করেন বিজ্ঞানীরা। তোরা তো জানিস শরীরবৃত্তিয় কারণে মানুষের সঙ্গে ব্যাঙের প্রচুর মিল। আর এই ব্যাঙ হলো উভচর শ্রেণীর অন্তর্গত সেলিয়েনসিয়া বা অ্যানিউরা বর্গের প্রাণী। এরা জীবনের কিছু অংশ জলে এবং

কিছু অংশ ডাঙায় কাটায়।

মেঘনাদ বলে চলে–আমার ধারণা, মানুষ বা জন্তুর দেহের ওপর বিশেষ কোনো তেজস্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব জানার জন্যেই ব্যাঙটার ওপর সেই জংলা পাহাড়ের বিজ্ঞানী গবেষণা চালাতে শুরু করেন, যার পরিণতি হয়তো তাঁরও জানা ছিল না। পরিণতি হলো দুর্ভাগ্যজনক। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে ব্যাঙটার দেহকোষের বিরাট পরিবর্তন হলো। আকার হয়ে গেল বিশাল এবং প্রকৃতি হিংস্র। রাক্ষুসে প্রতিহিংসায় তার স্রষ্টা বিজ্ঞানীকেও জীবন দিতে হলো...

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললাম না। সবটাই কেমন অদ্ভুত! বিস্ময়কর! কিন্তু পৃথিবীর কতটুকু বিস্ময়ের হদিস আমরা আজ পর্যন্ত করতে পেরেছি।

হঠাৎ ক্যাপটেন সিং নীরবতা ভেঙে মাথা নাড়লেন– রেডিও এ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব মানুষের দেহে যে কী ভয়ানক হতে পারে তার নিদর্শন তো আমরা গত মহাযুদ্ধে হিরোসিমাতেই দেখেছি। এ্যাটম বোমার আঘাতে সেদিন যে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে মরেছে হাজারে হাজারে, আর যারা বেঁচেছে, দেহ হয়েছে কুৎসিত, বিকৃত, বেঢপ। এখন তো শুনতে পাই এ্যাটম বোমার চেয়েও হাজার গুণ শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে মানুষ, তার প্রতিক্রিয়ায় আরও কত কি না হতে পারে–ব্যাঙের দানব হওয়া তো কোন ছার!

ইন্সপেকটর নায়ার আর ধৈর্য রাখতে পারছিলেন না, বললেন–কিন্তু তাকে মারবার জন্যে অত নাটক কেন করা হলো তো বুঝলাম না।

প্রশ্নটা আমাদের সকলের মনেই উঁকি দিচ্ছিল।

মেঘনাদ এ প্রশ্নের সহসা কোনো উত্তর দিল না। সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে দাঁড়ালো জানলাটার কাছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে। আজ ওখানে নির্মল প্রকৃতি। আতঙ্কের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। নদীর ধারে আবার নিশ্চিন্তে বেড়াতে বেরিয়েছে ভ্রমণপিপাসুর দল। একটা স্টীম বোটে চেপে আসছে তিনজন বিদেশী পর্যটক দিনকয়েকের জন্য এই দ্বীপের অতিথি হতে।

মেঘনাদ এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলো:

সেই ভয়ঙ্কর নিশীথ দানবের প্রকৃতি আর চরিত্রটা সম্পর্কে যে মুহূর্তে নিশ্চিত হলাম সেই মুহূর্তেই তাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনাটাও মাথায় খেলে গেল। এমন ফাঁদ না পাতলে সে হয়তো এত সহজে ধরা দিত না।

আমি বললাম–তার কোন প্রকৃতির কথা বলছিস মেঘনাদ?

মেঘনাদ বললো–আকারে দানব হলেও ব্যাঙের আদিম প্রকৃতি তার নষ্ট হয়নি। ব্যাঙের স্বভাবই হলো সন্ধ্যের পর শিকার ধরতে বেরুন। এক্ষেত্রে তার আকার এবং আয়তন অনুপাতে শক্তির পরিমাণও আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, বর্ষাকালে ব্যাঙের আর একটা প্রকৃতিগত অভ্যাস আছে–তা হলো, বৃষ্টির পর খাল বিলে গ্যাঙর গ্যাঙ শব্দে পুরুষ ব্যাঙ ডাকে। আর সে কারণেই প্রতি বর্ষার শেষে সেই দানব ব্যাঙটা বুঝতে পারত যে সে একান্তই নিঃসঙ্গ, আর তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে একের পর এক ধ্বংসকার্য চালাত এবং একই কারণে সে তার স্রষ্টা জংলা পাহাড়ের বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকেও রেহাই দেয়নি।

আবার খানিক স্তব্ধতা। এবার স্তব্ধতা ভেঙে আমি বললাম–বিশাল বেলুন-ব্যাঙ বানিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করার প্ল্যানটা না হয় বুঝলাম কিন্তু টেপরেকর্ডার থেকে এ্যামপ্লিফায়ার মারফৎ ওই ভয়ঙ্কর ব্যাঙের ডাক–ওটাও কি একই কারণে বাজান হয়েছে?

–ঠিক বলেছিস, মেঘনাদ আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে বললো–ওটা না বাজালে হয়তো সে অত তাড়াতাড়ি নদীর ভেতর থেকে উঠে আসতো না।

মেঘনাদ চুপ করলো।

এইবার উঠে দাঁড়ালেন ইন্সপেকটর নায়ার। মেঘনাদের কাছে এগিয়ে এসে গভীর আন্তরিকতায় ওর হাত দুটো চেপে ধরে বললেন–অপূর্ব আপনার বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা মিঃ ভরদ্বাজ। সেদিন এত সব বুঝিনি বলেই আপনার পরিকল্পনাকে আজগুবি বলেছিলাম। এ জন্যে ক্ষমা করবেন।

মেঘনাদ কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই রাজু এসে ঘরে ঢুকলো। ওর হাতে ট্রে ভর্তি খাবার আর কফি।

আমার কানে তখনও বাজছে মেঘনাদের সেই ছড়াটা:

"বদ্ধ ঘরের ব্যাঙ
ডাকলো গ্যাঙর গ্যাঙ,
বিজ্ঞানীর বাচ্চা শিশু
গবেষণায় দানব পশু,
পেরিয়ারের আতঙ্ক!
মিললো কিনা অঙ্ক?

হ্যাঁ, অঙ্ক মিলে গেছে!!

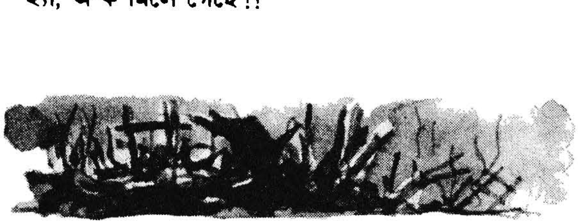

ছবি : রাহুল মজুমদার

অবিশ্বাস্য

গৌরী দে

সবাই মেনে নিলেও শেষ পর্যন্ত স্নেহাংশুকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছে না জয়ন্ত 'ভূত আছে'। স্নেহাংশুর বক্তব্য, যারা ভীতু দুর্বল, ও সব তাদের মনের দুর্বলতা। সে শহরের ছেলে, ও সব কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। অতএব, টিফিন টাইমে, কথা কাটাকাটি দিয়ে শুরু করে বুঝি বা হাতাহাতি হয়—হতোও.... যদি না জয়ন্ত দুম করে বলে উঠত,"বেশ হয়ে যাক বাজী। তোকে ভূত আমি দেখাবই।" স্নেহাংশুর জেদও কিছু কম না। বলে—"ভূত দেখাতে পারলে তোকে আমি দশ টাকা দেবো।" জয়ন্তর চোখদুটো খুশিতে চিক্‌চিক্‌ করে ওঠে। কিন্তু কি ভেবে একটু দমে যায়, এর বদলে স্নেহাংশু যদি কুড়ি টাকা দাবি করে বসে? সে তো আর স্নেহাংশুদের মতো অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে নয়। তাছাড়া ভূত দেখাব বললেই তো আর দেখানো যায় না। স্রেফ জেদের বসেই সে বলেছে ভূত দেখাবে। কিন্তু এখন তো আর পিছানো যায় না। স্নেহাংশুটা যা ছেলে, বলবে, ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। একটু আগের গলার সেই তেজটা, যতটা সম্ভব বজায় রেখে, ভয়ের ভাবটা চাপা দিয়ে জয়ন্ত বলে—

"তা হেরে গেলে আমায় কি দিতে হবে?"

স্নেহাংশু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে ওঠে—

"তোকে কিছুই দিতে হবে না, তুই শুধু ভূত দেখা তাহলেই হবে।" তারপর হঠাৎ কি মনে করে সুর পালটে বলে, "ও, তুই তাহলে ভূত দেখাতে পারবি না?"

"কে বলেছে পারব না?"—চেঁচিয়ে ওঠে জয়ন্ত।

"তাহলে হেরে যাওয়ার কথাটা উঠল কেন শুনি?"—চেপে ধরে স্নেহাংশু।

"ওটা বলতে হয়। বাজীর ব্যাপার না?" জয়ন্ত কৈফিয়তের সুরে বলে, "মানে?" সন্দিগ্ধ কণ্ঠ স্নেহাংশুর।

"মানে আবার কি? যারা অবিশ্বাস করে তাদের সামনে ভূত আসে না।" —রাগ করে বলে ওঠে জয়ন্ত।

"হাঃ হাঃ পথে এসো বাছাধন। তর্ক এবার অন্যপথ ধরতে শুরু করেছে দেখছি। শোন্‌ জয়ন্ত, ওসব আমি জানি না। বাজী, বাজী। ধরেছিস যখন, তোকে ভূত দেখাতেই হবে। আমি কোনো অজুহাতে ভুলছি না। না পারলে আমি সবাইকে বলব....।"

স্নেহাংশুকে থামিয়ে দিয়ে জয়ন্ত চেঁচিয়ে ওঠে, "আরে যাঃ যাঃ, কি ভয় দেখাচ্ছিস, প্ল্যানচেটে ভূত এনে তোকে দেখিয়ে দেবো....।"

"প্ল্যানচেট? অ্যাঁ! ও তো স্রেফ ধাপ্পা! ওসব আমি বহু বইতে পড়েছি। তেপায়া টেবিল, পেন্সিল কাগজ নিয়ে বসবে সবাই—তারপর আত্মা আসবে প্রশ্নের উত্তর লিখে দেবে খস্‌খস্‌ করে। ওসব ভাঁওতা।"

স্নেহাংশুর কথায় রীতিমত অবাক হয়ে জয়ন্ত পাশের বন্ধুদের দিকে তাকায়। "প্ল্যানচেট্‌ ভাঁওতা? এ বলে কি রে?"

বন্ধুদের মধ্যে বসেছিল রজত আর প্রদীপ। ওরা এতক্ষণ টিফিন খাবার ফাঁকে ফাঁকে ওদের ঝগড়া শুনছিলো। খাওয়া সেরে বাক্সটা বন্ধ করে প্রদীপ বলে ওঠে, "সত্যি বলতে কি আমারও কেমন সন্দেহ হয়, সত্যিই কি প্রেতাত্মা আসে?"

রজত এঁটো হাতটা ঘাসে মুছে নিয়ে বলে, "বেশ তো, এক কাজ করলে হয় না! এমন কাউকে আনলে হবে স্নেহাংশু যার হাতের লেখা চেনে। মিলিয়ে নেবে, তাহলে তো আর অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না।"

প্রস্তাবটা স্নেহাংশুর খুব পছন্দ। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে, "হ্যাঁ, এটা ভাল বলেছিস। কিন্তু মিডিয়াম হবে কে?"

জয়ন্ত আগের রাগের জের টেনে বলে ওঠে, "অন্য কেউ হলে তো তোর মনে হবে ভড়ং করছে। তার চেয়ে তুই নিজেই তোর কোনো মৃত আত্মীয়কে চিন্তা করে মিডিয়াম হবি, আমরা জানব না তুই কাকে ডাকছিস। আমরা শুধু তাকে একটা প্রশ্ন করব—তুমি কে বল—অথবা তোমার নামটা কাগজে লিখে দাও। ব্যাস্‌, নামটা পরে জানালেই তুই বুঝতে পারবি সত্যি

করে তুই তাকে ডেকেছিলি কিনা? কেমন, আপত্তি আছে?"

নেচে উঠল স্নেহাংশু, "রাজী।"

প্রদীপ বলে, "কিন্তু প্ল্যানচেট করা হবে কোথায়?"

"আমাদের বাড়ি"—বলে ওঠে স্নেহাংশু। "পরশু রবিবার সন্দীপ আগরওয়ালের বাড়িতে আমাদের সবার নেমন্তন্ন, আমি যাব না। বলব পেট ব্যথা করছে। তারপর সবাই চলে গেলে ঠিক রাত ৮টা নাগাদ তোরা উঠে আসবি তিনতলায় আমার পড়ার ঘরে। কেমন?"

রজত উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "আমায় বাদ দে ভাই। বাবা অত রাতে বাড়ির বাইরে থাকতে দেবেন না।" রজত চলে যেতে জয়ন্ত দাঁত চেপে বলে ওঠে, "নাম্বার ওয়ান কাওয়ার্ড।" তারপর প্রদীপের দিকে তাকায়, প্রদীপ মাথা নাড়ে। "আমি থাকব—স্নেহাংশুর বাড়ি যাব শুনলে মা আপত্তি করবেন না। তাছাড়া এখন তো আর কোনো পরীক্ষা-টরীক্ষার ঝামেলা নেই।" জয়ন্ত এবার দাঁড়িয়ে উঠে প্যান্ট থেকে ধুলো ঝেড়ে গ্লাসের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলে, "ঠিক আছে রোববার রাত আটটায় আমরা তোর বাড়ি যাচ্ছি।"

আধঘণ্টার মধ্যে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল স্নেহাংশুর জীবনে। মিডিয়াম হয়ে বসার আগেও তার মনে এতটুকু বিশ্বাস আসেনি ব্যাপারটায়। তবু বসেছিল শুধু জয়ন্তকে জব্দ করতে। ঘরের জানলা দরজা সব বন্ধ—জ্বলছিল শুধু একগোছা ধূপ আর একটা মোমবাতি। তিনজনে বসেছিল টেবিল ঘিরে, সামনে ছিল একটা কাগজ আর কলম। জয়ন্ত ওকে চিন্তা করতে বলেছিল একাগ্রভাবে। সে চিন্তা করছিল....তবে কোনো পরিচিত আত্মাকে নয়। চিন্তা করছিল রাতের নিমন্ত্রণের কথা। বোকার মতো সে যে কেন বিরাট পার্টিটা মিস করল তাই ভাবছিল। তার বেশি করে মনে পড়ছিল তারই বয়সী প্রীতম্ আগরওয়ালকে। প্রীতমের ঘর-ভর্তি কমিকস্গুলোর কথা ভাবতে ভাবতে কখন সে শুধু প্রীতম্কেই ভাবতে শুরু করেছিল। কি সুন্দর চেহারা। ঠিক যেন রাজপুত্র! সবচেয়ে সুন্দর ওর হাতের লেখাটা। ইংরাজি হরফগুলো ছাপার অক্ষরের মতো গোটা গোটা করে লেখে। একটু আগেই ফোন করে বলেছিল—আসছ তো? তারপর আসবে না শুনে দুঃখ করে বলেছিল, "তোমাকে কতদিন দেখিনি, খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।"

হঠাৎ মনে হলো স্নেহাংশুর প্রীতম্ ঘরে ঢুকছে। অবাক হয়ে ও ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে, বলল—"কি করে এলে তুমি অত বড় পার্টি ছেড়ে?" প্রীতম হাসল—"আমার মনে হলো তুমি আমাকে ভীষণ ভাবে ডাকছো। আমি না এসে পারলাম না।" আতঙ্কিত হয়ে ওঠে স্নেহাংশু—"আমার ডাকে তুমি এসেছ শুনলে বাবা দারুণ রাগ করবেন-তুমি যাও প্রীতম্, তুমি যাও, এখুনি চলে যাও।" প্রীতম্ চলে যাচ্ছিল কাগজ পেন্সিল নিয়ে দৌড়ে গেল স্নেহাংশু, "এক মিনিট, এসেছ যখন তোমার সুন্দর হাতের লেখায় তোমার নামটা লিখে দাও ইংরাজিতে—বন্ধুদের দেখাব।" প্রীতম্ হাসল কাগজে কি লিখল তারপর চলে গেল।

এই স্নেহাংশু, স্নেহাংশু....—জয়ন্ত আর প্রদীপের ক্রমান্বয় ডাকে যেন ঘোর থেকে জেগে উঠেছিল স্নেহাংশু। জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে বলল, "দে টাকা—এই দ্যাখ্ কাগজের ওপর আত্মার নাম?" প্রদীপ বড়বড় চোখ করে বলল, "দারুণ লেখাটা তো! এই প্রীতম্ কে রে?"

স্নেহাংশু ওর ক্লান্ত চোখ দিয়ে ওদের দেখে কোনরকমে বললো, "তোরা যা আমাকে একটু একা থাকতে দে।"

সেই থেকে চুপ করে বসে আছে স্নেহাংশু, কিছুই ভাবতে পারছে না। ঢংঢং করে রাত দশটা বাজল। হঠাৎ স্নেহাংশু চমকে উঠল—একথাটা তো তার আগে মনে হয়নি। প্রীতম্ সুস্থ শরীরে বেঁচে আছে, সে কখনই আসতে পারে না। তাহলে প্রীতমের নামটা সে নিজেই লেখেনি তো? তাড়াতাড়ি কাগজ কলম টেনে ও একের পর এক প্রীতম্ নামটা লিখে যায়—কিন্তু কই কোনোটা তো এই লেখাটার মতো হলো না। তবে? ভাবতেই অজানা ভয়ে ওর শরীর ঝিম্ঝিম্ করতে লাগল।

বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সিঁড়িতে দুজোড়া পায়ের আওয়াজ। ঘরে ঢুকলেন মা—পিছনে বাবা। কেমন উদ্ভ্রান্তের মতো চেহারা। মা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে—গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন যেন ছেলেকে সুস্থ দেখে দারুণ শান্তি পেয়েছেন।

স্নেহাংশু অবাক। জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে বাবা?" বাবা তখন কোট খুলছিলেন। বললেন—"ঠিক রাত তখন সাড়ে আটটা, আমাদের চোখের সামনে হঠাৎ প্রীতম্ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। হটা নিথর নিস্পন্দ। ডাক্তার মেহেতা ছিলেন পার্টিতেই। সঙ্গে সঙ্গে ইন্জেকসান দিয়ে দিলেন গোটা কয়েক। তারপর প্রায় মিনিট কুড়ি পরে আস্তে আস্তে প্রীতমের জ্ঞান ফিরে এল। ওঃ সে কি অবস্থা, সবাই না খেয়ে ফিরে গেল। প্রীতম্ কিছুই বলতে পারলো না, হঠাৎ তার কি হয়েছিলো। তবে ডাঃ মেহেতা সন্দেহ করছেন ইট ইজ এ কেস্ অফ্...."

বাবার শেষ কথাগুলো স্নেহাংশুর কানে গেল না। প্রীতমের নাম লেখা সেই কাগজের টুকরোটা ও দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকাতে লাগল তার হাতের মুঠোয়। জানলা দিয়ে সেটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতো শক্তিও তখন আর তার নেই।

ছবি : সরোজ সরকার

ছবির মজা / মানব বন্দ্যোপাধ্যায়

এটা কি ?

মানুষের লোভ গত শতাব্দীতে এই পাখিটিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করেছে। নামটুকু খুঁজে নাও দাগে ঘেরা অংশগুলি ভরিয়ে।

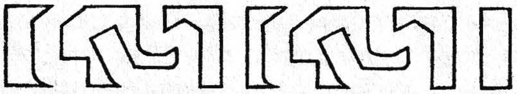

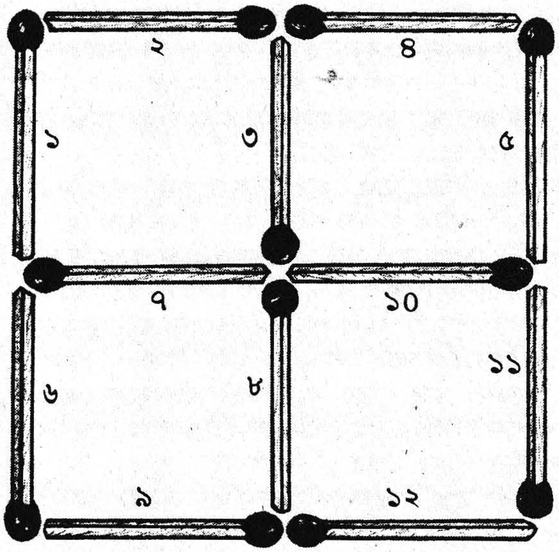

চার থেকে তিন

১২টি দেশলাই কাঠি দিয়ে চারটে সমান বর্গক্ষেত্র করা হয়েছে। ৩টি কাঠি সরিয়ে সমান বর্গক্ষেত্র করতে পারবে ?

বাঁচার তাগিদে কিছু কিছু প্রাণী নানা ছদ্মবেশের আশ্রয় নেয়। যেমন এই পাতা প্রজাপতি। যখন ওড়ে তখন রঙের বাহার। আবার ডালে যখন বসে, তখন যেন পাতা।

*১২কে সরিয়ে নিয়ে যাও ১১র ডানদিকে নিচে। ১কে উপরে (দু'টি কাঠিই সমান্তরাল হবে) এবার ২কে নিয়ে এসে লম্বালম্বি ১২–১কে জুড়ে দিলেই তিনটি সমান বর্গক্ষেত্র পেয়ে যাবে।

সমাধান

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

স্বদেশী যুগ বলতে যে-সময়টাকে আমরা বিশেষ করে বুঝি, সেটা হলো, ১৯০৫ সালের পরবর্তী বৎসরগুলি। লর্ড কার্জনের সেই যে সর্বজনবিদিত কুকর্মটি, বঙ্গদেশ বিভাগ, তার বিরুদ্ধে উত্তাল আন্দোলন সেদিন এদেশের ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর লোককে সমভাবে মাতিয়ে তুলেছিল।

এত বীর ছিল বাংলার এই গঙ্গাব্রহ্মপুত্র বিধৌত কোমল মৃত্তিকায়! বজ্র দিয়ে তাদের হৃদয় গড়া! বিদ্যুতের স্ফুরণ তাদের চোখের চাউনিতে! তারা মেরেছেও অনেককে, মরেছেও নিজেরা অনেকে। অস্ত্রহীন বান্ধবহীন সেই নিঃস্বদের সর্বাত্মক যুদ্ধ, একটা সর্বশক্তিমান পুলিশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, তার ইতিহাসের পাতায় পাতায় আত্মদানের কাহিনী, দুর্লভ দুঃসাহসের অবিস্মরণীয় সাগা।

সেই শত সহস্র অবিস্মরণীয় যোদ্ধার মধ্যে একজন আবার আপন উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে নিজের সমকালে তো দেদীপ্যমান ছিলেনই, থাকবেনও তেমনিই ততদিন, যতদিন স্বাধীনতার শহীদগণকে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে প্রস্তুত থাকবে বাঙালী। তিনি হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

দুর্বলের চিত্তে বলের সঞ্চার, ইংরেজরাজের ক্রোধানলে নিজেকে হাসিমুখে আহুতি প্রদান, এসব ব্যাপারে দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব সেদিন। ১৮৬১ সালে কলিকাতাতেই জন্ম তাঁর, পিতার নাম ছিল দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের পিতৃদত্ত নাম ছিল ভবানীচরণ।

ব্রাহ্মধর্মের যুগনেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সান্নিধ্যে এসে ভবানীচরণ প্রথম জীবনে ঐ ধর্মেরই পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পরে কর্মব্যপদেশে সিন্ধুপ্রদেশে গিয়ে কতিপয় খৃষ্টান ধর্মযাজকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়ে সহসা একসময়ে খৃষ্টধর্মেই দীক্ষা নিয়ে বসলেন। ঐ পাদরিদের আনুকূল্যেই ইনি সাংবাদিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদেরই পরিচালিত "টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি" পত্রিকায় সম্পাদনা এঁর সর্বপ্রথম সাহিত্যকর্ম।

ঐ পাদরিদের চেষ্টাতেই ভবানীচরণ ইউরোপ যাত্রায় সক্ষম হন। সেখানে বিভিন্ন দেশে পর্যটন করেন খৃষ্টধর্মের সঙ্গে হিন্দু-বৈদান্তিক ধর্মের তুলনামূলক ব্যাখ্যা প্রচার করে করে। তারপর দেশে ফিরে সুখ্যাত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে অনুপ্রাণিত হন হিন্দুধর্মে

প্রত্যাবর্তনের জন্য। এই সময়েই এঁর নতুন নাম হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং ইনি কায়মনোবাক্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের সেবায়।

ব্রহ্মবান্ধব চিন্তা করে দেখলেন—তরবারির চেয়ে বেশী শক্তি ধারণ করে লেখনী। ঐ কথাটাকেই ঘুরিয়েও বলা যায় এইভাবে যে একটা শক্তিমান লেখকের এমন শক্তি আছে যে গোটা একটা জাতিকে সে তরবারি ধারণে প্রবুদ্ধ করতে পারে। তাই লেখনীকেই তিনি বেছে নিলেন দেশসেবার যুদ্ধে নিজের প্রহরণ হিসাবে।

এইভাবেই সেদিনের অতিপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'সন্ধ্যা'র জন্ম। ইংরেজী "টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি" পত্রিকার সম্পাদনার ফলে সাংবাদিকতায় প্রচুর অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন। তার দরুন সন্ধ্যা জন্মমুহূর্ত থেকেই জনপ্রিয়তা লাভে ধন্য হলো।

মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব, প্রতিভাধর বুদ্ধিজীবী ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব, দেশবাসী তাঁর অনুরক্ত ছিল সে-সব কারণে। কিন্তু যে জিনিসটি তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রেখেছে বাঙালী জাতের পুনর্জাগরণের ইতিহাসে, তা হলো এই যে তিনি ছিলেন 'সন্ধ্যা'র প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও সম্পাদক। স্বদেশী যুগের সেই প্রারম্ভে দিনের পর দিন কী আগুনই না সারা দেশে ছড়িয়েছে ব্রহ্মবান্ধবের লেখনীপ্রসূত সন্ধ্যার এক একটি নিবন্ধ! সারা দেশকে উদ্দীপ্ত, সমরমুখী করে মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষা দেবার গুরু কর্তব্য সেই সন্ধ্যাই সেদিন তুলে নিয়েছিল নিজের শিরে। ১৯০৭ সালের ৩০শে মার্চ সন্ধ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামারূপে দেখা দিল ব্রহ্মবান্ধবের মর্মবাণী, "সাধনায় যদি বরি মরণ, সেই মরণেই অমরজীবন।" আবার ঐ বৎসরই ১০ই মে তিনি লিখলেন—"কান পেতে শোন, মায়ের রণভেরী বেজে উঠেছে। দেরি করো না, মায়ের সন্তানেরা, প্রস্তুত হও। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সমস্ত ভারতবাসীকে তৈরী কর মৃত্যুবরণ করবার জন্য।"

এ-জাতীয় লেখা সন্ধ্যার পৃষ্ঠায় ক্রমাগত বেরুতে থাকলে সর্বশক্তিমান গবর্নমেন্টের রোষাগ্নি যে তাঁর মস্তকে অনিবার্যভাবেই বর্ষিত হবে, তাতে ব্রহ্মবান্ধব গোড়া থেকেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু তাই বলে কি বিদেশীর শাসন-শৃংখল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার প্রয়াসে বিরত হবেন তিনি?

সন্ধ্যার আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গবর্নমেন্ট যে-নির্যাতনের অভিযান শুরু করলেন ব্রহ্মবান্ধবের বিরুদ্ধে, তার সমাপ্তি হলো তাঁর মৃত্যুর পরে। সন্ধ্যা পত্রিকাটার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ যে কতবার আনা হয়েছিল, তার হিসাব করা কঠিন। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের দুর্জয় আত্মিক শক্তিকে তিলমাত্র খর্ব করতে পারেনি সে নির্যাতন।

সন্ধ্যায় ধারাবাহিক ভাবে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছেন ব্রহ্মবান্ধব, এমন সময় গোপন সূত্রে তিনি খবর পেলেন যে সন্ধ্যার ছাপাখানা তল্লাশি করার এবং সম্পাদককে গ্রেপ্তার করার জন্য শীঘ্রই ওয়ারেন্ট বেরুবে। কিন্তু খবর পেয়েও কি নিরস্ত হলেন ব্রহ্মবান্ধব? ৩০-শে আগস্ট ছাপাখানা যখন তল্লাশি হলো, তখনও সম্পাদক সেইখানে বসেই তাঁর শেষ প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত। তিনি নিজে গ্রেপ্তার হলেন ১৯০৭-এর ৩রা সেপ্টেম্বর। তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে জামিনে খালাস দেওয়া হলো।

তোড়জোড় তো আগে থেকেই হয়ে আছে, মামলা শুরু হতে দেরি হলো না। ব্রহ্মবান্ধব তখন হার্নিয়ায় পীড়িত, দেহে অশেষ যন্ত্রণা। তাই নিয়েই দিনের পর দিন তিনি আদালতে হাজির হচ্ছেন, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোজা দাঁড়িয়ে থাকছেন আসামীর কাঠগড়ায়। তাঁর উকিল চাইছেন একটা দরখাস্ত দিতে, যাতে বিচারকালে অসুস্থ ব্রহ্মবান্ধবকে বসবার অনুমতি দেন ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব কিছুতেই রাজী নন দরখাস্ত দিতে। ফিরিঙ্গীর কাছে দয়া ভিক্ষা? কদাপি না। যন্ত্রণা? কার যন্ত্রণা? দেহের? তাতে ব্রহ্মবান্ধবের কী? ব্রহ্মবান্ধব তো দেহসর্বস্ব নন!

২৩শে সেপ্টেম্বর ব্রহ্মবান্ধব কোর্টে এই বিবৃতি দাখিল করলেন—"আমি স্বীকার করছি যে সন্ধ্যা পত্রিকার প্রকাশন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার একারই।

ব্যক্তি কল্যানের মাধ্যমেই
জাতির কল্যানে উৎসর্গীকৃত
স্বল্পসঞ্চয়ের ব্যতিক্রমী সংস্থা
ওভারল্যাণ্ড
OVERLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED
১/১-এ, গুরুচরন লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৪
(হাতিবাগান)

এও স্বীকার করছি যে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' শীর্ষক যে-প্রবন্ধটি নিয়ে বিচার চলছে এই আদালতে, আমিই তার লেখক। কিন্তু ঐ স্বীকৃতিদান ছাড়া অন্য কোনোভাবে আমি এই বিচারে কোনো অংশগ্রহণ করব না। কারণ মাতৃভূমির স্বরাজ আনয়নের পবিত্র কর্তব্য ভগবানই আমাকে অর্পণ করেছেন। সে-কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে কোনো বিদেশী জাতির কাছে জবাবদিহি করার দায় আমার আছে বলে আমি মনে করি না। সেই বিদেশী জাতি ঘটনাচক্রে আজ এদেশের শাসনদন্ড করায়ত্ত করে বসেছে বটে, কিন্তু স্বভাবতঃই তাদের স্বার্থ আমাদের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী। ভারতের মুক্তি কামনাকে অংকুরেই বিনাশ করতে যারা কৃতসংকল্প, তাদের কাছে মুক্তিকামী কেউ সুবিচারের আশা কদাচ করতে পারে না।"

ব্রহ্মবান্ধবের এই বিবৃতি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে রয়েছে। ১৩ই আগস্ট তারিখে ঐ "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" প্রবন্ধটি সন্ধ্যায় ছাপা হয়ে বেরোয়। ঐ তারিখের আগে ও পরে এমন আরও অনেক প্রবন্ধ ঐ পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছিল, যা সমভাবেই রাজদ্রোহাত্মক বলে গণ্য। সেগুলিও অভিযোগের তালিকায় যথাযথ স্থান পেয়েছে।

অনেকগুলি প্রবন্ধ নিয়েই বিচার চলছে। কী জোরালো, কী চটকদার নাম প্রবন্ধগুলির! "যুগান্তরে রক্তারক্তি, ফিরিঙ্গীদের ফাটল পিত্তি", "ঢিলের বদলে পাটকেল", "কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা, একটা কালো একটা সাদা", "সিডিশনের হুড়ুম ডুড়ুম, ফিরিঙ্গীদের আক্কেল গুড়ুম", "ফিরিঙ্গী পরম দয়ালু, ফিরিঙ্গীর কৃপায় দাড়ি গজায়, শীতকালে খাই শাকালু", "বাচ্চা সকলকে নিয়ে যাচ্ছে শ্রীবৃন্দাবন", ইত্যাদি।

২৩শে অক্টোবর মামলার শুনানি উঠতেই, ব্রহ্মবান্ধবের উকিল জানালেন আসামী পীড়িত, ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ২৬শে ক্যাম্বেলের ডাক্তারের সার্টিফিকেট আদালতে দাখিল করা হলো। ডাক্তার লিখেছেন, "আমি মনে করি না যে এক মাসের মধ্যে এই রোগী কোর্টে হাজির হতে পারবেন।"

সরকারী উকিলটি আবার সাহেব। ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে তিনিই ক্ষেপে গেলেন বেশী। তিনি দাবি করলেন—"ডাক্তারকে কোর্টে এসে হলফ নিয়ে বলতে হবে যে সত্যি সত্যিই আসামী কোর্টে হাজির হতে অক্ষম।" ডাক্তারটির বরাত ভাল, ম্যাজিস্ট্রেট এ-দাবি অগ্রাহ্য করলেন।

আমলাতান্ত্রিক গবর্নমেন্ট খুশী হতে পারছেন না। পাষন্ড ঐ উপাধ্যায়টা এত অল্পেতেই রেহাই পেয়ে যাচ্ছে? তাঁরা আর এক নম্বর মামলা ঠুকলেন ব্রহ্মবান্ধবের নামে, এটাও রাজদ্রোহের। আরও অনেক মামলার নথিপত্র তৈরি হচ্ছে সরকারী উকিলের সেরেস্তায়, এমন সময় সরকার পক্ষের বড় সাধে বাদ সাধলেন ভগবান স্বয়ং। সে কথা পরে আসছে।

ততক্ষণে ম্যাজিস্ট্রেট করে বসেছেন এক কান্ড। ব্রহ্মবান্ধবের জামিন বাতিল করে দিয়েছেন। হাসপাতাল যে মুহূর্তে বলবেন যে লোকটার আর রোগশয্যায় শুয়ে থাকার মতো অবস্থা নেই, সেই মুহূর্তেই ব্রহ্মবান্ধবকে সরাসরি নিয়ে পুরে দেওয়া হবে জেলখানায়।

এদিকে, অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, অবনতি হচ্ছে অতি দ্রুত। হার্নিয়া রোগ তাঁর বহুদিন থেকেই আছে, তারই চিকিৎসার জন্য ক্যাম্বেলে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সেটা ইদানীং এমন জটিল স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে যে তার চাপে রক্তচলাচলই বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাঁর দেহের। এ-অবস্থায় অস্ত্রোপচার করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। কিছুদিন থেকে আশানুরূপ শুভ লক্ষণই কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল তাঁর ব্যাধির। হঠাৎ ২৬শে অক্টোবর (১৯০৭) রাত্রি আটটায় তাঁর দেহে দেখা দিল ধনুষ্টংকার। ঘন্টা বারো চলতে থাকল তারই প্রকোপ। অনেক বন্ধুবান্ধব দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের জানানো হলো যে ব্রহ্মবান্ধবের শেষ সময় আসন্ন। তার একঘন্টা পরে, ঠিক বেলা নয়টায় তিনি অমরধামে মহাপ্রস্থান করলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের অপরাজেয় সৈনিককে বহু মামলার জালে আবদ্ধ করে, সারা জীবনের মতো কারান্তরালে প্রেরণ করার তোড়জোড় প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন প্রতিহিংসায় অন্ধ ইংরেজ সরকার। ভগবান সে-সাধ পূর্ণ হতে দিলেন না তাদের।

মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি সর্বসমক্ষে মনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন—"বন্দীজীবন যাপনের জন্য ফিরিঙ্গী সরকারের জেলখানায় আমি কদাচ যাচ্ছি না। কারও হুকুমে ওঠা-বসা আমার প্রকৃতি নয়। সেরকম ধাতুতে বিধাতা গড়েননি ব্রহ্মবান্ধবকে। আইনের নামে এই শেষ বয়সে তারা আমায় ঠেলে পাঠাবে জেলে, আর সেখানে বসে তাদের হুকুমমত কাজ করব আমি, এ হতেই পারে না। অসম্ভব! জেলে আমি যাচ্ছি না। আমার ডাক এসে গেছে।"

ছবি : দিলীপ দাস

হাঁদা-ভোঁদার
প্রাথমিক চিকিৎসা
আমি আমার ছোটদের ডাক্তারি সরঞ্জাম নিয়ে মজা করি।
আচ্ছা, তাই নাকি?
তুই তাহলে এখন ডাক্তার, ভোঁদা? ঠিক আছে, আমি তোকে একজন রোগী দিচ্ছি!
না, না, হাঁদা!
এই তোকেই রোগী বানিয়ে দিই— গেছি রে! আমার হাত গেলো!
উ উ উহ— আরফ্!
আমি আমার এই প্রাথমিক চিকিৎসার বইটা পড়ে দেখি এ অবস্থায় কি করনীয়, হাঁদা!
চুপচাপ থাক হাঁদা, আমি তোর হাতটা পরীক্ষা করে দেখবো! আমি তোর আঙুল আলাদা করে ধরে ঝাঁকালে লাগছে কি?
ওয়াহ! আমার আঙুল গেলো! শীগগির ছাড়!
ইয়াগহ!
এতে আছে, এবার এই হাতটা অন্য হাতটার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে।

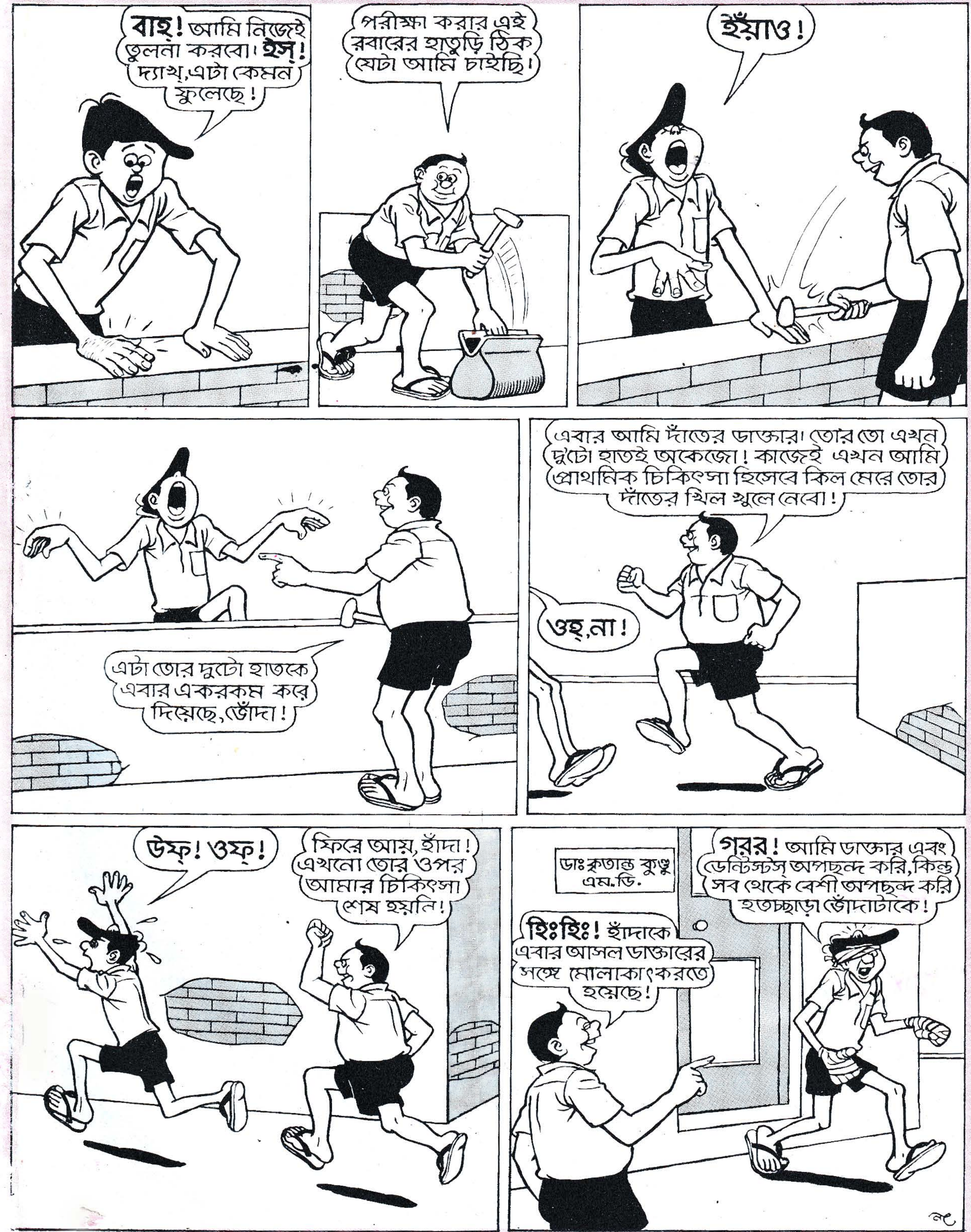
বাহ্! আমি নিজেই তুলনা করবো। ইস্! দ্যাখ, এটা কেমন ফুলেছে!
পরীক্ষা করার এই রবারের হাতুড়ি ঠিক যেটা আমি চাইছি।
ইঁয়াও!
এটা তোর দুটো হাতকে এবার একরকম করে দিয়েছে, ভোঁদা!
এবার আমি দাঁতের ডাক্তার। তোর তো এখন দুটো হাতই অকেজো! কাজেই এখন আমি প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে কিল মেরে তোর দাঁতের খিল খুলে নেবো!
ওহ্, না!
উফ্! ওফ্!
ফিরে আয়, হাঁদা! এখনো তোর ওপর আমার চিকিৎসা শেষ হয়নি!
ডাঃ কৃতান্ত কুণ্ডু এম.ডি.
গরর! আমি ডাক্তার এবং ডেন্টিস্টস্ অপছন্দ করি, কিন্তু সব থেকে বেশী অপছন্দ করি হতচ্ছাড়া ভোঁদাটাকে!
হিঃ হিঃ! হাঁদাকে এবার আসল ডাক্তারের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে হয়েছে!

নতুন ধাঁধা

১। থাকলে পরে বসে খাও
শেষ বাদে অঙ্গ নাও
মধ্য বাদে জিনিস রাখো
উত্তরটা ভেবে দেখ

মিনারা ও জাহাঙ্গীর, ডানকুনী/হুগলী

২। এই সবগুলো গপ্পো থেকে
এ গপ্পো বাদ দিও
এমন কিছু বীজ থাকে তার খোসা
স্বাস্থ্য রাখতে খেও।

শঙ্কর ভট্টাচার্য, জিয়াগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ

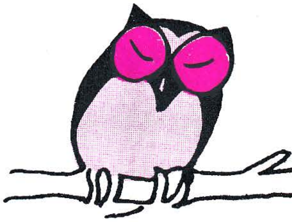

চৈত্র সংখ্যার ধাঁধার উত্তর
১। বিছানা ২। মোমবাতি ৩। অন্ধকার ৪। বানর

৩। শব্দটি বড় যেমন আকারে
তেমনি অর্থেরও বিচারে
এ কান্তর অর্থ বাদ দাও
সাহারাকে চিনে নাও।

কমলেশ বালা
বগুলা কলেজপাড়া/নদীয়া

৪। লেজ কাটলে একই থাকে
শির কাটলে জাতি
বনজঙ্গলে বাসা ইহার
আকার ক্ষুদ্র অতি।

বিদিশা, বৈশালী ও
শ্রাবস্তী দাস, দিসেরগড়/বর্ধমান

নতুন শব্দমালা

১	২	■	৩	৪
■	৫	৬	■	
৭	■	৮	৯	■
১০	১১	■	১২	১৩
■	১৪		■	

* [এই শব্দমালার উত্তর দু'বর্ণ বিশিষ্ট এক একটা শব্দ দিয়ে তৈরি করতে হবে/উত্তরে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ আকারযুক্ত হওয়া চাই/কোনোও বর্ণ একবারের বেশি ব্যবহার করা চলবে না] তৈরি করেছেন– বিভাংশু দত্ত আরামবাগ/হুগলী

সূত্র

পাশাপাশি

১। ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত
'যবদ্বীপ'ও অভিহিত

৩। কলকাতার উত্তরে
ময়লা ফেল দূরে করে

৫। সোমবাবু বরণীয়
ফুটবলে স্মরণীয়

৮। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়
পর্বতের দেখছি কায়

১০। জানি সেটা কর্দম
পথে দেখি হরদম

১২। বলতে পারি জেলে
গলায় দেব পেলে

১৪। জানোই যদি উপায়
চলে যেও দু'পায়

ওপর নিচ

২। পরমাণু বিজ্ঞানী
ভারত সেরা তাঁকে মানি

৪। সেটাই জেনো ব্যজনী
পাখির গায়ে খোঁজোনি?

৬। আফ্রিকার দেশ জানি
আক্রা তার রাজধানী

৭। এশিয়ার ছোট্ট দেশ
রাজধানীর নাম বিশেষ

৯। ভারতের মল্লবীর
সেরা ছিলেন পৃথিবীর

১১। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ তনয়
কুস্তীগীরও মিথ্যে তো নয়

১৩। দেশটা চীনের পাশে
রাজধানীর নাম আসে

মাঘ সংখ্যার ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

।। কলিকাতা ।।

শিখা, অমিয়, অরিন্দম ও সুস্মিতা/হরিমোহন চ্যাটার্জী রোড; স্বপন, সুকুমার ও রত্না/বরাহনগর, টবিন রোড; নীরদ, অর্চনা, নির্মাল্য, নীলেন্দু ও নিরুপম/দমদম পার্ক; পার্থ, দেবু, স্বপন, নীপা ও কমল/ইউ.বি.আই সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস্ লিটারারি ক্লাব, হেড অফিস, ডালহৌসি; পাখি, খুকু, বাবুলা ও সন্তোষ/পিকনিক গার্ডেন; অরুণিমা, অমৃতা/শুঁড়া থার্ড লেন, বেলেঘাটা; কৌস্তুভ, জিকো, সুদীপ, স্বাতী ও দেবকী/গার্ডেনরীচ; নির্মাল্য, পিনাকী তপস্বী/বরাহনগর;

।। হাওড়া ।।

মৌসুমী, মহুয়া, পাপড়ি, পারমিতা ও সৌরভ বসু/অবিনাশ ব্যানার্জী লেন, শিবপুর; মৌমিতা ও রুচিরা/শান্তিরাম রাস্তা, বালি; চন্দ্রশেখর ও নতুন মান্না/বাজে শিবপুর [illegible]/শিবপুর; টুকু ও ফুচাই/রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর; সৌরাশিস, দেবাশিস, [illegible] ও মিঠু মুখার্জী/কেদার ভট্টাচার্য লেন, সাঁত্রাগাছি; সন্দীপ মুখার্জী/নীলমণি [illegible]লেন;

।। ২৪ পরগনা ।।

জয়দেব চক্রবর্তী/নব ব্যারাকপুর; মিনতি, শিশির, পীযূষ ও ভাস্বতী তপস্বী/বোড়াল; তরুণ, তড়িৎ, তুষার ও সৈকত/ইছাপুর, নবাবগঞ্জ, ষষ্ঠীতলা; অপরাজিতা, জ্যোতি, বনানী, জয়ন্তী ও সোমনাথ পাল/আব্দুল জব্বর রোড, কাঁচরাপাড়া; অমিত, সুমিত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য/ভাটপাড়া; সৌমিত্রিশংকর ও সুগতশংকর উকিল/তালবাগান, ব্যারাকপুর; তপন, অঞ্জলি, প্রতিমা, সবিতা, জামালউদ্দিন ও সওকত আলী/সাহাড়া রুরাল প্রোজেক্ট, গঙ্গানগর; শংকর, অরুণ, তরুণ, গোপাল, চন্দন, রতন, চম্পা ও বাপি চক্রবর্তী/গাঁতি, সারদাপল্লী; শুভ্রা ও সুব্রত দত্ত/সরোজ পার্ক, বারাসাত; পিয়ালী, উষা, তারক/সিদ্ধেশ্বরী লেন, কাঁচরাপাড়া; বোটো, মানি, মণি, চাঁদু, বিলে, পুনে, তোতন, লাল্টু, সুতপা, মৃনাই/হৃদয়পুর, স্টেশন রোড; কাঞ্চন, টুবাই, শাক্য, ইন্দ্রনাথ, বাপি, কুমকুম, পৌলমী ও দিলান/বাসুদেবপুর রোড, শ্যামনগর;

।। হুগলী ।।

রিংকু, টিংকু, অনল ও কৃষ্ণা মুখার্জী/চুঁচুড়ো রেল কোয়ার্টার্স; বেণু, মধু, শম্পা, সুতপা ও সুজাতা/চুঁচুড়ো; শৈলেন, চন্দ্রচূড়, চিরঞ্জীব, প্রসেনজিৎ, অমিত, অতনু, অঞ্জনা ও মন্টাই/সোনাটুলি লেন, চকবাজার; শুভ্র, শাখী, কড়ি ও অনুশ্রী গাঙ্গুলী/নিত্যানন্দপুর, কুন্তিঘাট; শ্যামাপ্রসাদ, মীরা, সুপর্ণ/কয়াপাট; মৃণাল, কৃণাল, আশিস, ঝুনি, শচীন চক্রবর্তী/পারমার রোড, ভদ্রকালী; সজল, শুভ্রা, রিক্তা, তন্দ্রা, পুতু, অপূর্ব/বিবেকপল্লী, শেওড়াফুলী;

।। বর্ধমান ।।

উমাশশী, অমিয়, মঞ্জুষা, বাবু, মুনি, অসীম, অজন্তা ও অন্যান্যরা/কাশেমনগর; টুপাই, বাপন, কাটুর, বুটু ও পমপম/বার্নপুর; চন্দ্রশেখর সরকার/রাহা লেন, আসানসোল; শতভিষা, বাসবী ও উত্তমকুমার বটব্যাল/পাটমোহনা কোলিয়ারী, পাটমোহনা; অশোককুমার, সিদ্ধার্থশংকর, শুদ্ধসত্ত্ব, কাঞ্চনজ্যোতি, সৌম্যশান্ত, স্বয়ম্ভূরঞ্জন ও অভীকচিত্ত ঘাটী/মহিশীলা, আসানসোল; রিচি, রিমি, সঞ্জু, সুপ্রিয়, টিয়া, পাম্পি, পার্থ, রাজীব ও মুনমুন/অমরারগড়; অমিতাভ, মিনতি, শুভেন্দু, সান্ত্বনা ও মুকুল রায়/সড্ডা; বাবলু, শাবলু, খোকা, জগন্নাথ, কাজল, ময়না ও রেখা/আলুডাঙা; সুশান্ত, জয়ন্ত, মিতা, মিনতি, বিদ্যুৎ, বুবুন, লালটু, বাবু ও অন্যান্যরা/চিত্তরঞ্জন, আর সাইট; টিংকু, লাল্টু, পল্টু, সমলু, পাপলু/অন্ডাল, উত্তর বাজার;

।। মেদিনীপুর ।।

পার্থ, সুব্রত, বিধান, মাধবী ও গৌরী ব্যানার্জী/রেল কলোনী, ইন্দা, খড়গপুর; তমাল, পলাশ, কাকলি, বাপ্পা ও বুম্বা/রবীন্দ্রনগর;

।। বীরভূম ।।

প্রবোধ দত্ত/মুরারই; রাইনা, দোলন, পাপড়ি/শিউলিয়া, পাথাই; তাপস, প্রণব, তন্ময়, সঞ্জীব, জীষ্ণু, তোতন, ছোটন ও গজু/ভাটরা;

।। বাঁকুড়া ।।

বৈদ্যনাথ, সোমনাথ ও রুদ্রেন্দ্র রায়/ময়রাপুকুর, বিষ্ণুপুর; আশামুকুল ও বেলা রায়/ময়রাপুকুর; দোলন, কুচু, অনিল, পিউ ও রিন্টু/কুচকুচিয়া; জয়দীপ ও জয়শ্রী রায়/উখড়াডিহি; মৌসুমী, মৌ, পৌলমী, ভারতী ও দেবীপ্রসাদ/মলদুবকা; পাপু, বাপ্পা, সোনাই, বুবাই ও গিরিজা রায়/তিলুড়ি; বয়লাল, চিত্তরঞ্জন, তরুণ, গাবলু, মোনালিসা ও গিরিজানন্দন রায়/তিলুড়ি; পার্থ, মিঠু ও রামানুজ মিত্র/মুক্তাতোড়;

।। পুরুলিয়া ।।

শিশির, অণিমা, বীণাপাণি, যূথিকা, বীথিকা, অমিত ও অন্যান্যরা/রঘুনাথপুর; মীনা, হরিনাথ, বিপুল, রাজকুমার ও অপর্ণা/আদ্রা, রেল কলোনী;

।। ত্রিপুরা ।।

চিরশ্রী চক্রবর্তী/পুরাতন কালীবাড়ি লেন, আগরতলা;

।। মুর্শিদাবাদ ।।

শম্পা ও পম্পা চ্যাটার্জী/ফারাক্কা; স্বপন, জয়া, বিশু, গীতা, অলোকা, বরুণা, অরুণা ও অন্যান্যরা/সৈদাবাদ, নিমতলা পাড়া লেন, খাগড়া;

।। উত্তরবঙ্গ ।।

রুদ্রকান্ত সরকার/ক্লাব রোড, জলপাইগুড়ি; ধর্মদাস চক্রবর্তী/দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি;

।। আসাম ।।

পঙ্কজ, গৌরী, রানা, পরাগ/জামতলা, ডিগবয়; শ্যামল, শ্রাবণী, গীতা, রীতম ও উদয় ভট্টাচার্য/লামডিং;

।। বিহার ।।

রিচি, রিমি/ডোরান্ডা, রাঁচী; পুচুন, মনু, ইভা ও ছবি/বিষ্টুপুর, জামসেদপুর;

।। দিল্লী ।।

বৈদ্যনাথ রায়/ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স, হিন্দোল;

।। অন্ধ্রপ্রদেশ ।।

কল্যাণ, শুভ্রা, শ্রাবণী/বিজয়নগরম;

।। মধ্যপ্রদেশ ।।

স্বদেশ, রাণা ও মৌ/দুর্গ;

চৈত্র সংখ্যার শব্দমালার উত্তর

পাশাপাশি

১. বলরাম ৪. কলম ৬. মধুবালা ৭. কাজু ৮. কাবুলি ৯. বরাকর ১১. সবল ১৩. বটিকা ১৪. রমরমা ১৬. নরক ১৭. বন

ওপর-নিচ

১. বলাকা ২. রাম ৩. মধু ৪. কলাকার ৫. মসলিন ৯. বল ১০. কর্মকারক ১১. সনাতন ১২. কলরব ১৫. মান

জানো কী

- গন্ডারটি মারার পর শিকারীর মনে হলো, তিনি জহ্লাদের কাজ করেছেন। কেন?
- মৃত্যুর মুখোমুখি ব্রুস লি। সামনে তাঁর ভয়ংকর দুসমন। কি করবেন লি?
- কলিযুগের বাল্মীকি কে?
- ধর্মযাজকরা পুড়িয়ে মারলেন এক বিজ্ঞানীকে। কেন, কি করেছিলেন তিনি?
- জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে কার পাল্লায় পড়েছিলেন পথিক?
- ভীষণ বিপদের মুখে পড়ে গেলো পান্ডব গোয়েন্দারা। বাবলু, বিল্লু, পঞ্চুরা তারপর কি করলো?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে **শুকতারা** জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু। রঙিন ছবিতে ভরা খেলাধূলা বিভাগ তো আছেই।

রবির পরে সোম

আরতি বসু

রবিবার বিকেলেই টুনু সোমবারের কথায় চলে এল। বলল, সূয্যিমামার পরেই চাঁদমামা; তাই রবিবারের পরেই সোমবার।

আমি বললাম, তোমাদের এই চাঁদমামাটিকে নিয়েই যত গন্ডগোল। দেখতে কেমন শান্তশিষ্ট, সুন্দর অথচ হালচাল বোঝা দায়।

টুনু বলল, বোঝা না যাওয়ার কি আছে? চাঁদ হলো পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। এখন অবশ্য কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর আকাশে গিজগিজ করছে। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিঃ মিঃ। ২৭ দিনের একটু বেশি সময়ে সে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসে কিন্তু নিজের অক্ষরেখার ওপর আবর্তিত হয় না। আর চাঁদের বুকে যে ছায়া পড়ে–

বাধা দিয়ে বললাম, সে তো তুমি বলছ এই ১৯৮৭তে বসে। হাজার হাজার বছর আগে মানুষ যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখত যে গোল সুন্দর চাঁদটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে, তখন তারা মহাচিন্তায় পড়ত। আবার যখন পুরো গোল চেহারাটা দেখা যেত তখনও তার মধ্যে কালো কালো কি সব ছায়া পড়ে। ভেবে ভেবে এক এক দেশের মানুষ চাঁদের সংগে এক একটা গল্প জুড়ে দিয়েছিল। যেমন ধর, আমাদের চাঁদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। দক্ষরাজার অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, কৃত্তিকা প্রমুখ সাতাশটি কন্যা তাঁর সাতাশ রাণী। এদের মধ্যে সুয়োরাণী হলো রোহিণী। রোহিণী যা বলে তাই হয়, যা চায় তাই পায়। দেখে দেখে অন্য রাণীদের হিংসে হয়। তারা তাই একদিন দল বেঁধে বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করল। দক্ষরাজা সব শুনে দারুণ চটে গেলেন জামাই-এর উপর, আর চটে-মটে তাকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন তোমার যক্ষ্মা হোক। ব্যস, বিছানা নিলেন চাঁদ–প্রাণ যায় আর কি। রাণীরা স[illegible]ব ছুটলেন বাবার কাছে, অভিশাপ ফিরিয়ে নাও বাবা। দক্ষ বললেন, তা তো আর হয় না, ঠিক আছে মাসের মধ্যে পনেরো দিন যক্ষ্মা রোগে চাঁদ খইবেন তার পরের পনেরো দিনে ফিরে পাবেন স্বাস্থ্য। সেই থেকেই চলে আসছে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি।

টুনু বলল, আর অন্য দেশে চাঁদের অবস্থাটা কেমন ছিল?

–এক এক দেশে তো চাঁদ সূর্যের চেয়েও বড় ছিল। ব্যাবিলনের মানুষ তার নাম দিয়েছিল সিন। শামাশ বা সূর্য তাঁর ছেলে। এই সিন একজন বয়স্ক লোক, তাঁর মাথায় পাগড়ি, গালে লম্বা দাড়ি। রোজ সন্ধ্যেবেলায় তিনি বেরোন নৌকোয় চড়ে। সারা রাত আকাশের এদিক থেকে ওদিক তিনি টহল দিয়ে বেড়ান। দেখেন দুষ্টু লোকেরা অন্ধকারের সুযোগে কি বদ মতলব আঁটছে। দেখতে পেলেই তাদের কঠিন সাজা দেন। আকাশের বুকে কাস্তের মতো ঐ আলোর ফালিটাই সিনের অস্ত্র।

সিনকে আর শামাশকে জব্দ করার চেষ্টা করেছিল একবার একদল দুষ্টু লোক। সিন আর শামাশ তো তাদের কচুকাটা করে ছাড়লেন। দু একজন কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালাল। তারাই মাঝে মাঝে আবার দল পাকিয়ে হামলা করে। তবে লাভ কিছুই হয় না। ওদিকে আবার প্রত্যেক মাসের শেষে দেবতাদের সভা বসে। নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। সিন সেই সভার সভাপতি। তিনি যা বলবেন সেই মতো চলবে সবাই।

আসল ব্যাপারটা হলো ব্যাবিলনের মানুষরাই দিনের পর দিন চাঁদ আর সেই সংগে বিশেষ বিশেষ তারাদের আনাগোনা লক্ষ্য করতে করতে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করে ফেলেছিল। আর তারই ফলে তৈরি করতে পেরেছিল বর্ষপঞ্জী–ক্যালেন্ডার। যদিও সেই ক্যালেন্ডার নিখুঁত ছিল না, তবু বার তিথি ইত্যাদির একটা মোটামুটি হিসাব তৈরি হয়েছিল। মিশরে তো চাঁদের মাসটি ছিল বছরের প্রথম মাস।

এতোক্ষণ চুপচাপ শুনছিলো টুনু। এবার বললো, তাহলে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনটির নাম সোমবার হয়ে তো ঠিকই হয়েছে তাই না? সোমবার চন্দ্রবার বা চাঁদের দিন।

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেংগল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

উম...ম...ম... কি ভালো...

"ভালো তো লাগবেই!
আর কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল
তোমার পক্ষে তো খুবই ভালো!"

ভিটামিন এ, ডি আর ই-র উপকারিতা মেশানো কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল দিয়ে আপনার শিশুকে মালিশ করুন—দেখুন ও কেমন আহ্লাদে খিল খিল করে হাসে।

কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল আপনার শিশুকে রিকেট থেকে রক্ষা করে

রোজ কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল দিয়ে মালিশ করলে ভিটামিন ডি-র অভাবজনিত হাড়ের অস্বাভাবিকতা থেকে আপনার সন্তান সুরক্ষিত থাকবে।

কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল ভিটামিন ই-র অভাব ঘটতে দেয় না

ভিটামিন ই-র অভাব ঘটলে "মাসক্যুলার ডিস্‌ট্রোফি" জাতীয় অসুখ করে। রোজ আপনার শিশুকে কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল দিয়ে মালিশ করলে, সে ভয় থাকে না।

কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল ভিটামিন এ-র অভাব রোধ করে

শরীরে ভিটামিন এ-র ঘাটতি হলে শিশু ও বাড়ন্ত বাচ্চাদের ত্বকের নানা অসুখ করে। কিন্তু রোজ কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল মালিশ করলে ভিটামিন এ-র চাহিদা পূরণ হয় ও ত্বকের অসুখও সেরে যায়।

কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল চন্দন ও নিম তেলের গুণেও ভরপুর

চন্দন, নিমতেল ও অন্যান্য উপাদানের গুণে কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল ভরপুর বলে, শিশু ও বাড়ন্ত বাচ্চাদের পক্ষে এটি অত্যাবশ্যকীয়। আজই এক বোতল কিনে ব্যবহার করুন, দেখবেন আপনার সন্তান কেমন সারা বছর সুস্থ শরীরে থাকে!

'কেয়ো-'কার্পিন 'বেবী অয়েল

Dey's দে'জ মেডিক্যাল
যাদের যত্নই আপনার আস্থা

* এটি কোন প্রসাধন সামগ্রী নয়।

ভিটামিনযুক্ত এই তেলের মালিশ আপনার সন্তানের পক্ষে অপরিহার্য

CLARION C-DMBO-1

Registration No. W.B./E.C -60 April 87 "Suktara"